সের্গেই আইজেনস্টাইন জীবন ও চলচ্চিত্র

(১৮৯৮—১৯৪৮)

সৌমেন গুহ

দীপায়ন ॥ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৯

SERGEI EISENSTEIN : LIFE AND FILMS (1898—1948)

BY

SAUMEN GUHA

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৯৬০

প্রকাশক

রেণুকা সাহা ॥ দীপায়ন ॥ ২০ কেশব সেন স্ট্রীট ॥ ৭০০০০৯

মুদ্রাকর

সোনা মুদ্রণ ॥ ৭৬/২ বিধান সরণী ॥ ৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট

সন্দীপন ভট্টাচার্য

আমার অমসৃণ জীবনের দুঃখ-কষ্ট, সংগ্রাম, হাসি-কান্না,
লাঞ্ছনা-অপমান, কারাগার ও সংসারে দীর্ঘ
পঁচিশ বছরের সাথী লতিকা গুহকে ॥

প্রকাশিত অন্যান্য বই

সুশোভন সরকার
বাংলার রেনেসাঁস

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড
মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা : স্বপ্ন

টেরী ইগলটন
মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা

নির্মাল্য নাগ
শিল্পচেতনা

বসুধা চক্রবর্তী
মানবতাবাদ

পল লাফর্গ
সম্পত্তির বিবর্তন

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি
নোটবুক (১ম)

চার্লস ডারউইন
ডিসেণ্ট অফ ম্যান (১ম ও ২য় খণ্ড)

অমিয় রায়চৌধুরী
শতবর্ষের সিনেমা ও চার্লি চ্যাপলিন

রমেশচন্দ্র দত্ত
বাংলার কৃষকসমাজ
(পিজ্যান্ট্রি অফ বেঙ্গল)
প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস

লুইস হেনরী মর্গ্যান
এনসিয়েন্ট সোসাইটি (১ম ও ২য় খণ্ড)

এন. গোরচাকভ
স্তানিস্লাভস্কীর নাট্য পরিচালনা (১ম ও ২য় খণ্ড)

গত দেড়শ বছরের রাজনৈতিক ছবির ইতিহাস ও দলিলের সংকলন সতেরটি আর্টপ্লেট-সহ
ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি
(সম্পাদনা : সন্দীপন ভট্টাচার্য)

সন্তোষকুমার বসু
ভারতশিল্পে দেহজ শ্রম ও অন্যান্য প্রবন্ধ

এ. সি. মুরহাউস (সম্পাদনা : গর্ডন চাইল্ড)
লিখন ও বর্ণমালা

ভি. আই. লেনিন
উনিশশো পাঁচের বিপ্লব

বের্টোল্ট ব্রেখট
নির্বাচিত ব্রেখট (১ম)

অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালির শিক্ষাচিন্তা সংক্রান্ত আলোচনা ও মূল নথিপত্রাদি। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিতব্য !
বাঙালির শিক্ষাচিন্তা (১ম খণ্ড ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত)
(সম্পাদনা : প্রবীর মুখোপাধ্যায়)

মুখবন্ধ

১৯৯৮ সাল, সের্গেই আইজেনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীর বছর। সেই উপলক্ষ্যে অবশ্যই পৃথিবীর নানা দেশে নানা কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে, অনুমান করা যায়। 'দীপায়ন' প্রকাশনার শ্রীসলিল সাহা যখন আমাকে সের্গেই আইজেনস্টাইন সম্পর্কে একটি জীবনীগ্রন্থ লেখার জন্য আহ্বান জানালেন—তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে, ঠিক করে ফেলেছিলাম কিভাবে এই কঠিন কাজটি শুরু করবো। বাংলায় আইজেনস্টাইনের জীবন ও চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিশেষত বাংলায় আইজেনস্টাইনের পরিচয় দুঃখজনকভাবে প্রায় অনুপস্থিত।

বর্তমান গ্রন্থটি আইজেনস্টাইনের জীবনীগ্রন্থ নয়। এটি তাঁর বিশাল বিস্তৃত জীবন ও কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-গ্রন্থ। প্রথমেই ঠিক করেছিলাম, কোনো জীবনীগ্রন্থকে অনুসরণ বা অনুকরণ করে, বর্তমান গ্রন্থ লিখবো না।

শুধু প্রথম অধ্যায় এবং শেষের দু'একটি অধ্যায় ছাড়া, বর্তমান গ্রন্থের পনেরো আনা অংশই লিখেছি আইজেনস্টাইনের মূল রচনা অবলম্বনে। এমন কি, কুলেশভ্ বা আলেকজান্দ্রভ ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও লিখেছি তাঁদের মূল রচনা অবলম্বনে, যতোটুকু সম্ভব। সব থেকে বেশি অংশে আইজেনস্টাইন ও অন্যান্যদের নিজস্ব উপস্থাপনা ও বর্ণনা রাখতে চেষ্টা করেছি।

এটা করার জন্য, অনিবার্যভাবেই বর্তমান গ্রন্থের অনেক জায়গায় ভাষা বা লেখা 'আড়ষ্ট' মনে হবে। যদিও আমি নিজেই খুব ভালো না লিখতে জানার কারণেও. অনেকাংশে লেখায় আড়ষ্টতা এসেছে। তবুও, আইজেনস্টাইনের বা অন্যদের মূল উপস্থাপনা ও বর্ণনার আদলে লেখার পরিবর্তে, সম্পূর্ণ ঝরঝরে ভাষায় লিখতে চাইনি। এর জন্যে পাঠকদের অস্বস্তির কারণ হয়েছি, অনুমান করি।

আইজেনস্টাইনের নিজের লেখা, দুটি শ্রেণীর প্রধানত। প্রথমত, নিটোল টেকনিক্যাল। দ্বিতীয়ত, নিটোল রোমাণ্টিক স্মৃতিচারণ। দুটি ক্ষেত্রেই, লেখাকে বাংলায় রূপান্তরিত করা—অসম্ভব কঠিন। যাঁরা মূল লেখা (সেটাও হয়তো অনুবাদ) পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন।

আইজেনস্টাইনের প্রতিভা এতোই বিশাল, বিস্তৃত ও গভীর যে, তাঁর জীবন ও কর্মের পরিচয়ে শুধুই প্রশংসা ধ্বনিত হওয়ার বিপদ থাকে। আবার তারই সাথে, দায়িত্বহীন ও তথ্যহীন সমালোচনা বা নিন্দা করার লোভও পেয়ে বসতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থের কাজ, প্রশংসা বা নিন্দা করা নয়। আইজেনস্টাইনকে যতো দূরে

সম্ভব যথাযথভাবে বাংলা ভাষায় পরিচিত করতে, আইজেনস্টাইন সম্পর্কে আমার নিজের দুর্বলতা ও আকর্ষণকে বর্তমান গ্রন্থে এড়িয়ে গেছি। ব্যক্তিগতভাবে তাই প্রায় কিছুই মন্তব্য করিনি।

বর্তমান গ্রন্থের তথ্যসূত্র হিসাবে অনেক গ্রন্থ ব্যবহার করেছি, মূল রচনা ছাড়াও। আইজেনস্টাইনের জীবনী নিয়ে ইংরাজী ভাষায় একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত। তার মধ্যে কয়েকটিকে বেছে নিয়েছি কিছু তথ্যের সূত্র হিসাবে। এর মধ্যে আইজেনস্টাইনের শিষ্যা ও সহকর্মী মারি সিটনের লেখা জীবনীটি বৃহৎ ও বহুল প্রচারিত। কিন্তু মারি সিটনের এ গ্রন্থটিকে আমার সর্বক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি। প্রথমত, প্রচুর তথ্যের অভাব, যা ক্রমশই আমরা জানতে পারছি; দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ; এবং সর্বোপরি, এই গ্রন্থটি আইজেনস্টাইন সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও জ্ঞান সম্পন্ন পাঠকদের যতো পড়তে ভালো লাগবে, নতুনদের ততোখানি নয়। এ ত্রুটিগুলোর কিছু কিছু অন্য জীবনীকাররাও লক্ষ্য করেছেন।

জীবনীগ্রন্থ হিসাবে ইয়ন বার্ণার গবেষণামূলক বৃহৎ কাজটিকে আমি তথ্যসূত্র হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়েছি। তার সাথে আছে নর্মান সোয়ালোর লেখা স্বল্পদৈর্ঘের জীবনীগ্রন্থটি।

বর্তমান গ্রন্থটির পরিকল্পনা মূলত যা করেছিলাম, সময়ের অভাবে তাকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরো বিস্তৃতভাবে একটি গ্রন্থকে রূপায়িত করা যাবে বলে আশা রাখি।

আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রকার, চলচ্চিত্র-তাত্ত্বিক এবং শিল্পকর্মী। কাজেই স্বল্প পরিসরে তাঁর কর্মজগতের পরিচয় দিতে, গুরুত্ব দিয়েছি তাঁর কাজ ও রচনার ওপর—এক কথায় তাঁর সৃষ্টির ওপর। তাই তাঁর ব্যক্তিজীবনের অনেক খুঁটিনাটি বাদ দিতে হয়েছে। গ্রন্থের শেষ দিকে আইজেনস্টাইনের 'হ্যালো, চার্লি" রচনার বাংলা অনুবাদ যুক্ত করেছি। এই রচনাটি অবশ্যই মূল রচনার ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ। তাই, নিশ্চয়ই মূল রচনার শব্দচয়ন, বাক্যগঠন ও রচনাশৈলীর স্বাদ এই অনুবাদে অনুপস্থিত। তবু আইজেনস্টাইনের বিষয়-বস্তু ও স্টাইলের যৎসামান্য স্বাদ পাওয়া যাবে।

বর্তমান গ্রন্থটিতে তথ্যের পরিমাণের পরিবর্তে, তথ্যের বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছি। বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে, যেখানে যে ঘটনা আইজেনস্টাইন নিজেই গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। তথ্যের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে, আইজেনস্টাইন ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মূল রচনাকে প্রাথমিক সূত্র হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়েছি। বহু জায়গায় তারিখ বা নাম নিয়ে সমস্যা হয়েছে। সাধ্যমতো সতর্ক থেকেছি।

আইজেনস্টাইনের নাম সম্ভাব্য জার্মান উচ্চারণে (Eisenstein) রেখেছি, রুশ নয়। বাংলায় রুশ নামের উচ্চারণ লেখাও গুরুতর সমস্যা। ইংরাজী অনুবাদে রুশ নাম সব সময় ঠিক দেওয়া থাকে না। তবুও রাশিয়া এবং তার বাইরে

প্রকাশিত গ্রন্থে নামের বানান যতোদূর সম্ভব তুলনা করেছি, মূল নাম পাওয়ার জন্যে। তার ওপর বাংলা বর্ণমালায় নামগুলি লেখা বিরাট সমস্যা। ফলে অতিরিক্ত যুক্তাক্ষর ও হসন্তের ব্যবহার করতে হয়েছে। তাও সব স্থানে সমানভাবে রাখা যায়নি, আপাত বিশৃঙ্খলা এসেছে নামের বানানে কোথাও কোথাও। তবুও, মূল রুশ উচ্চারণের ধ্বনি-স্থাপন সাধ্যমতো বজায় রাখার চেষ্টা করেছি (রুশ ভাষা সম্পর্কে আমার নগণ্য জ্ঞানে যতোটুকু পেরেছি)।

আইজেনস্টাইনের রচনা ছাড়াও শেষের তিনটি সংযোজনের প্রথমটি 'চলচ্চিত্রপঞ্জী' যাতে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের, যে ক'টি সম্পূর্ণ আকারে প্রদর্শিত, তার, তালিকা ও কলাকুশলীর তথ্য দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় একটি সংযোজনে আইজেনস্টাইনের জীবিতকালে প্রকাশিত ইংরেজী 'রচনাপঞ্জী' রয়েছে। সব শেষে, যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ লিখেছি, তার তালিকা দিয়েছি 'তথ্যসূত্র' হিসাবে। তথ্যসূত্রের গ্রন্থাবলীর বেশির ভাগ আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ। কিছু গ্রন্থ পড়েছি কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ও রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারে এবং কিছুটা ডেনমার্কের স্টেট ফিল্ম আর্কাইভ্ গ্রন্থাগারে।

নিজের হাতে লিখতে কষ্ট হলে, অনুলিখনে বিরাট সাহায্য করেছে আমার স্ত্রী লতিকা গুহ। তা ছাড়া কিছু অংশ অনুলিখনে সাহায্য করেছেন সুমিতা গুহঠাকুরতা ও শিখা সাহু। শ্রীমতি সাহু আইজেনস্টাইনের 'হ্যালো, চার্লি" রচনা অনুবাদের প্রথম খসড়া প্রস্তুতিতে আমায় কিছুটা সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন হাতের লেখা হওয়ায়, নিঃসন্দেহে কম্পোজ করতে প্রচুর অসুবিধা স্বীকার করেছেন প্রেসের কর্মীরা। তার ওপর দ্রুত কাজ শেষ করার চাপ তাঁরা অক্লান্তভাবে বহন করেছেন। দ্রুত প্রকাশের ভুল-ভ্রান্তি তবুও কিছু রয়েই গেলো।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, এই আমার প্রথম গ্রন্থ রচনা। দ্রুততার চাপ ছিলো। কিন্তু, প্রকাশক শ্রী সলিল সাহা আমার লেখার পরিকল্পনা ও উপস্থাপনায় অপরিমেয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেটির অভাব ঘটলে হয়তো, এ গ্রন্থ কোনো দিনই রচনা করা সম্ভব হতো না।

বিভিন্ন গ্রন্থের আলোকচিত্র বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত। আলোকচিত্রগুলির কপি এবং সত্বর পরিস্ফুটন করে দিয়েছেন আমার বয়োকনিষ্ঠ বন্ধু দেবদূত বসু।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, গ্রন্থটিতে কোনো কোনো তথ্য বা বিবরণ পুনরুক্তি মনে হবে। নতুন পটভূমি বা ঘটনামালায় এটা করতে হয়েছে। যেমন, আইজেনস্টাইনের জীবনের ছেলেবেলা, প্রথম যৌবন বা শেষ কিছু বছরের ঘটনামালা চয়ন করেছি গ্রন্থের শেষ দিকে বা যেন সব কথার শেষে। মনে হবে পুনরুক্তি কিছুটা। এটা গ্রন্থ-পরিকল্পনার কারণে, সমস্ত দায়িত্বটাই আমার একার। বাংলায় আইজেনস্টাইনের জীবন ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে ঠিক যেমন একটি গ্রন্থ থাকা উচিত বলে মনে হয়েছে—ঠিক তেমন করে লিখতে বসেছি।

আইজেনস্টাইনের সমস্ত সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রই দেখেছি—বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাবে এবং অন্য প্রতিষ্ঠানে। কয়েকটি চলচ্চিত্র একাধিকবার। সব থেকে বেশিবার ও খুঁটিয়ে দেখেছি 'পোতেম্‌কিন্‌' চলচ্চিত্রটি, পুনের ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভের এডিটিং মেশিনে, প্রত্যেক দৃশ্য এক এক করে, বার বার (পুদভ্‌কিনের 'মা' চলচ্চিত্রটি দেখতে গিয়ে)।

তাঁর সমস্ত চলচ্চিত্রই প্রথমবার দেখেছি—ভালো চলচ্চিত্রের দর্শক হিসাবে। কিন্তু প্রত্যেক চলচ্চিত্রই মনে হয়েছে, নিখুঁত ব্যাকরণ, তত্ত্ব ও গাণিতিক হিসাবের নমুনা। তখন দর্শক নয়, ছাত্র হিসাবে দেখেছি। এটা মুগ্ধতা নয়। বিশ্বের অনেক চলচ্চিত্রকারের কাজে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আলোড়িত হয়েছি। দু'টি প্রতিভাকে কখনো তুলনা করা যায় না, তুলনা করা উচিতও নয়। শুধু বোঝানোর সুবিধের জন্যেই সঙ্গীতস্রষ্টা মোট্‌সার্টের (Mozart) প্রসঙ্গ আনতে ইচ্ছা করে।

মোট্‌সার্ট্‌ একমাত্র অবিস্মরণীয় সঙ্গীতস্রষ্টা নন। কিন্তু মোট্‌সার্ট্‌ সব থেকে বিশুদ্ধ ও নিখুঁত স্রষ্টা। তাঁর সুর-ধ্বনি-ছন্দ-যতির কাঠামো নিখুঁত। আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র দেখে সে কথা মনে হয়েছে। তাঁর চলচ্চিত্র ঠিক প্রমোদ-উপকরণ নয়। প্রত্যেকটি বিশাল ব্যাকরণ ও তত্ত্বের পরীক্ষার ফলশ্রুতি। তার সাথে, মানুষ ও সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা, যার কোথাও ব্যতিক্রম নেই। নিখাদ ও সুগভীর ভালোবাসা।

আইজেনস্টাইনের তাত্ত্বিক রচনা, আগামী বহু শতকের প্রজন্ম ভাববে, কাজে লাগাবে। এটা জন্মশতবর্ষের বা কয়েক দশকের সাময়িক উন্মাদনা নয়। মানুষ ভুলে যাবে, তিনি কোন্‌ দেশের, কবেকার, কোন্‌ রাজনীতির ফসল। আইজেনস্টাইনকে মানুষ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে নেবে।

আইজেনস্টাইনের সৃষ্টির সাথে আমার প্রথম পরিচয় তাঁর চলচ্চিত্র দেখে নয়। প্রথম যৌবনে তাঁর লেখা পড়ি রাশিয়ার 'নোট্‌স্‌' সংকলন প্রকাশনায়। তখন আমি কম্যুনিজম্‌, মার্কস্‌বাদ বা বামপন্থায় বিশ্বাসী। আইজেনস্টাইনের লেখা পড়ে, কোনো পন্থার পরিধির বাইরে মনটা চলে গিয়েছিলো। তখন আইজেনস্টাইনের জীবনের দুর্যোগ বা শেষ বেলা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তাই রাশিয়া, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিস্ট পার্টি, মার্কস্‌বাদ নিয়ে গর্ব করতাম। কারণ, আইজেনস্টাইন ছিলেন গোর্কি, মায়াকোভ্‌স্কি, পলেভয় বা অস্ত্রোভ্‌স্কির পাশাপাশি।

আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র দেখি অনেক পরে। তাঁর প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ অনুভব করি। আজ তাঁর জীবনের পরিণতি অনেকটাই জানা। আইজেন-স্টাইনের মতো মানুষ বা প্রতিভাকে আক্রমণ করা, ধ্বংস করা, যে কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও সংস্কৃতির ক্ষতি। সময়ের পরীক্ষায় আইজেনস্টাইন

উত্তীর্ণ। রাশিয়ার ক্ষমতা ও শাসন পরাজিত। আরো সময়ের অপেক্ষা—আইজেনস্টাইনের ব্যক্তিত্ব দেওয়ালের লিখন হয়ে উঠবে, আরো অনেক ক্ষমতার দম্ভের বিরুদ্ধে। বর্তমান গ্রন্থের পাঠকরা যদি আইজেনস্টাইন সম্পর্কে আরো আগ্রহী হয়ে ওঠেন—এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ সার্থক বলে মনে করবো ॥

সৌমেন গুহ

সূচি

সূচি

'এনাফ সিম্‌প্লিসিটি' নাটকের পোস্টারের সামনে আইজেনস্টাইন (১৯২৩)
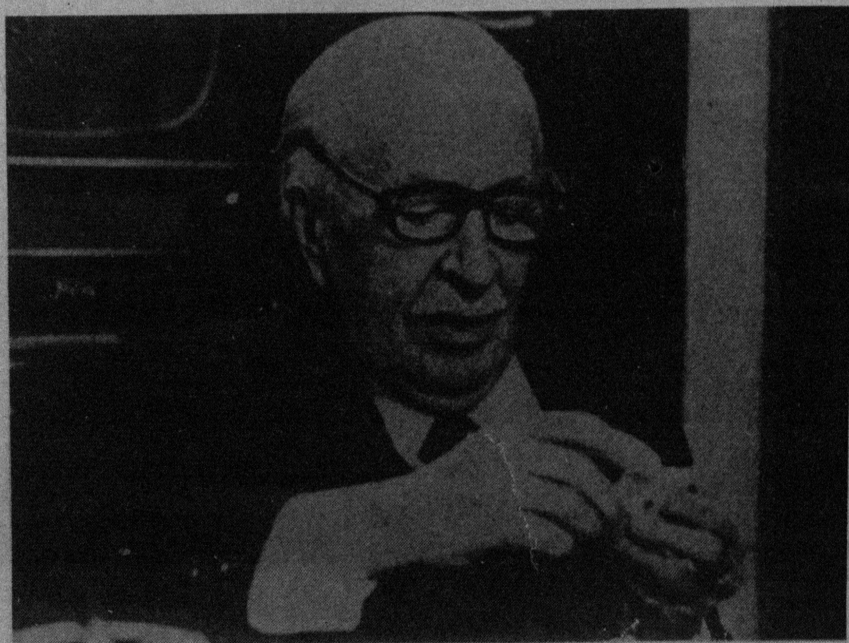
কুলেশভ্
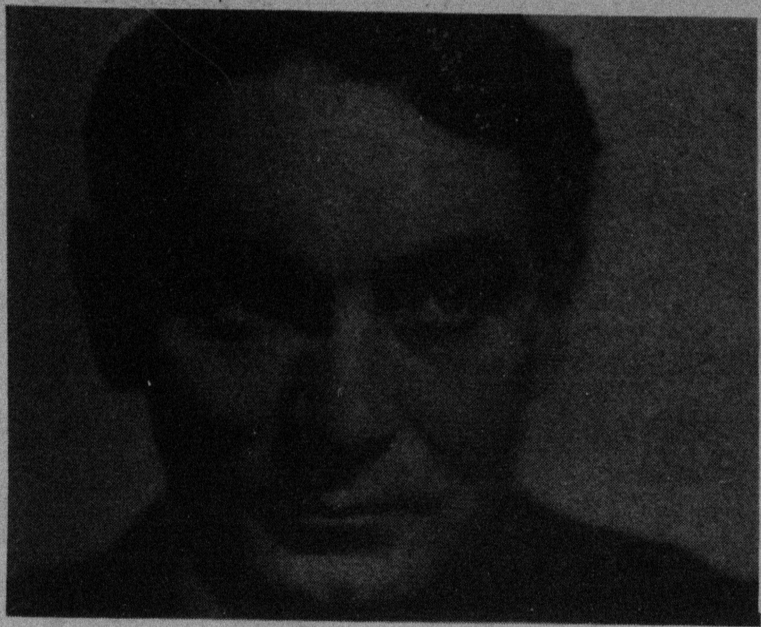
পুদভ্কিন্

'জেনারল্ লাইন' চলচ্চিত্রের দৃশ্য

সের্গেই মিখাইলোভিচ্ আইজেনস্টাইন্ (Sergei Mikhailovitch Eisenstein) পঞ্চাশ বছরের জীবন-ব্যাপ্তিতে মাত্র ছ'টি চলচ্চিত্রের কাজ শেষ করে যেতে পেরেছেন। বহু কাজ রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ। আর তাঁর অজস্র লেখায় রয়েছে চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণ ও চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ সম্পর্কে কালজয়ী ভাবনা-চিন্তা।

২৩ জানুয়ারি ১৮৯৮ সালে, রাশিয়ার রিগাতে সের্গেই আইজেনস্টাইনের জন্ম। রাশিয়াতে তখন ঝোড়ো সময়। আইজেনস্টাইনের শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত— তাঁর মাতৃভূমি অস্থির হয়ে উঠেছে ১৯০৫ আর ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্ব ও প্রক্রিয়ায়। উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের প্রথমে, সমগ্র রাশিয়া, তখন উত্তাল এক সম্ভাবনাময় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের ঝোড়ো আন্দোলনে। তাই আইজেনস্টাইনের চিন্তায় ও কর্মে শ্রমিক বা খেটে-খাওয়া মানুষদের লড়াই, তাদের মুক্তি। আর অজস্র মানুষের সমবেত উপস্থিতি, তাঁর চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকার ভূমিকা পালন করে। এই বহু মানুষের, বহু মেহনতী মানুষের সচল ক্রিয়াকাণ্ডই তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু। এই সবই, তাঁর জীবনের প্রথম কয়েক দশক গড়ে ওঠার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আইজেনস্টাইন সমাজতন্ত্রে, মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনে আর সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এমন বিতর্ক তাঁকে নিয়ে সফল ও সবল ভাবে করা যায় না যে তিনি কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী ছিলেন কি না। কারণ, এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও যথাযথ উত্তর ও আলোচনা, তিনি নিজেই তাঁর লেখায় করে গেছেন।

প্রথাগত শিক্ষার তাগিদে, আইজেনস্টাইন পেত্রোগ্রাদের ইন্স্টিটিউট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়েছিলেন। এখান থেকেই তাঁর পেশাগত যোগ্যতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে।

আর এই প্রযুক্তিবিদ্যার যোগ্যতা নিয়ে আইজেনস্টাইন লাল ফৌজে যোগ দেন।

এই লালফৌজেই তিনি এক শখের নাটকের দল সংগঠিত করেন।

যখন লালফৌজের কাজ থেকে আইজেনস্টাইন অব্যাহতি পান, তখন তাঁর নতুন কাজ জোগাড় হয় ফোরেগার্স থিয়েটারে (Foregger's Theatre) ডিজাইনার হিসাবে।

কিন্তু থিয়েটারের ডিজাইনারের কাজের থেকেও বড় ঘটনা হলো, আইজেনস্টাইন এবার তাঁর সত্যিকারের আত্মিক পিতা মেইয়েরহোল্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

রাশিয়ায় তখন সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সংস্কৃতির জগতে ভ্সেভোলোদ এমিলিয়েভিচ মেইয়ের্হোল্দ (Vsevolod Emilievitch Meyerhold) এক পথিকৃৎ নাম। আইজেনস্টাইনের জীবনে এই পথিকৃতের প্রভাব আর প্রেরণার কথা নানাভাবে এসে পড়ে। তখন ১৯১৭ সালের বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা যেমন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের আলোচনায় আলোড়ন তুলছে, ঠিক তেমনি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে সরকার শিল্প-সংস্কৃতিকে কতখানি মতাদর্শগতভাবে কাজে লাগাতে পারে, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলো।

১৯২০ সাল থেকে আইজেনস্টাইন প্রোলেৎকুল্ত (Proletkult) থিয়েটারে কাজ করলেন, আর এইখান থেকেই তাঁর চলচ্চিত্র তৈরির হাতেখড়ি হলো।

১৯২০ সালে জ্যাক লণ্ডনের 'দ্য মেক্সিকান' (The Mexican) গল্পটিকে নাটক হিসাবে রূপায়িত করা হয় প্রোলেৎকুল্তের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম থিয়েটারের জন্যে। এই নাটকের ডিজাইনার ও যৌথ পরিচালক আইজেনস্টাইন। নাটকটি মস্কোর প্রোলেৎকুল্তের সেণ্ট্রাল অ্যারেনাতে মঞ্চস্থ হয়।

১৯২১ সালে এই একই মঞ্চে আইজেনস্টাইনের ডিজাইন করা নাটক 'কিং হাঙ্গার' (King Hunger) মঞ্চস্থ হয়।

এই বছরই মস্কোর পলেনভ থিয়েটারে প্রযোজিত শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডিজাইন করেন আইজেনস্টাইন। ১৯২১ সালে ফোরেগারের পরিচালনায় মস্কোর ফ্রি স্টুডিওর নাটকের ডিজাইনার আইজেনস্টাইন।

এর পরেই আইজেনস্টাইনের জীবনে কয়েকটা বাঁক আসে। মেইয়ের্হোল্দের পরিচালিত 'এ ডল্স্ হাউস' (A Doll's House) নাটকের ডিজাইনার ছিলেন আইজেনস্টাইন।

যেমন মেইয়ের্হোল্দের সাথে কাজ করার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি পান ১৯২২ সালের এই নাটকে, তেমনি এ সময় থেকেই আইজেনস্টাইনের জীবন আরও কিছু নতুন ঘটনায় সমৃদ্ধ হয়েছিলো।

ইতিমধ্যে মস্কোর প্রোলেৎকুল্ত থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো 'প্রেসিপিস্' (Precipice) নাটকটি। ডিজাইনার ছিলেন আইজেনষ্টাইন।

প্রোলেৎকুল্ত থিয়েটারের প্রযোজনায় আলেকজান্দার অস্ত্রোভ্স্কির (Alexander Ostrovski) নাটক 'এনাফ সিম্প্লিসিটি ইন্ এভ্রি ওয়াইজ ম্যান' (Enough Simplicity in Every Wise Man) প্রথম মঞ্চস্থ হলো ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে। এই নাটকের পরিচালক ও ডিজাইনার আইজেনস্টাইন। নাটকটির একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আইজেনস্টাইনের পরবর্তী জীবনের অন্যতম সহযোগী চলচ্চিত্রকার গ্রিগরি ভাসিলিয়েভিচ্ আলেকজান্দ্রভ (Grigori Vassilievitch Alexandrov)।

আইজেনস্টাইনের জীবনে চলচ্চিত্র তৈরি করার প্রথম হাতেখড়ি 'এনাফ সিম্‌প্লিসিটি' নাটকের মাধ্যমে। নাটকটির মধ্যে একটি অংশে প্রায় কুড়ি মিনিটের চলচ্চিত্র যুক্ত করা হয়।

তখনকার রাশিয়ায় নাটক এবং চলচ্চিত্রের এই মিশ্রণ ছিলো এক পথিকৃৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর। এই চলচ্চিত্রাংশের আলোকচিত্রকর ছিলেন বি. ফ্রানট্‌সিসন্‌ (B. Frantzisson)।

কিন্তু আইজেনস্টাইনের পরিচালনায় ও ডিজাইনে আরও কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হলো। যেমন, ১৯২৩ সালেই প্রোলেৎকুল্ত থিয়েটারের প্রযোজনায় 'লিসেন্‌, মস্কো!' (Listen, Moscow)। মস্কো গ্যাস ফ্যাক্টরিতে মঞ্চস্থ হলো আইজেনস্টাইনের পরিচালনায় ও ডিজাইনে 'গ্যাস মাস্কস্‌' (Gas Masks)। এই নিয়ে ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালের বছর দুটো কেটে গেলো।

১৯২৪ সালে আইজেনস্টাইন তাঁর জীবনের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'স্ট্রাইক' (Strike) তৈরি করেন। সব দিক থেকেই এটা ছিলো আইজেনস্টাইনের জীবনের একটা অন্যতম কীর্তি।

'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য যৌথভাবে তৈরি করেন ভ্যালেরি প্লেৎনিয়ভ, আইজেনস্টাইন এবং প্রোলেৎকুল্ত সমন্বয়।

আলোকচিত্রকর ছিলেন এডোয়ার্ড টিসে (Edward Tisse)। সুইডেনে তিনি শৈশব কাটিয়েছেন, আর চিত্রকলা এবং আলোকচিত্রের পাঠ ১৯১৪ সালে শেষ করে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেছেন। যুদ্ধ ও বিপ্লবের সময়কালে টিসে (বা তিসে) সংবাদ চলচ্চিত্র এবং তথ্যচিত্রের আলোকচিত্রকর হিসাবে কাজ করেছেন। টিসের সাথে আইজেনস্টাইনের প্রথম চলচ্চিত্রের কাজ 'স্ট্রাইক'। আর আইজেনস্টাইনের সারাজীবনের চলচ্চিত্রের সর্বক্ষণের আলোকচিত্রকরের ভূমিকায় এডোয়ার্ড টিসে।

'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রে সর্বহারা বাউন্ডুলেদের কিছু চরিত্রে প্রোলেৎকুল্তের অভিনেতারা যেমন ছিলেন, তেমনি এখানেও আলেকজান্দ্রভ অভিনয় করেছিলেন এক ফোরম্যানের ভূমিকায়।

মস্কোর গস্‌কিনো (Goskino) স্টুডিওর প্রযোজনায় এই চলচ্চিত্র তৈরি হলো। মুক্তি পেলো ১৯২৫ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি।

পরিকল্পনা ছিলো প্রাক্‌-বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর কার্যকলাপের উপর এক ধারাবাহিক চলচ্চিত্র-নির্মাণের, যা দিয়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শিক্ষামূলক কাজে একে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু আইজেনস্টাইনের হাতে এই 'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্র এক অন্যতম পরীক্ষামূলক শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়ালো। সেই ১৯২৫ সালেই প্যারিসের 'এক্সপোজিশিয়ঁ দেসার্ত দেকোরাতিফ্‌স্‌' (Exposition des Arts De'coratifs) পুরস্কৃত করলো এই চলচ্চিত্রকে। জার্মানিতে এই চলচ্চিত্র

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হলো, যদিও আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে এটা দেখানো হলো না।

'স্ট্রাইক' ছিলো সর্বার্থেই একটি বৈপ্লবিক চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের পর্দায় একজন বিশেষ ব্যক্তি নয়, বিশাল এক জনসাধারণ নায়ক হিসাবে দেখা দিলো। 'জনগণ নায়ক' (Mass Hero), আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের এক বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য। সেভাবেই কাহিনী বাছাই এবং চিত্রনাট্য তৈরি করা। প্রায় সমসাময়িক রাশিয়ার আর এক স্তম্ভ চলচ্চিত্রকার পুদভ্‌কিনের চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকার উপস্থিতি একক চরিত্র হিসাবে। পাশাপাশি আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে একক নায়ক-নায়িকারা সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যায়। ১৯২৫ সালে আইজেনস্টাইন এক বিরাট প্রকল্পে হাত দেন। তখন ১৯০৫ সালের বিপ্লবের বিশ বছর পূর্তি, তাই '১৯০৫' চলচ্চিত্র তৈরি করা শুরু হলো মস্কোর গসকিনো স্টুডিওর প্রযোজনায়। এবারেও আলোকচিত্রকর এডোয়ার্ড টিসে।

'১৯০৫' চলচ্চিত্রের বিশাল চিত্রনাট্য আইজেন্স্টাইন লিখেছিলেন নিনা আগাদঝানোভার (Nina Agadzhanova) সাথে যৌথভাবে। আর্মেনিয়ান এই মহিলা, যাঁকে 'নুনে' (Nuneh) নামে ডাকা হতো, আইজেনস্টাইনের জীবনে এমন গুরুত্বর ভূমিকা পালন করেছিলেন এই চিত্রনাট্য লেখার সময় যে, চলচ্চিত্রের বা বৈপ্লবিক চলচ্চিত্রের ধারণাই বদলাতে শুরু করে। বস্তুত নুনে সে সময় আইজেনস্টাইনকে বৈপ্লবিক অতীত থেকে বৈপ্লবিক বর্তমানে টেনে আনার পরিবর্তনের স্তরের পথপ্রদর্শক। অকুণ্ঠচিত্তে আইজেনস্টাইন নুনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ছবি তোলার কাজ যখন অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলো, তখন আইজেনস্টাইন '১৯০৫' চলচ্চিত্রের মাত্র একটি ঘটনার স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

আর সেই ঘটনার স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ থেকে জন্ম নেয় 'ব্যাটলশিপ পোতেমকিন' (Battleship Potemkin)।

'১৯০৫' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের প্রত্যেকটি লাইন থেকে একটি করে ঘটনার স্তবক প্রকাশিত হচ্ছিলো। এমনই একটি ঘটনা ছিলো, পোতেমকিন জাহাজের নাবিকদের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের ঘটনাটির চিত্রনাট্যের রূপরেখাও তৈরি করেছিলেন নুনে বা নিনা।

আইজেনস্টাইন এবার পোতেমকিন জাহাজের বিদ্রোহের পূর্ণ দৃশ্যনাট্য তৈরি করে 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্র পরিচালনায় হাত দিলেন। সহযোগিতায় এবং একটি চরিত্রের অভিনেতা হিসাবে রইলেন আলেকজান্দ্রভ। আলোকচিত্রকর রইলেন এডোয়ার্ড টিসে।

পোতেমকিন চলচ্চিত্রের কাজে অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসাবে থাকেন প্রোলেৎকুল্ত থিয়েটারের সদস্যদের সাথে ওদেসা বন্দর-শহরের মানুষেরা আর লাল নৌ-সেনার ব্ল্যাক-সী বাহিনীর নাবিকেরা। দৃশ্যগ্রহণের কাজ করা হয় ওদেসা বন্দর-শহরে এবং সেবাস্তোপোলে।

'পোতেমকিন', ১৯২৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রথম দেখানো হয় মস্কোর বলশয় থিয়েটারে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রের শিল্পকলার ইতিহাসে 'পোতেমকিন' এক বৈপ্লবিক চলচ্চিত্র।

এমনকি ১৯৫৮ সালে ব্রুসেলস-এর আন্তর্জাতিক বিচারকদের নির্বাচনে 'পোতেমকিন' সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (Best Film of All Time)।

এর পরেই আইজেনস্টাইন রাশিয়ার কৃষিকাজে যৌথ খামারের ভূমিকা সম্পর্কে 'জেনারেল লাইন' চলচ্চিত্র তৈরির কাজে হাত দেন। এবার চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় আইজেনস্টাইনের সাথে যৌথভাবে আলেকাসান্দ্রভ থাকেন। এই জুটি এর পরেও কয়েকটি চলচ্চিত্রে যৌথ-পরিচালক হিসাবে কাজ করেন।

'জেনারেল লাইন' (The General Line) চলচ্চিত্রের কাজ খানিকটা এগোনোর পরেই বাধা পড়ে, রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের দশ বছর পূর্তি'র বড় চলচ্চিত্রের পরিকল্পনার জন্যে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের ঝোড়ো সময়ের ঘটনাবলীর উপস্থাপনা দিয়ে 'অক্টোবর' (October) চলচ্চিত্র। মস্কোর সোভ্‌কিনোর প্রযোজনায় এই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আইজেনস্টাইন ও আলেকজান্দ্রভ। চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছে মূলত লেনিনগ্রাদের মানুষেরা, আর দৃশ্যগ্রহণের প্রায় সব কাজই হয় লেনিনগ্রাদে। আলোকচিত্রকর ছিলেন টিসে।

১৯২৮ সালের ২০ জানুয়ারি মুক্তি পায় 'অক্টোবর' চলচ্চিত্র। আমেরিকা বা বিদেশে এই চলচ্চিত্রটি 'টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড' (Ten Days That Shook the World) নামে পরিচিত।

'অক্টোবর' চলচ্চিত্রের কাজ শেষ হওয়ার পরেই আইজেনস্টাইন আবার অসম্পূর্ণ 'জেনারেল লাইন' চলচ্চিত্রটির কাজে হাত দেন। কিন্তু এবার আগের অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করেন। এবারেও চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক আইজেনস্টাইন ও আলেকজান্দ্রভ। আলোকচিত্রকর অবশ্যই টিসে।

এবার নিছক রাশিয়ার ক্ষেতখামারের সাধারণ কাহিনীর ব্যাপ্তির পরিবর্তে, অনেক বেশি একক গল্পের দিকে কাহিনী এগোলো। তৈরি হলো মস্কোর সোভকিনোর প্রযোজনায় 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' (Old and New) চলচ্চিত্র।

১৯২৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পেলো 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' চলচ্চিত্র। ইংল্যান্ডে কিন্তু এই চলচ্চিত্রটি পুরনো 'জেনারেল লাইন' নামেই পরিচিত।

ইতিমধ্যে আইজেনস্টাইনের নাম সুপরিচিত শুধু রাশিয়ায় নয়, বিদেশেও। তাঁর পরিচয় চলচ্চিত্রকার হিসেবে যেমন, চলচ্চিত্রের নতুন তত্ত্ব বা ব্যাকরণের পথিকৃৎ হিসেবেও তেমনই। আবার তাঁর তত্ত্ব ও ব্যাকরণ যতখানি বৈপ্লবিক, ততখানি সেটা রাশিয়ার শিল্পসমৃদ্ধ ধারার, বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার ধারার বাহক।

১৯২৭ সালেই 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের স্রষ্টা হিসাবে আইজেনস্টাইনের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় 'দ্য আমেরিকান হিব্রু' পত্রিকায়, ২৮ জানুয়ারি। এখন তিনি ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে সুপরিচিত হতে থাকলেন।

'মাস মুভিজ' রচনাটি আইজেনস্টাইনের একেবারে প্রথমদিকের তাত্ত্বিক আলোচনা, এবং ইংরেজিতে ১৯২৭ সালে ৯ নভেম্বর 'দ্য নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি আইজেনস্টাইনের সাথে লুইজ ফিসার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে রচনা করেন। বার্লিন থেকে এর একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয় যার ইংরেজি অনুবাদ 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় ২৫ ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়।

১৯২৪ সালে লেনিনগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় আইজেনস্টাইন, পুদভ্‌কিন এবং আলেকজান্দ্রভের যৌথ বিবৃতি 'দ্য সাউন্ড ফিল্ম'। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এবং 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকা দুটিতে এই যৌথবিবৃতির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় আমেরিকাতে এবং লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় 'ক্লোজ আপ' পত্রিকায়।

আইজেনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে যেমন, তেমনই তাঁর নিজের লেখাও গুরুত্ব নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হয়। এরকম একটি বিস্ময়কর নিবন্ধ 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২২ ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে। এই নিবন্ধটি হলো, কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের চলচ্চিত্রায়নের পরিকল্পনার আলোচনা।

নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আইজেনস্টাইন, আলেকজান্দ্রভ এবং টিসে একটি সমন্বয় হিসেবে এবার ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভ্রমণ করেন। এই সময় থেকেই আইজেনস্টাইনের কাজের পারিধি আরও বেড়ে ওঠার সম্ভাবনার সাথে সাথে অসম্পূর্ণ কাজের পরিমাণও বেড়ে উঠতে লাগলো।

এঁরা তিনজন যখন সুইজারল্যাণ্ডে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য এসেছিলেন, তখন প্রায় তাৎক্ষণিক পরিকল্পনায় আইজেনস্টাইন, রিখটার এবং মণ্টাগু যৌথভাবে একটি অতি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'দ্য স্টরমিং অফ লা সারাজ' পরিচালনা করেন। টিসে এই বিচিত্র রূপকটির দৃশ্যগ্রহণ করেছিলেন মাত্র একদিনের মধ্যে। বিষয় ছিলো, চলচ্চিত্র সম্মেলনের একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে রূপকধর্মী প্রতিবাদ। বার্লিনের কোনো একটি চলচ্চিত্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে এই চলচ্চিত্রের সবটুকুই হারিয়ে গেলো।

নানা বিচিত্র বিষয় আইজেনস্টাইনকে আকর্ষণ করতে থাকে। তার সাথে রাশিয়ার বাইরের প্রযোজকদেরও তিনি প্রস্তাব দিতে থাকেন। কখনো ফরাসি বা ইংরেজ কোম্পানিকে, কখনো আমেরিকান কোম্পানিকে। কিন্তু অসম্পূর্ণ কাজের সংখ্যা বেড়েই চললো।

আবার অন্যদিকে আইজেনস্টাইনের নাম কিছুটা বাণিজ্যিক মূল্য পায়। প্যারিসে আলেকজান্দ্রভ এবং টিসে যে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সাঙ্গীতিক চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন, তার প্রযোজক আইজেনস্টাইনের নাম যৌথপরিচালক হিসাবে রাখার শর্তে অর্থ লগ্নী করেন। পারতপক্ষে, চলচ্চিত্রটিতে কদাচিৎ পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আইজেনস্টাইন আর কিছুই করেননি।

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ. আইজেনস্টাইনকে 'আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান' (Arms And the Man) নাটকটিকে চলচ্চিত্রায়িত করার প্রস্তাব দেন। প্রযোজকদের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া যায়নি।

প্যারিসে আইজেনস্টাইন চুক্তিবদ্ধ হন প্যারামাউন্ট কোম্পানির সাথে। প্রস্তাব আসে এইচ. জি. ওয়েলসের কল্প-বিজ্ঞানের কাহিনী 'দ্য ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস' চলচ্চিত্রায়িত করার। কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে বাতিল হয়ে যায়।

১৯৩০ সালে আইজেনস্টাইনের সাক্ষাৎকার নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়, যখন তিনি হল্যান্ডের 'ফিল্ম-লিগা' (Film-Liga) সংস্থাতে বক্তৃতা দেওয়ার সফরে গিয়েছিলেন।

এই সময়ে বিগত কয়েক বছরের থেকেও বেশি তাত্ত্বিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন আইজেনস্টাইন। তার মধ্যে কিছুটা হচ্ছে রাশিয়ার চলচ্চিত্র সম্পর্কে পর্যালোচনা।

এই ১৯৩০ সালেই সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইজেনস্টাইন যে বক্তৃতা দেন তা প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি চলচ্চিত্রের চতুর্থ মাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করেন, এই বিষয়ের পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে।

আইজেনস্টাইনের আমেরিকা সফর নানা সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয়। আমেরিকার বিখ্যাত 'অ্যাকাডেমি অফ মোশান পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস', ১৯৩০ সালে আইজেনস্টাইনের সাথে আলোচনার জন্য এক সভার আয়োজন করে। এই সভায় হলিউডের বিভিন্ন পরিচালক ও প্রযোজকরা অংশ গ্রহণ করেন।

আলেকজান্দ্রভ ও ইভর মন্টাগুর সাথে যৌথভাবে আইজেনস্টাইন 'সাটার্স গোল্ড' (Sutter's Gold) চলচ্চিত্রের বিশদ প্রকল্প প্যারামাউন্ট কোম্পানিকে জানান। কিন্তু চলচ্চিত্রটি বাস্তবায়িত হয় না।

প্যারামাউন্ট কোম্পানির কাছে 'অ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি'র চলচ্চিত্রের বিশদ প্রকল্প পাঠানোর পরে, সেটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

অনেক বছর ধরেই হাইটি দ্বীপের বিপ্লবের বিষয়ে চলচ্চিত্র করার পরিকল্পনা ছিল আইজেনস্টাইনের। সেটি আরও পরিপক্ক করে তোলার মধ্য দিয়ে, আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত নিগ্রো গায়ক পল রোবসনকে দিয়ে অভিনয় করানোর পরিকল্পনা চলতে থাকে।

আইজেনস্টাইনের সাথে পল রোবসনের সাক্ষাতের এক চমৎকার ইতিহাস আছে। আইজেনস্টাইন পল রোবসনকে দেখার আগেই পরিকল্পনা করেছিলেন হাইটি বিপ্লবের চলচ্চিত্রে পল রোবসনকে অভিনয়ের প্রস্তাব দেবেন। রোবসনকে দেখার আগেই তাঁর সম্পর্কে নানা বিষয় জেনে নিয়েছিলেন আইজেনস্টাইন। অবশেষে লণ্ডনে রোবসনের সাথে ম্যারি সেটন (Marie Seton) দেখা করে আইজেনস্টাইনের আমন্ত্রণপত্র দেন। তারই ফলস্বরূপ আদরের 'পাভেল রোবেসনা' (রাশিয়ার মানুষ যে নামে রোবসনকে ডাকতো) একদিন এসে পৌঁছলেন মস্কোয়।

পরিকল্পনা ছিলো অনেক, আইজেনস্টাইনের সাথে রোবসনের গভীর বন্ধুত্বও হয়েছিলো। তবুও আইজেনস্টাইনের পরিচালনায় রোবসনের অভিনয়-করা যুগান্তকারী চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব হলো না।

মেক্সিকোয় আইজেনস্টাইন গিয়েছিলেন আপটন সিনক্লেয়ারের মাধ্যমে, 'কিউ ভিভা মেক্সিকো!' (Que Viva Mexico) চলচ্চিত্রের কাজে। আইজেনস্টাইন ও আলেকজান্দ্রভ এই চলচ্চিত্রের যৌথপরিচালক, টিসে এর আলোকচিত্রকর। এই চলচ্চিত্রের খানিকটা অংশ নিয়ে ১৯৩৩ সালে সল লেসার (Sol Lesser) 'থাণ্ডার ওভার মেক্সিকো', এবং দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের 'ডেথ্ ডে' এবং 'আইজেনস্টাইন ইন মেক্সিকো' চলচ্চিত্র তৈরির কাজে লাগান। এবং ১৯৩৯ সালে ম্যারি সেটন এর বাকি অংশ 'টাইম্স্ ইন দ্য সান' চলচ্চিত্র হিসাবে প্রকাশ করেন।

'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের সারাংশ লেখা হয় ১৯৩১ সালে, আর ছাপার অক্ষরে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। আইজেনস্টাইনের জীবদ্দশায় এ চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণ হয় নি।

অনেক বছর পরে এই চলচ্চিত্রটি সম্পাদনা করার চেষ্টা করা হয়।

কয়েকটা বছর আইজেনস্টাইনের কেটে যায় স্বদেশ রাশিয়ায়।

আইজেনস্টাইনের পশ্চিমে সফর, চলচ্চিত্র নির্মাণের দিক থেকে সার্থক হয়ে ওঠে না। যখন সবাক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব হয়, তখনই আইজেনস্টাইনের পশ্চিমের দিকে সফর শুরু। বিদেশের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মহলে আইজেনস্টাইনের যে সম্মান, তা ছিলো তাঁর চলচ্চিত্রের শিল্পগুণ এবং নির্মাণকৌশলের তত্ত্বের প্রতি পশ্চিমের শ্রদ্ধা। আর এমনই একটা সময়কালে প্যারামাউন্ট কোম্পানির সাথে তিনি চুক্তিবদ্ধ হলেন।

পশ্চিমের পুঁজিবাদী চলচ্চিত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা আইজেনস্টাইনের কাছে নতুন। তিনের দশক তখন ইউরোপ আমেরিকার বুকে দ্রুত ছুটে চলেছে। চলচ্চিত্রে যেমন অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা দৃষ্টান্ত, তেমনই নানা দেশে তখন সামাজিক-রাজনীতিক উত্থানপতনের ঢেউ।

নিজের পিছনে আইজেনস্টাইন তখন রেখে এসেছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র আর বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা। তিনের দশকের কয়েকটা বছর মাতৃভূমি রাশিয়ায় অনুপস্থিত থেকেছেন তিনি। প্যারামাউণ্ট কোম্পানি হয়তো ভেবেছিলো, ইউরোপের আর পাঁচটা পরিচালকের মতো আইজেনস্টাইনকেও তারা হাতের মুঠোয় পেয়েছে। এটা যে কতখানি অসম্ভব ছিলো, তা আইজেনস্টাইনের পশ্চিমের বছরগুলোতেই স্পষ্ট। অপরিচিত পশ্চিমে আইজেনস্টাইন, আলেক-জান্দ্রভ এবং টিসের যোগাযোগকারী ছিলেন ইভর মণ্টাগু। আর মণ্টাগুর উপস্থিতি ও সহযোগিতায়, রাশিয়ার এই তিন শিল্পকর্মী পশ্চিমে একের পর এক চলচ্চিত্র তৈরির চমকপ্রদ প্রস্তাব দিয়ে, প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। রাশিয়ার চলচ্চিত্রের নির্মাণ-কৌশলের ও তত্ত্বের শিক্ষা বুকে নিয়ে এঁরা পশ্চিমে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে এসেছিলেন। আর সেই ধারাতেই চিত্রনাট্য ও পরিকল্পনা করেছিলেন।

পশ্চিম সব সময় আইজেনস্টাইনের উপস্থিতিতে দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। অ্যাকাডেমি অফ মোশান পিকচার আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেস দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে, ১৯৩০ সালে চলচ্চিত্রের পর্দার সঠিক পরিমাপ ও আকৃতি সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের বক্তৃতায়। একজন চলচ্চিত্রকার, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পর্দা সম্বন্ধে এমন সব বিশ্লেষণ করতে বসবেন, পশ্চিম তখন কল্পনাও করতে পারতো না। যেমন, 'অ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি' এবং 'সাটার্স গোল্ড' চিত্রনাট্য দুটি দেখে পারতপক্ষে প্রযোজক চমকে উঠেছিলো। বলা হয়ে থাকে যে, সম্ভবত আইজেনস্টাইনদের চিত্রনাট্যের বিশদ ও সম্পূর্ণ আকৃতি প্যারামাউণ্ট কোম্পানিকে অস্বস্তিতে ফেলে। দুটি চিত্রনাট্যই পরে নতুন করে লেখা হয় এবং অন্যদের দিয়ে চলচ্চিত্রায়িত করা হয়। আইজেনস্টাইনের চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এমনি করেই।

আপটন সিনক্লেয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় আইজেনস্টাইন যখন 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্র শুরু করলেন, তখনও অন্য কারো ধারণাতে ছিলো না চলচ্চিত্রটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। মেক্সিকোর ইতিহাসের এক মহাকাব্য রচনা হচ্ছে, এই কল্পনাটুকু ছাড়া, কেউ কোনো অনুমান করতে পারছিলো না। ম্যারি সেটনের হিসেব অনুযায়ী, 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের জন্যে আইজেন-স্টাইন তখন দেড় লক্ষ ফুট দৃশ্য গ্রহণ করে ফেলেছিলেন, যদিও তখনও চলচ্চিত্রটি শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না। এইসব অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানায় সিনক্লেয়ার ঘোষণা করে বসলেন যে তাঁর আর্থিক সম্বল শেষ হয়ে

গেছে এবং চলচ্চিত্রটির পরিণতি সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের সাথে তিনি একমত হতে পারছেন না।

গৃহীত অংশ সিনক্লেয়ারের দখলে আর তিনিই ঠিক করলেন অন্য বাণিজ্যিক প্রযোজক। কিন্তু আমেরিকায় আইজেনস্টাইনের সমর্থকেরা রীতিমত গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে অর্থসংগ্রহ করতে নামলো এবং 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের সমস্তটুকুই আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে উদ্ধার করে আইজেনস্টাইনের হাতে তুলে দিতে চাইলো। আইজেনস্টাইন তখন রাশিয়ায় ফিরে গেছেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে বিতর্ক ও তিক্ততার ভেতরে রাজনীতিক মতামতও প্রবেশ করেছে। যখন কিছু অংশ নিয়ে মেক্সিকো সম্পর্কে একের পর এক ছোট বড় চলচ্চিত্র সম্পাদিত হলো আইজেনস্টাইনের 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের উপাদানে, তখন নিন্দা ও প্রশংসা ছড়িয়ে পড়লো আমেরিকায়। আইজেনস্টাইনের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্র নির্মিত হলে কেমন হতো, সেটা আর বোঝার উপায় ছিলো না। তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আইজেনস্টাইনের নামটাও অযথা জড়িয়ে পড়লো।

'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের দৃশ্যে কিন্তু একটা অনবদ্য বৈশিষ্ট্য দেখা গেলো। এই চলচ্চিত্রেই আইজেনস্টাইন তাঁর জীবনের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সব থেকে ঘনিষ্ঠভাবে সাধারণ মানুষের ছবি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সেই সাধারণ মানুষ তাঁর সম্পাদনায় চলচ্চিত্রে কোন্ ভূমিকা পালন করতো, লক্ষাধিক ফুট দৃশ্যেও তা আন্দাজ করার উপায় নেই।

আইজেনস্টাইনের উপস্থিতিতে পশ্চিমের বিদেশ চমৎকৃত, স্তম্ভিত ও বিরক্ত। পশ্চিম জয় করে নয়, তাকে ভীষণ নাড়া দিয়ে ঘরে ফিরলেন আইজেনস্টাইন। কয়েকটা বছর তখন কেটে গেছে।

সবাক চলচ্চিত্র শুরু হওয়ার পরেই আইজেনস্টাইন ও পুদভ্কিন, আলেকজান্দ্রভের সাথে খাতায় কলমে চলচ্চিত্রের নতুন সময়কে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এবার রাশিয়ায় ফিরে আইজেনস্টাইনকে ভাবতে হলো, অতীতের নির্বাক চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ দিয়ে সবাক চলচ্চিত্র তৈরির সমস্যা নিয়ে।

১৯৩১ সালের পর থেকে রাশিয়ায় বসে আইজেনস্টাইন অনেক বেশি সুস্পষ্টভাবে চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও ব্যাকরণের বিষয়ে লেখায় মন দিয়েছেন এবং চলচ্চিত্রের শিক্ষক হিসেবে গুরুতর ভূমিকা পালন করেছেন। রাশিয়ার স্টেট ইনস্টিটিউট অফ সিনেমাটোগ্রাফিতে আইজেনস্টাইনের শিক্ষাদানের নথিপত্র দেখলে বোঝা যায়, চলচ্চিত্রের কতখানি অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন তিনি।

তাঁর সমস্ত কর্মজীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কী বিচিত্র স্বপ্ন ও পরিকল্পনা নিয়ে আইজেনস্টাইন ব্যস্ত থাকতেন।

মস্কোতে ফিরেই আইজেনস্টাইন আবার শুধু চলচ্চিত্র নয়, নাটকের সঙ্গেও

জড়িয়ে পড়লেন। নাতান জার্খি (Natan Zarkhi) আইজেনস্টাইনের সাথে হাত মেলালেন তাঁকে মস্কো সম্পর্কে নাটকে ফিরিয়ে আনতে। এর সাথেই মস্কোর ইতিহাসের ওপর চলচ্চিত্র তৈরির বিশাল পরিকল্পনাও শুরু হলো। কিন্তু, ১৯৩৪ সালে জার্খির মৃত্যুর সাথে সাথে মস্কোকে নিয়ে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র ও নাটকের কাজ থেমে যায়।

আইজেনস্টাইন এবার পরিকল্পনা করতে নামেন 'বেঝিন মিডো' (Bezhin Meadow) চলচ্চিত্র, মস্ফিল্মের প্রযোজনায়। তুর্গেনিভের একটি ছোট গল্পের ভিত্তিতে এর মূল চিত্রনাট্য। আলোকচিত্রকর টিসে। নানা টালবাহানার পর এই অসম্পূর্ণ চলচ্চিত্রটি একেবারেই স্থগিত রইলো।

তিনের দশকের মাঝামাঝি সময় ইউরোপে তখন ফ্যাসিজম্ এবং নাট্সিজমের বিষাক্ত বাতাস। এমন একটা পরিবেশের মধ্যে আইজেনস্টাইন নীরব থাকতে পারলেন না।

জার্মানির প্রচারমন্ত্রী গোয়েবল্স্ (Goebbles) যখন ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জার্মান চলচ্চিত্র প্রযোজকদের সামনে বক্তৃতা করলো, তখন আইজেনস্টাইন এ প্রসঙ্গে একটি খোলা চিঠি পাঠান। এই খোলা চিঠি ফ্যাসিবাদ, জার্মান চলচ্চিত্র এবং বাস্তব জীবন সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের মতামতকে প্রকাশ করে। শুধু মস্কোতে নয়, এই চিঠির ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও ব্যাকরণ নিয়ে আইজেনস্টাইনের আরও লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে এবং তারও পরে। কিন্তু নাটকের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়ে যায় নি। তাই মস্কোয় মাই লান-ফ্যাঙের অপেরা অনুষ্ঠান সম্পর্কেও ১৯৩৫ সালে নিবন্ধ প্রকাশ করেন আইজেনস্টাইন। যেমন থিয়েটার থেকে চলচ্চিত্রে পৌঁছনোর স্মৃতিচারণার মতো নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে।

রাশিয়ার হাইয়ার স্টেট ইনস্টিটিউট অফ সিনেমাটোগ্রাফি (V. G. I. K.) প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র পরিচালনার বিশদ পাঠক্রম তৈরি করেন আইজেনস্টাইন ১৯৩৬ সালে। ইতালিতে ফ্যাসিবাদ, জার্মানিতে নাট্সিবাদের মতো স্পেনে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিলো, আইজেনস্টাইন পরিকল্পনা করেছিলেন স্পেনের সেই গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে চলচ্চিত্র তৈরি করার। এবারও সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

আইজেনস্টাইনের পরিচালনায় এই সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছিলো 'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' (Alexander Nevsky) চলচ্চিত্র, ১৯৩৮ সালে।

চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছিলো মসফিল্ম (Mosfilm), দৃশ্যগ্রহণ করেছিলেন আইজেনস্টাইনের চিরসঙ্গী এডোয়ার্ড টিসে। চলচ্চিত্রটির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো এর সঙ্গীত পরিচালনা।

'নেভ্স্কি' চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রাশিয়ার বরেণ্য সঙ্গীতস্রষ্টা

সের্গেই প্রকোফিয়েভ (Sergei Prokofiev)। প্রকোফিয়েভের সাথে আইজেনস্টাইনের এই কাজ, অসংখ্য ঘটনাবহুল। সারা বিশ্বের শ্রদ্ধার পাত্র প্রকোফিয়েভ স্রষ্টা হিসাবে যেমন অতুলনীয়, কর্মী হিসাবেও তেমনি অবিশ্বাস্য। আইজেনস্টাইনের মতো বিশুদ্ধতাবাদী পরিচালকের সঙ্গে, ঘড়ির সময়ের সেকেন্ডের হিসাবে নিখুঁত সঙ্গীত সৃষ্টি করে গিয়েছেন প্রকোফিয়েভ।

'নেভস্কি' চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯৩৮ সালের ২৩ নভেম্বর।

'নেভস্কি' চলচ্চিত্রের নির্মাণ সম্পর্কে বিবরণ ১৯৩৯ সালে 'ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে সময়ে অন্য রচনার সাথে আইজেনস্টাইন স্পষ্ট ভাষায় লেখেন 'দেশপ্রেম আমার বিষয়বস্তু' (My Subject is Patriotism)।

মধ্য এশিয়ার প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাসের চলচ্চিত্রায়নের পরিকল্পনা একটুখানি এগিয়ে থেমে যায়। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক দৃশ্য গ্রহণ করেন টিসে এবং সুরসৃষ্টি করেন সের্গেই প্রকোফিয়েভ। অসম্পূর্ণ সামান্য অংশ নিয়ে শুধু একটি তথ্যচিত্র 'ফেরঘানা ক্যানাল' (Ferghana Canal) সম্পাদনা করা সম্ভব হয়।

১৯৪০ সালে আইজেনস্টাইন জীবনে প্রথম অপেরা পরিচালনা করেন। রিচার্ড ভাগনারের (Richard Wagner) অপেরার 'ডি ভালক্যুরে' (Die Walkure) মঞ্চস্থ হয় ১৯৪০ সালে ২১ নভেম্বর মস্কোর বলশয় অপেরা থিয়েটারে, আইজেনস্টাইনের পরিচালনায়।

পূর্ববর্তী কয়েকটি চলচ্চিত্রের কাজ, যেমন দৃশ্যপরিকল্পনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের খুঁটিনাটি স্কেচ আইজেনস্টাইন নিজে হাতে করেছেন, এবারে অপেরাতেও তাই করলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো বিখ্যাত এই চলচ্চিত্র পরিচালকের জীবনের প্রথম অপেরা পরিচালনার অভিজ্ঞতা।

১৯৪১ সালে ইউরোপ আরও উত্তাল। ফ্যাসিবাদ আর যুদ্ধ পৃথিবীর আকাশ বাতাস আতংকময় করে তুলছে। আইজেনস্টাইন এ সময়ে লিখেছেন 'ফ্যাসিবাদকে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করতে হবে' (Fascism must and shall be destroyed)।

চলচ্চিত্রের ভাষায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংবাদচিত্র তৈরি করার প্রকল্পে নেমে পড়েন আইজেনস্টাইন। 'নাট্সিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বা 'ফ্যাসিবাদের চেহারা' নামে পরিচিত এই প্রকল্প কিন্তু অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

জীবনের শেষ বৃহত্তম প্রকল্প 'আইভান দ্য টেরিবল্' (Ivan the Terrible) চলচ্চিত্রের কাজে হাত দেন আইজেনস্টাইন। পরিকল্পনা ছিল তিনটি ভাগে চলচ্চিত্রটি শেষ করার। মস্কোর বুকে নাট্সিদের হিংস্র থাবার আক্রমণ আসার আগে এ চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা চলছিলো। কিন্তু যতদিন না মস্কো নাট্সিদের হাত থেকে মুক্তি পেলো, ততদিন কাজ শুরু করা গেলো না।

মস্কোর মসফিল্ম স্টুডিও মুক্ত হবার পর 'আইভান' চলচ্চিত্র তৈরি হতে পারলো। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা আইজেনস্টাইনের। বহির্দৃশ্যগ্রহণের দায়িত্বে রইলেন টিসে এবং অন্তর্দৃশ্যগ্রহণের দায়িত্বে রইলেন আন্দ্রেই মসভিন।
তিন পর্বের এই চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বেরও দৃশ্যগ্রহণ বেশির ভাগই শেষ হয় প্রথম পর্বের সাথে। সার্বিকভাবে প্রথম পর্ব শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায় ১৯৪৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর। এই চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন প্রকোফিয়েভ। দৃশ্য পরিকল্পনা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের স্কেচ এবারও আইজেনস্টাইনই করেন। মস্কো বা বিদেশে ১৯৪৫ সালে আইজেনস্টাইনের 'আইভান' চলচ্চিত্রের সংবাদ ও পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।
১৯৪৬ সালের শুরুতে 'আইভান' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বের সম্পাদনা শুরু করেন আইজেনস্টাইন। আর ঠিক তখনই এক বিপজ্জনক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বছরের বাকি সময়টা হাসপাতালে থাকতে বাধ্য হন তিনি।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে আইজেনস্টাইন অবর্ণনীয় চাপের মধ্যে নানা ধরণের চলচ্চিত্রের কাজ করতে চেষ্টা করেছেন। আর যখন যুদ্ধের শেষে 'আইভান' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্ব শেষ করা গেলো, তখন রাশিয়ার মানুষ এক পুরনো ইতিহাসের পটভূমিতে সমসাময়িক স্বদেশকে অনুভব করলো।
সমালোচকরা কেউ বললেন, 'আইভান' চলচ্চিত্রে স্তালিনবাদের ভূমিকার সমালোচনা করা হয়েছে। কেউ বললেন, আইজেনস্টাইন বিশেষ কোনো দেশ বা কাল নয়, সাধারণভাবেই ক্ষমতার চরিত্র সম্পর্কে এই চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন।
যাই হোক না কেন, 'আইভান' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বের সম্পাদনার সময়কালে আইজেনস্টাইনকে এক বিরাট সমালোচনার মুখোমুখি হতে হলো। হৃদ্‌রোগের আক্রমণের হাত থেকে সামান্য সুস্থ হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর চলচ্চিত্রকে 'ইতিহাসের ভুল চিত্রায়ণ' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।
দ্বিতীয় পর্বে 'আইভান' চলচ্চিত্র বিষয়ে আইজেনস্টাইনের সাথে জোসেফ স্তালিনের বৈঠক হলো। এই দ্বিতীয় পর্ব পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়ে আইজেনস্টাইন সম্পাদনায় হাত দিলেন আর তারই সঙ্গে প্রস্তুতি চললো তৃতীয় ও শেষ পর্ব তৈরি করার।
কিন্তু…
১৯৪৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, মৃত্যু হলো আইজেনস্টাইনের। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরে, 'আইভান' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পেয়েছিলো। সাম্যবাদ, রাশিয়ার এবং বিশ্বের সাধারণ মানুষদের লড়াই সম্পর্কে একান্ত বিশ্বাসে, আইজেনস্টাইন তাঁর শেষ কয়েকটা বছর বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড়ের মধ্যে কাটিয়ে গেছেন।
মাত্র ছ'টি চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু আইজেনস্টাইনের সমগ্র জীবনের

প্রত্যেকটি ঘটনা, তাঁর সৃষ্টি ও জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে। এবার তাই আমাদের জানতে হবে আইজেনস্টাইনের কর্ম ও জীবনের বিশদ ঘটনাবলী।

কেমন করে চলচ্চিত্রকার হলেন

আইজেনস্টাইন নিজেই লিখে গেছেন তাঁর জীবনের অজস্র ঘটনার খুঁটিনাটি। হয়তো নিছক অনুবাদ করে দিলেও তাঁর নিজের লেখা থেকেই সমস্ত জীবনী আমরা তৈরি করে নিতে পারি। কিন্তু এখানে পাঠকের ভাষায় তাঁর লেখাকে যেমন দেখি, তেমনি করেই বলছি।

সে অনেকবছর আগেকার কথা, আইজেনস্টাইন তখন ছোট্ট কিশোর। কেমন করে জীবনে শিল্পকলার মধ্যে তিনি এসে পড়েন, তা স্পষ্টভাবে মনে পড়ে। ১৯১৩ সালে তাঁর জন্মস্থান রিগাতে ঘুরতে এলো নেজ্‌লোবিন থিয়েটার। তারা মঞ্চস্থ করলো 'তুরান্দৎ' নাটক। আইজেনস্টাইন সে নাটক দেখে মুগ্ধ। আর সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হলো তাঁর নাটকের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু নাটকের জগতে প্রবেশ করার কোনো ইচ্ছে তখন তাঁর ছিলো না।

তাঁর বাবার পথ ধরেই তখন তিনি সিভিল ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু জীবনে প্রথম নাড়া খাওয়ার পরেই দ্বিতীয়বার আবার এক নাটকে আইজেন-স্টাইন নাড়া খেলেন। পিটার্সবুর্গে আলেকজান্দ্রিনস্কি থিয়েটারের 'ম্যাসক্যেরেড' নাটক তাঁর মনে ইঞ্জিনীয়ারিঙের বদলে নাটকের স্থান করে দিলো। আইজেনস্টাইন এই দুটি ঘটনার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ থেকেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো পাঠক্রমে উচ্চতর গণিতের যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, সত্যি বলতে কি, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেকটা ঝাপসা। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আইজেনস্টাইন যতখানি যুক্তি ও গাণিতিক সূক্ষ্মতায় কাজ করতে ভালোবাসতেন, সেটা তাঁর প্রথম জীবনের গণিতের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত।

রাশিয়ার বৈপ্লবিক ভাঙাগড়ার সময় আইজেনস্টাইন সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিঙের শিক্ষায়তন থেকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আর সেই শিক্ষায়তনে ফেরেননি। ঠিক ঐ কটা বছরের অভিজ্ঞতা নিজেও খুব বিশদ করে বলেন নি।

প্রথম প্রোলেৎকুল্ত শ্রমিকদের থিয়েটারে ডিজাইনার হিসাবে কাজ করার পরেই আইজেনস্টাইন মঞ্চ নির্দেশক হতে পারেন। এক সময় সেখানেই চলচ্চিত্র নির্দেশকও হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর কাছে এ সবের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ

ছিলো শিল্পকলার রহস্যাবৃত চরিত্র। সেখানে এমন কোনো আত্মত্যাগ নেই যা কথা যায় না।

এক সময় মস্কোয় ফিরে এসে তিনি জেনারেল স্টাফ অ্যাকাডেমির প্রাচ্য ভাষা বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। আর এটা করতে গিয়ে তাঁর দখলে এসেছে হাজার খানেক জাপানি শব্দ এবং কয়েকশত চিত্রলিপি (Hieroglyphs)। তাঁর কাছে এই অ্যাকাডেমি নিছক মস্কো ছিলো না। এখানেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো প্রাচ্যকে জানা এবং শিল্পকলার যাদুকরী প্রকৃতিকে জানা। তাঁর কাছে শিল্পকলার এই যাদু ছিল জাপান ও চীনের সঙ্গে জড়িত।

ইউরোপীয় ভাষার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক অজানা ভাষার শব্দাবলী স্মৃতিতে ধরে রাখতে আইজেনস্টাইন বহু রাত কাটিয়েছেন। আর এটা করতে গিয়ে তিনি শব্দাবলীর মধ্যে নানা সাযুজ্যের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। জাপানি শব্দের সাথে রুশ শব্দের কোথায় মিল, কোথায় অমিল খুঁজেছেন তিনি। জাপানি ভাষা খুব কঠিন লেগেছে। তার অন্যতম কারণ হলো, ইউরোপীয় ভাষার শব্দের ক্রম জাপানি ভাষার সাথে মেলে না। তাই এক অনভ্যস্ত চিন্তার পদ্ধতি দিয়ে তাঁকে জাপানি ভাষার শব্দ, বাক্য রচনা বুঝতে হয়েছে। এই প্রাচ্য ভাষার আশ্চর্য চিন্তার পদ্ধতি আর চিত্রলিপিতে তার লেখার কৌশল, তাঁকে চলচ্চিত্রের মন্তাজের প্রকৃতি শিখতে পরবর্তীকালে সাহায্য করেছে। আর তারও অনেক পরে প্রাচ্যের এই চিন্তাভাবনার আবেগপ্রবণ পদ্ধতি, যা তাঁর অভ্যস্ত যৌক্তিক পদ্ধতি থেকে ভিন্ন, সাহায্য করেছে শিল্পকলার পদ্ধতি বুঝতে। তাই জীবনের এই পর্যায়ে, তরুণ আইজেনস্টাইনের মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠেছে এই প্রথম নতুন শিক্ষার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই ভালোবাসা শুধু শান্তিতে ভরা ছিলো না, এর সঙ্গে বিষাদও জড়িয়ে ছিলো।

বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন আপেলের পতন দেখে বিজ্ঞানের যে নিয়মাবলী আবিষ্কার করেছিলেন, এই কাহিনী আইজেনস্টাইনের খুব পছন্দ হতো। আলেকজান্দার নেভ্স্কি সম্পর্কে এমনি এক আপেলের মতো কাহিনী তিনি চলচ্চিত্রে যুক্ত করেছিলেন। আসলে নিজের শিল্পীজীবনের শুরুতে এমনি এক আপেলের ভূমিকা তাঁকে নাড়া দিয়েছিলো।

সে ঠিক আপেল নয়। প্রোলেৎকুল্ত থিয়েটারে এক মহিলা কর্মচারির সাত বছরের ছেলে, যে প্রায়ই নাটকের মহড়া দেখতে আসতো। এই ছোট্ট ছেলেটির মুখটি ছিলো গোলগাল।

একদিন ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলেন আইজেনস্টাইন। ছেলেটির মুখেচোখে শুধু যে অভিনেতাদের অভিনয়ভঙ্গীর ছাপ ছিলো তাই নয়, এমন কি মঞ্চে কি ঘটছিলো তারও ছাপ ছিলো। ছেলেটি ঠিক নকল করছিলো কিনা বলা যায় না, কিন্তু সে যা দেখছিলো তারই ছাপ একই সাথে

তার মুখে দেখা যাচ্ছিলো। বিস্মিত আইজেনস্টাইন এই একই সাথে প্রতিফলন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন, এই প্রতিফলনের প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন বেশি করে।

তখন ১৯২০ সাল। মস্কোয় তখন ট্রাম চলতো না। মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রাঙ্গণ থেকে চিস্তিয়ে প্রুদিতে আইজেনস্টাইনের ঠাণ্ডা ঘর পর্যন্ত হেঁটে আসার সময়টুকুতে তাঁর ভাবনা-চিন্তা করার অনেকটা অবকাশ মিলতো। তিনি যা পর্যবেক্ষণ করেছেন, সবকিছুই ভাবতে ভাবতে হাঁটতেন।

জেমসের বিখ্যাত উক্তি, "আমরা দুঃখিত বলে কাঁদি না, আমরা কাঁদি বলে দুঃখিত", তখন আইজেনস্টাইনের জানা ছিলো। এটা যেন সৌন্দর্যতত্ত্বের একটা সূত্র বলে তাঁর মনে ক্রিয়া করতো। একটা আবেগের বিশদ উপকরণ দেখালে আবেগটাই আরও জেগে ওঠে। তাই তাঁর মনে হয়েছিলো ঐ সাত বছরের ছোট্ট ছেলেটির মুখেচোখে যে অভিনয়ভঙ্গীর প্রতিফলন, সেটা নিশ্চয়ই ছেলেটির বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলনকেই জাগিয়ে তুলছে। একজন পরিণত বয়স্ক দর্শক তাই হয়তো বাস্তব কারণ না থাকলেও, কোনো নাটক দেখে কল্পনাচ্ছলে (Fictitiously) নিজেকে নাটকের নায়কের মতো প্রকাশ করতে পারে। মঞ্চের বীরত্ব বা অপরাধ, যে কোনো অনুভূতি এই দর্শকের চোখেমুখে প্রকাশ পাবে। সে কখনো ঈশ্বরের প্রেরণায় জোয়ান অফ আর্ক, কখনো রোমিওর মতো প্রেমিক। আইজেনস্টাইনের মাথায় তখন খেলছে এই কথাটাই যে, কল্পনাচ্ছলের কাণ্ডকারখানাই একজন দর্শকের সন্তোষের কারণ হয়।

কুবনাইয়া স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আশংকিত হয়ে পড়তেন আইজেন-স্টাইন—"এটা কী ভয়ানক!" কোন্ প্রক্রিয়া আইজেনস্টাইনের আরাধ্য পবিত্র শিল্পকলার মধ্যে চলতে থাকে? এটা মিথ্যার থেকেও বেশি, প্রতারণার থেকেও বেশি। এটা বিপজ্জনক, ভয়ংকর বিপজ্জনক। মানুষ কেন তখন আর বাস্তবকে চাইবে, যখন সে মাত্র কয়েক টাকার বিনিময়ে আরামে নাটক দেখে নিজের কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে? এসব কথা আইজেনস্টাইনের মনে তোলপাড় করতো। যখন তিনি মাইয়াস্নিৎস্কাইয়া স্ট্রিট থেকে পোক্রোভ্স্কিয়ে গেট পর্যন্ত হেঁটে আসতেন, তখন তাঁর মনে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের জন্ম হতো।

আইজেনস্টাইন তখন মাত্র বাইশ বছরের তরুণ। তারুণ্য কখনো অতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলো না। তখন তাঁর মনে হচ্ছিলো দুঃস্বপ্নকে ধ্বংস করতে হবে। মনে হচ্ছিলো থিয়েটারকেই ধ্বংস করতে হবে। এটা খুব বীরত্বের প্রকাশ কি না বা অল্পবিদ্যার ঘটনা কি না বলতে পারা যায় না। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিলো, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়াও আরও অনেকেই থিয়েটারকে হত্যা করার মহৎ ইচ্ছার মধ্যে ডুবে আছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের মানুষদের সাথে আইজেনস্টাইন

১৯৪১ সালে আইজেনস্টাইন স্টেট ইন্‌স্টিটিউট অফ সিনেমাটোগ্রাফিতে পরিচালনার ক্লাস নিচ্ছেন

আইজেনস্টাইন ও টিসে (১৯২৫)

মেক্সিকোয় দৃশ্যগ্রহণপর্ব

চারপাশেই তখন শিল্পকলাকে ধ্বংস করার দাবি চলছে। শিল্পকলার মূল উপকরণকে বাতিল করে তথ্য ও নথিপত্র হাজির করা হচ্ছে। একটা অন্তর্বস্তুকে বাতিল করে ভাবমূর্তিকে খাড়া করা হচ্ছে। শারীরিক ঐক্যের পরিবর্তে একটা গঠনবাদী চিন্তা এসে হাজির হচ্ছে। কল্পনা বা কাহিনী বাদ দিয়ে শিল্পকলার স্থান দখল করেছে বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীর উপস্থাপনা।

সে সময়কার ঘটনা " , জীবনের শেষপ্রান্তে বসে আইজেনস্টাইন লিখছেন ১৯৪৫ সালে, তখন তাঁর পেছন ফিরে তাকানোতে অনেক বেশি পরিপক্কতা। পরিণত বিশ্লেষণ দিয়ে, আইজেনস্টাইন তাঁর তরুণ বয়সের পারিপার্শ্বিককে শিল্পকলার ধ্বংসযজ্ঞ বর্ণনা করেছেন।

ভবিষ্যৎমুখী লেখক ও সমালোচকরা ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত 'লেফ্‌ট ফ্রন্ট ইন আর্ট" (Left Front in Art) সংগঠিত করেছেন। সংক্ষেপে এই সংগঠনকে বলা হতো 'লেফ্‌' (Lef)।

আইজেনস্টাইন দেখেছেন, এই 'লেফ্‌' সংগঠন সমাজের বিভিন্ন স্তর ও মানসিকতার মানুষকে একই মঞ্চে জড়ো করেছে শিল্পকলাকে সক্রিয়ভাবে ঘৃণা করার জন্যে। কিন্তু আইজেনস্টাইনের মতো একজন তরুণ ছেলে যার নিজের পায়ের তলায় শিল্পকলার প্রতিষ্ঠিত চর্চার মাটি নেই, কেমন করে এই ইতিহাসের কয়েক শতকের কর্মকাণ্ডের পরিণতি হিসাবে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান, শিল্পকলার বিরুদ্ধে লড়বে ? তাঁর গলা ভেঙে গেলেও কি তিনি পারবেন ?

হঠাৎ একটা ভাবনা এলো। প্রথমে শিল্পকলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তারপরে এটাকে ধ্বংস করতে হবে। প্রথমে শিল্পকলার রহস্য ভেদ করে ঢুকতে হবে, তারপর এটার আবরণ খুলে দিতে হবে। শিল্পকলার দক্ষতা অর্জন করে, দক্ষ শিল্পী হতে হবে। তারপর এর মুখোশ খুলে ফেলতে হবে। একে প্রকাশ করতে হবে। একে ধ্বংস করতে হবে।

শিল্পকলার সাথে আইজেনস্টাইনের সম্পর্কের এক নতুন স্তর শুরু হলো। আইজেনস্টাইন এমন এক খুনী হিসাবে প্রস্তুত হতে থাকলেন, যে খুনের শিকার হলো শিল্পকলা। দক্ষ খুনী যেমন তার শিকারের প্রত্যেকটা চালচলন খুঁটিনাটির খবর রাখে, ভবিষ্যতের হত্যাকারী আইজেনস্টাইন ঠিক তেমনিভাবে শিল্পকলা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেন।

যথার্থ খুনীর মতো তাঁর শিকারের সঙ্গে আইজেনস্টাইনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। তাই শিল্পকলা এবং আইজেনস্টাইন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। ধ্বংস করার শেষ আক্রমণের আগে, শিল্পকলাদেবীকে আসনচ্যুত করার আগে তিনি তাঁর বিশ্লেষণের অস্ত্র শানিয়ে নিচ্ছিলেন।

একটি সর্বহারা রাষ্ট্র যদি তার তরুণ অবস্থায় জরুরি কাজগুলো করে নিতে চায়, তাহলে তাকে হৃদয় ও মন দিয়ে সেগুলো করতে হবে। এক সময়

আইজেনস্টাইন গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। জাপানি চিত্রলিপি শিখেছেন। এ'সবই তাঁর মনে হয় সময় নষ্ট করা, অথচ এর উপকার বুঝেছিলেন অনেক পরে। শিল্পকলার পদ্ধতি এখন শিখে নিতে গিয়ে শিক্ষাকালের যথাযথ ব্যবহার তাঁকে করতে হলো।
আবার আইজেনস্টাইন বই আর নোটবইয়ের মধ্যে ডুবে গেলেন। শিল্পকলার মধ্যেও আবার তিনি দেখতে পেলেন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান—তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিয়মকানুন। একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার একেবারে হারিয়ে গেলেন শিল্পকলার তত্ত্বের মধ্যে। তিনি জানতেন তাঁর ভারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিল্পকলার সাথে সামনাসামনি লড়াই করা যাবে না। অথচ তরুণ বয়স, শিখছে অনেক সাহসী সৃষ্টিশীল ধ্যানধারণা। সেই জ্বলন্ত ইচ্ছাগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছিলো নতুন অভিজ্ঞতা প্রকাশের অজানা নতুন উপায়।
পুরনো 'সৃষ্টি' বা 'গঠন' শব্দাবলী সরিয়ে জন্ম নিচ্ছিলো একের পর এক সৃষ্টিধর্মী সফলতা। শিল্পকলার খুনী এবং শিল্পকলা তখন দুইয়ের দশকে এক অবিস্মরণীয় পরিবেশ তৈরি করেছিল। যদিও আইজেনস্টাইন শিল্পকলাকে হত্যা করার কথা ভোলেননি। কিন্তু তিনি শিল্পকলার রহস্য ও গোপন প্রকৃতি অধ্যয়ন করছিলেন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মন নিয়ে। যে মনের মধ্যে গেঁথে আছে যে কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিমাপের এককের অস্তিত্ব। আয়ন, ইলেকট্রন, নিউট্রন বিজ্ঞানে এগুলো রয়েছে। শিল্পকলা সৃষ্টিতে তাহলে প্রকাশভঙ্গীর একক কেমন হবে? নিশ্চয়ই শিল্পকলাতেও 'আকর্ষণ' থাকবে।
প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কারখানার যন্ত্রপাতির কাজে 'মন্তাজ' (montage) শব্দটির ব্যবহার হয় খণ্ড অংশকে একত্রিত করার অর্থে।
এই শব্দটি একান্ত শহুরে আইজেনস্টাইনদের খুব পছন্দ হলো। তাই 'আকর্ষণের মন্তাজ' এই শব্দাবলী ব্যবহৃত হলো। আইজেনস্টাইনের মনে হয়েছে পাভলভের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাঁর শব্দচয়নে ব্যবহার করতে পারলে তিনি, 'আকর্ষণের মন্তাজের তত্ত্ব'-কে বলতেন 'শৈল্পিক উত্তেজকের তত্ত্ব'।
এভাবেই আইজেনস্টাইনের শিল্পকলার সক্রিয়তা শুরু হয়েছিলো। সৃষ্টিধর্মী এবং বিশ্লেষণধর্মী—এই দু'ভাবেই। এখন সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ পরীক্ষা করতে লাগল। এখন কিছু তত্ত্বের ভিত্তিকে সৃষ্টি পরীক্ষা করতে লাগলো। শিল্প-কলার পদ্ধতি দখলে আনতে গেলে এ দু'টোই প্রয়োজন।
আইজেনস্টাইনের অভিজ্ঞতায় যতো সফলতাই বা ব্যর্থতাই আসুক না কেন এগুলো ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ব্যবহারিক কাজকর্ম থেকে বিশ্লেষণ ও সৃষ্টির তথ্যকে সাধারণীকরণ করে গেছেন তিনি অনেক বছর ধরে।
শিল্পকলাকে হত্যা করার পরিকল্পনা গেলো কোথায়? আইজেনস্টাইনের মতো হত্যাকারী শিল্পকলাকে শিকার করার আগেই, নিজেই শিল্পকলার শিকার

হয়ে গেছেন। নিজেই মুগ্ধ হয়ে বন্দী হয়েছেন শিল্পকলার হাতে। এক সময়ে শিল্পী হতে চেয়ে তিনি শৈল্পিক সৃষ্টির মধ্যে ডুবেছেন।

শিল্পকলা আইজেনস্টাইনের কাছে তখন দুর্দমনীয় রাণী হিসাবে আকর্ষণীয় নয়। শিল্পকলা এখন তাঁর নির্মম অভিভাবক, নির্মম শাসক। যে অভিভাবক বা শাসক তাঁকে শিল্পকলার রহস্য নিয়ে দু'এক ছত্রও লেখার সুযোগ দিতে নারাজ।

১৯৪৫ সালে এ বিষয়ে আইজেনস্টাইন যখন লিখছেন তখন তাঁর মনে হয়েছে, যে লোক একবার সৃষ্টির আশ্চর্য অভিজ্ঞতা পেয়েছে, সে সম্ভবত শিল্পকলার আধিপত্য থেকে কোনোদিন মুক্তি পাবে না। 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইন সত্যিকারের প্রেরণা পান, তাঁর প্রথম গড়ে ওঠার সময়কালের অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় থেকে।

রাশিয়ায় চলচ্চিত্রের পটভূমি

১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় যখন সোভিয়েত সরকার ক্ষমতায় এলো, তখন চলচ্চিত্র, নাটক, সংবাদপত্র, প্রকাশনা ইত্যাদি যাবতীয় জনসংযোগের মাধ্যমগুলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব এলো। নতুন সরকারের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা সমস্ত নাগরিকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো।

গত শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শুরুর বছরগুলোতে রাশিয়া, শিল্প ও সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছে। যতো আন্দোলনের ঝড়ঝাপটা আসুক না কেন, রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এমন প্রত্যক্ষভাবে ছিলো না।

মানুষের সামাজিক প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে নাটকের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা গেলো। থিয়েটার এলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। যদিও এই নিয়ন্ত্রণকে অনেকটাই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা হিসাবেই দেখা হতো। সেদিক থেকে সোভিয়েত রাশিয়া অনেকটা সফলও হয়েছিলো, শিল্পচর্চার পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন আনতে।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের নীতি থিয়েটারের মতোই ছিলো, তবে আরও বিস্তৃত। যদিও প্রথমের দিকে সোভিয়েত নেতারা চলচ্চিত্র সম্পর্কে এতো উৎসাহী ছিলো না। সম্ভবত নাটককে তারা চলচ্চিত্রের থেকেও বেশি শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম বলে মনে করতো। যখন চলচ্চিত্রের গুরুত্ব বোঝা গেলো, তখন একথা অনেকেই মানলেন যে, চলচ্চিত্র নাটকের চেয়েও শক্তিশালী মাধ্যম।

কিন্তু চলচ্চিত্রকে নাটকের থেকেও শক্তিশালী প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার সব থেকে বড়ো অসুবিধা ছিলো, আর্থিক দিক থেকে চলচ্চিত্র ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সোভিয়েত সরকার চলচ্চিত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠতে থাকে।

স্বয়ং লেনিন একবার ঘোষণা করেন—"আমার মনে হয়, রাশিয়ার জন্য সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে চলচ্চিত্র সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।"

১৯১৭ সালের সময়েই চলচ্চিত্র নিয়ে সোভিয়েত সরকার ভাবনা-চিন্তা শুরু করে এবং তারই ফলস্বরূপ পিপলস কমিসারিয়েট অফ এডুকেশন, লেনিনগ্রাদে একটি বিশেষ সিনেমা কমিশনের আয়োজন করে। এই কমিশন চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যতের নীতি নির্দ্ধারিণ করতে বসে।

১৯১৯ সালে রাশিয়ার চলচ্চিত্রের জাতীয়করণ করা হয়। যার ফলে চলচ্চিত্র প্রযোজনা এবং পরিবেশনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে সরকারের হাতে। এর পর থেকে সরকারের সতর্ক পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ দর্শকের জন্য বিশেষ ধরণের চলচ্চিত্র তৈরি হতে থাকে। রাশিয়ার নাগরিকদের এবং সরকারের জন্যে সাধারণ নীতি অনুযায়ী, গঠন ও সৃষ্টির প্রতিফলন পড়ে চলচ্চিত্রে।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ আবার ব্যবহার হতো নতুন চলচ্চিত্র তৈরির কাজে। অন্ততঃ ভাবনা-চিন্তার দিক থেকে চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ও প্রসারের এই পদক্ষেপ ছিলো অসাধারণ।

বিদেশের সাহিত্যের সাথেও রাশিয়ার সাহিত্যের তখন কিছু পার্থক্য ছিলো। বিশ শতকের গোড়ার দিকে সমস্ত সামাজিক পরিবেশ থেকে উঠে আসা রাশিয়ার সাহিত্যে মানুষ, সাধারণ মানুষ, মেহনতী মানুষ স্থান পেয়েছে। অন্য দেশের সাহিত্যের শৈলী বা সৌন্দর্য চর্চার ধারা তখন রাশিয়াতে প্রধান হয়ে দেখা যায়নি। আর এই পরিবেশেই রাশিয়ার চলচ্চিত্রের প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় শিল্পশৈলীর চমকের থেকেও অনেক বেশি স্থান পেয়েছে—মানুষ, সাধারণ মানুষ, মেহনতী মানুষ।

রাশিয়ার চলচ্চিত্র সম্পর্কে পশ্চিমের একসময়ে অযৌক্তিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার অভ্যাস তৈরি হয়েছিলো। বাস্তবত রাশিয়ার চলচ্চিত্রকার ও চলচ্চিত্র, শতকের প্রথমার্দ্ধে বিশ্বের অন্যান্য দেশকে দক্ষতা ও শিল্পশৈলীতে ছাপিয়ে যায়, একথা ভাবার বাস্তব কারণ নেই।

কিন্তু রাজনীতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যতোই একদেশদর্শিতা থাকুক না কেন, সদ্য সোভিয়েত রাশিয়ার জন্মের সময়কালের চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে সাধারণ মানুষের ভূমিকা, অকুণ্ঠভাবে। আর তার সাথে মিশেছে চলচ্চিত্রের অতি স্বচ্ছ তত্ত্ব ও ব্যাকরণ।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, সুখ, দুঃখ ও সংগ্রাম ছিল বাধ্যতামূলক

চলচ্চিত্রের বিষয়। কখনো কখনো পুরনো রাশিয়ার শোষণ ও সংগ্রামের কাহিনী এসে পড়েছে। আবার এগুলো করতে গিয়ে প্রায়শই ক্ষমতাবান সরকারী নীতি চলচ্চিত্রের কাহিনীতে তথ্য-বিকৃতি, সত্যগোপন ও মিথ্যা-ভাষণের পথ ধরেছে। এর হাত থেকে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রও রেহাই পায়নি।

'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' অর্থাৎ আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রে ত্রৎস্কির (Trotsky) ভূমিকা বাদ দেওয়া হয়েছে, যেটা ঐতিহাসিক তথ্যবিকৃতি। কোজিন্তসেভ (Kozintsev) এবং ত্রউবার্গের (Trauberg) 'নিউ ব্যাবিলন' চলচ্চিত্রে পারী কমিউন সম্পর্কে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে।

তবুও সোভিয়েত চলচ্চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষের কাছে পরস্পরের চিন্তা ও অবস্থান বোঝার কাজে, প্রত্যেকটি অঞ্চলের পুরুষ-নারী-শিশুদের কাছে রাষ্ট্রের গঠনমূলক কার্যকলাপের সংবাদ পৌঁছনোর কাজে। রাশিয়া একটা বিশাল দেশ। তার কোনো কোনো অঞ্চল জনবিরল। কৃষিপ্রধান এক একটা গ্রাম বহু মাইল দূরে দূরে। তাই সোভিয়েত সরকার ব্যবস্থা করে-ছিলো ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শনের। তাই শহরের মানুষদের সাথে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গ্রামের মানুষরা পরিচিত হতো। এই ভাবেই শহরে বেড়ে ওঠা সিনেমা হলের সাথে সাথে সাইবেরিয়ার কৃষক আর তুর্কেস্তানের উপজাতিরা চলচ্চিত্র দেখতে পেতো।

সাধারণ নাগরিকের চলচ্চিত্র সম্পর্কে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য আর প্রযোজনায় সক্রিয় হওয়ার জন্য—জনসাধারণের কাছ থেকে চিত্রনাট্য আহ্বান করা হতো।

১৯২৭ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়—সোভ্‌কিনো প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কাছ থেকে প্রায় দু হাজার চিত্রনাট্য পেয়েছে, আর ভুফ্‌কু-কিনো প্রতিষ্ঠান সে বছরেই পেয়েছে প্রায় তের শত চিত্রনাট্য।

এমন শোনা যায় যে কোনো চলচ্চিত্রের প্রযোজনার আগে তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে জনসাধারণের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিলো সোভিয়েত রাশিয়ায়। এসবের মধ্য দিয়ে মূলত সোভিয়েত সরকারের মতাদর্শই জোরদার হতো।

১৯১৮ সালে মস্কোতে স্টেট স্কুল অফ সিনেমাটোগ্রাফি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও লেনিনগ্রাদ বা উক্রেনের মতন জায়গাতেও চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো। বেশির ভাগ কলাকুশলীরা বিশেষ শিক্ষা নিতো স্টুডিওতে কাজ করার আগে। লেনিনগ্রাদে এমন কি 'ফেক্‌স্‌' (Fex) গোষ্ঠী ছিলো, যারা পরীক্ষা-মূলক কাজকর্ম করতো। চলচ্চিত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে খ্যাতনামা পরিচালক ও কলাকুশলীরা শিক্ষক হিসাবে আসতেন এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন।

এ সময়ের রাশিয়ার চলচ্চিত্রকে কখনো কখনো চারভাগে ভাগ করা হলো। প্রথম ধরণের চলচ্চিত্র ছিলো গল্প বা কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরি। বিপ্লবের আগে ও

পরে মানুষের অবস্থা ও সংগ্রামের কাহিনী থাকতো এই চলচ্চিত্রগুলোতে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা বিভিন্ন চরিত্র রূপায়িত করত। এ ধরণের মধ্যেও আইজেনস্টাইনের বৈশিষ্ট্য ছিলো 'গণ চলচ্চিত্র' (Mass Film) বা 'মহাকাব্য চলচ্চিত্র' (Epic Film)। তাই আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে থাকতো শতশত হাজার হাজার মানুষের যৌথ উপস্থিতি। আর এক ধবণের চলচ্চিত্র ছিলো 'একক চলচ্চিত্র' (Individual Film)। যেমন, পুদভকিনের 'মাদার' চলচ্চিত্র ছিলো কয়েকটি একক বা ব্যক্তিচরিত্রের কাহিনী।

দ্বিতীয় ধরণের চলচ্চিত্র ছিলো মূলত শিক্ষামূলক বা তথ্যমূলক। এর কোনো কোনোটা ছিলো সমাজ, ইতিহাস বা বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্লেষণ। আবার কোনোটা ছিলো বিশেষ কোনো রাজনীতিক পটভূমিতে সরকারি কর্মকাণ্ডের চলচ্চিত্র।

তৃতীয় ধরণের চলচ্চিত্র ছিলো সংবাদ-চলচ্চিত্র, যার ভূমিকা ছিলো সংবাদ-পত্রের মতো।

চতুর্থ ধরণের চলচ্চিত্র ছিলো শিশুদের আনন্দদায়ক ও শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা।

এই প্রত্যেকটি ধরণের চলচ্চিত্রের জন্য সরকারের বিশেষ বিভাগ ছিলো, কাজের প্রত্যেকটি স্তর পরীক্ষা ও বিবেচনা করতে। একটি চিত্রনাট্য বাস্তবায়িত করার জন্য তখনকার রাশিয়ায় যে সুসংগঠিত ব্যবস্থা ছিলো, তার তুলনা অন্য দেশে বিরল। এক একটি চলচ্চিত্রের প্রযোজনা হতো বিশুদ্ধ যৌথ প্রচেষ্টায়।

কিন্তু চলচ্চিত্র প্রযোজনা বা উৎপাদনের এমন চমৎকার পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও, একটা অস্বস্তি বা দ্বন্দ্বের ধারা তখন রাশিয়ার চলচ্চিত্রে ছিলোই।

তার অন্যতম কারণ, রাশিয়ায় চলচ্চিত্রের শিল্পকলা, তত্ত্ব ও ব্যাকরণের সমৃদ্ধ ধারা ছিলো অক্টোবর বিপ্লবের আগে থেকেই। চলচ্চিত্রের কলাকুশলী ও স্রষ্টারা পরবর্তীকালে আরও সমৃদ্ধ শিল্পকলা সৃষ্টির স্বাধীনতা চাইতো।

অভ্যন্তরীণ একটি দ্বন্দ্ব ছিলো সরকার এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের ইউনিটগুলির মধ্যে। চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতো সরকারি নেতারা, যাদের উদ্দেশ্য ছিলো নিজেদের বিশ্বাসকে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় প্রতিফলিত করা। আবার চলচ্চিত্র নির্মাণ করতেন যে কলাকুশলীরা, অর্থাৎ যাঁরা নিয়ন্ত্রিত হতেন, তাঁরা শিল্পী হিসাবে চাইতেন শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে।

কোনো চলচ্চিত্রকার যিনি দীর্ঘবছর ধরে শিল্পকলার চর্চা করে এসেছেন, তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্রমশ আবিষ্কার করেছেন যে, সরকারের পছন্দের বাইরে কোন সৌন্দর্যতত্ত্বের চর্চা করা যাচ্ছে না। সরকারের আমলাতন্ত্র নির্দ্ধারণ করছে শিল্পকলার আকৃতি ও প্রকৃতি। তাই সোভিয়েত রাশিয়ায় একথা বলা অবান্তর যে, চলচ্চিত্রকাররা তাঁদের শিল্পকলায় বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির স্বাধীন চর্চা করতে পারতো।

আইজেনস্টাইন ও তাঁর সমসাময়িক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে মেহনতী মানুষের সংগ্রাম সম্পর্কে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ছিলো প্রায়শই বিতর্কাতীত। কিন্তু এঁদের অনেকেই আবার সোভিয়েত রাশিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র প্রযোজনার পরিবেশে স্বস্তিবোধ করতে পারেননি।

পথিকৃৎ কুলেশভ্ ও ভের্তভ

আইজেনস্টাইন নিজেই স্মরণ করেন যে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগের বছরগুলোর চলচ্চিত্র নতুন আন্দোলনের ধারায়, স্মৃতি থেকে মুছে যাচ্ছিলো। তাই বিপ্লব-পূর্ব 'অ্যাট দ্য হার্থসাইড্স্' (At the Hearthsides) বা 'নাভাস চার্মস্' (Navas Charms) চলচ্চিত্রগুলির স্মৃতি তখন ফিকে হয়ে এসেছে।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় আইজেনস্টাইন দেখেছেন দ্জিগা ভের্তভের (Dziga Vertov) প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং লেভ্ ভ্লাদিমিরোভিচ কুলেশভের (Lev Vladimirovitch Kuleshov) প্রথম সুসংহত কর্মকাণ্ড। এই প্রস্তুতিপর্ব বৈপ্লবিক বাস্তবতার অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে, সোভিয়েত চলচ্চিত্রে দুয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অতুলনীয় বিস্ফোরণের পথ করে দিয়েছিলো। আর তাই রাশিয়ার সেই মুহূর্তের চলচ্চিত্র স্বাধীন, পরিপক্ব ও মৌলিক শিল্পকলা বলে সারা বিশ্বে তখনই স্বীকৃতি লাভ করেছিলো।

কুলেশভের নামটা প্রথমের দিকে বিদেশে তেমন পরিচিত ছিলো না। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পকলার বিকাশের ক্ষেত্রে কুলেশভের অবদান ছিলো বিতর্কাতীত। চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা কুলেশভ—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে ১৯১৭ সালে খানঝোনকভ্ স্টুডিওতে কয়েকমাসের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে, তিনি তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ে নিবন্ধ লেখা শুরু করেছেন।

রাশিয়ার চলচ্চিত্র তখন প্রধানত উপন্যাসের ভিত্তিতে তৈরি হতো। পশ্চিমের টেকনিক্যাল দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার থেকে রাশিয়ার চলচ্চিত্র ছিলো অনেক পিছিয়ে। কিন্তু এমন পরিবেশেও কুলেশভের নিবন্ধের উচ্চমান ও দূরদর্শিতা ছিলো বিস্ময়কর।

একজন ডিজাইনারের কতটুকু অবদান থাকতে পারে চলচ্চিত্রে, তা নিয়েও কুলেশভ্ বিশ্লেষণ করেছেন অনেক আগে অত্যন্ত উচ্চমানে।

কুলেশভকে তাঁর সহকর্মীরা খানিকটা রক্ষণশীল বলে মনে করতেন। বিপ্লবের

আগে তিনি চলচ্চিত্র তৈরিতে হাত দিয়েছেন আর বিপ্লবের পরে পূর্ব সীমান্তে ক্যামেরাম্যানদের নিয়ে চলে গেছেন ;

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই মস্কোর স্টেট ফিল্ম স্কুলের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হলেন।

এখানেই কুলেশভের সহকর্মীরা দেখতেন তাঁর একটি নিজস্ব 'ওয়ার্কশপ' চলতো। পুদভ্‌কিন সে ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, এই ওয়ার্কশপ ছিলো মস্কোর রাস্তার ধারে একটা বাড়িতে। এর খবর শোনার পরেই পুদভ্‌কিন প্রত্যেক সন্ধ্যায় ওয়ার্কশপে যাতায়াত শুরু করেন। লাইলাক ফুলের, সেলুলয়েড আর পোড়া তারের মিশ্রিত এক অদ্ভুত গন্ধ ছিলো জায়গাটায়। তার সাথে শোনা যেতো কারোর পিয়ানোর সুর।

মস্কোতে ফিরে কুলেশভের চোখের সামনে পড়লো দুর্ভিক্ষ আর প্রতিবাদী আন্দোলনের চরম অবস্থা। তাঁর চারপাশে কিছু উৎসাহী শিষ্য জুটলো। কিন্তু কাঁচা ফিল্ম সহজে জুটতো না।

আর এই অভাবের মধ্যেই জন্ম নিলো কুলেশভের বিখ্যাত 'চলচ্চিত্র ছাড়াই চলচ্চিত্র' (Films without Film) সম্পাদনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যখন নতুন চলচ্চিত্র তৈরি করা যাচ্ছিলো না তখন, পুরনো চলচ্চিত্রের নানা অংশ নানাভাবে সাজিয়ে নানা 'মন্তাজ' করে, তৈরি হতো পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র। আর এই মন্তাজ পরীক্ষা-নিরীক্ষাই একদিন দুয়ের দশকে চলচ্চিত্র শিল্পকলার সম্পূর্ণ নতুন স্তরের ভিৎ তৈরি করলো।

কুলেশভ্‌ চিত্রকলার ছাত্র ছিলেন। আর চলচ্চিত্রের দৃশ্যসজ্জার কাজেই তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রে হাতেখড়ি।

তখন, ১৯১৬ সালে, কুলেশভের বয়স মাত্র সতের বছর। জারের শাসনে রাশিয়ায় তখন দুজন প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকার, ইয়েভ্‌গেনি বউয়ার (Yevgeni Bauer) এবং ইয়াকভ প্রোতাজানভ্‌ (Jacob Protazanov), যাঁদের সঙ্গে কুলেশভ্‌ বিশেষ করে সাগ্রহে কাজ করেছেন।

বউয়ার ১৯১৭ সালেই হঠাৎ মারা যান। কিন্তু ইতিমধ্যে ইনি আশিটিরও ওপর চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। আর নিজের চিত্রকলা শিক্ষার ছাপ এই সব চলচ্চিত্রে পড়েছে।

বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়াতে প্রোতাজানভ্‌ ছিলেন এক পথিকৃৎ চলচ্চিত্রকার। কিন্তু ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরে তিনি রাশিয়া থেকে চলে যান, আবার ফিরে আসেন ১৯২৩ সালে।

এই দুই চলচ্চিত্রকারের সাথে এবং আরও অন্যদের সাথেও ডিজাইনের কাজ করতে করতে কুলেশভ্‌ স্বপ্ন দেখেন নিজে চলচ্চিত্র পরিচালনার।

কেউ তাঁকে সুযোগ করে দিতে চাইছিলো না। কুলেশভের ধারণা, তাঁর সম্পাদনার

ভাবনা-চিন্তাগুলো ছিলো অনেকের কাছেই অদ্ভুত প্রকৃতির। তাঁরা তাকে ভবিষ্যৎবাদী বলতো। এ নামকরণটা ছিল বামপন্থী সমস্ত শিল্পীদের বোঝানোর জন্য।

তবুও অক্টোবর বিপ্লবের আগে ১৯১৭ সালে, কুলেশভ্ তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'দ্য প্রজেক্ট অফ ইঞ্জিনীয়ার প্রাইট' (The Project of Engineer Prite) তৈরি করেন। এই চলচ্চিত্রে কুলেশভ্ প্রথম মন্তাজের ধারণা, সম্পাদনার পরিকল্পিত নিয়মের প্রয়োগ করলেন।

এই অভিজ্ঞতাই তিনি লিখলেন কয়েকটি নিবন্ধে। তখনই ১৯১৭ সালে কুলেশভ্ 'অ্যান আনফিনিশড লাভ সঙ' বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রটি তৈরি করেন। রাশিয়ার বিপ্লব তখন এগিয়ে আসছে। প্রাইভেট স্টুডিওগুলো তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বিপ্লবের সময়ে কুলেশভ্ তথ্যচিত্রকার হিসাবে সংবাদ-চলচ্চিত্র তৈরি করতেন। যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হলো, তখন তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তৈরি করেছিলেন যে তথ্যচিত্রগুলি, তার আলোকচিত্রকর ছিলেন এডোয়ার্ড টিসে, পরে যিনি আইজেনস্টাইনের একটানা বন্ধু ও সহযোগী হিসাবে কাজ করেন।

আইজেনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করার আগে টিসে আলোকচিত্রকর বা ক্যামেরাম্যান হিসাবে অতুলনীয় সাহসিকতা ও দক্ষতা দেখিয়েছেন কুলেশভের সাথে।

তখন ডেব্রী ক্যামেরা ছিল বিশাল ভারী ও জটিল। ক্যামেরা চালাতে হতো হাতল ঘুরিয়ে, এখনকার মতো চমৎকার বোতাম টিপে নয়।

এমনি একটি যন্ত্র নিয়ে একদিন কুলেশভের সাথে টিসে লরির ওপরে চেপে ছবি তুলছিলেন গোলাগুলি ছোঁড়ার। মাত্র তিনশ' মিটার দূরে থেকে এই লরির দিকে ছুটে আসছিলো গোলাগুলি। তারই তিরিশটা গোলা বিস্ফোরণের ছবি তুলেছিলেন টিসে। তারপর লরি ছেড়ে এঁরা যখন সরে আসেন, তখন একত্রিশতম গোলাটি ঠিক লরিটিকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়!

কুলেশভ্ লেনিনের সরাসরি নির্দেশে কাজ করতেন। আর ১৯২০ সালের ১ মে তিনি প্রথম লেনিনের ছবি তোলেন।

এই সময় থেকেই কুলেশভ্ স্টেট স্কুল অফ সিনেমার শিক্ষক। তিনি 'অন্ দ্য রেড ফ্রন্ট' (On the Red Front) চলচ্চিত্রটিও এই ১৯২০ সালেই তৈরি করেন।

কুলেশভ্‌কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, চলচ্চিত্রে প্রথম কে মন্তাজ ব্যবহার করেন, গ্রিফিথ (Griffith) না কুলেশভ্? কুলেশভ্ নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন— ঐতিহাসিকভাবে গ্রিফিথ প্রথম। কিন্তু সম্ভবত কুলেশভ্ মন্তাজের প্রথম তাত্ত্বিক অধ্যয়ন করেছিলেন।

নতুন রাশিয়ার বিরাট সংখ্যক চলচ্চিত্রকার কুলেশভের শিষ্য ও অনুগামী। পুদভ্কিন কখনো আইজেনস্টাইনের সঙ্গে মন্তাজ নিয়ে তর্কে নেমেছেন, কুলেশভের অনুগামী শিষ্য হিসাবে। কিন্তু আইজেনস্টাইনকে কুলেশভের শিষ্য হিসাবে সরাসরি চিহ্নিত করা যায় না।

বরঞ্চ আইজেনস্টাইন সশ্রদ্ধভাবে কুলেশভ্কে সুসংহত কর্মকাণ্ডের পথিকৃৎ বলে ভাবলেও, তাঁর মন্তাজের পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন বিদগ্ধভাবে।

আইজেনস্টাইনের মতে, কুলেশভের মন্তাজ ছিলো খণ্ডাংশের 'সংযোগ' (Linkage)। আর আইজেনস্টাইনের ধারণার মন্তাজ ছিল একটি 'সংঘর্ষ" (Collision বা Conflict)। এসব কথা ১৯২৯ সালেই আইজেনস্টাইনের তাত্ত্বিক নিবন্ধে আলোচিত।

কুলেশভ্ নিজেই লিখেছেন যে, তাঁর কাজে আইজেনস্টাইনের অপরিসীম প্রভাব ছিলো। কুলেশভের মতে, সমস্ত চলচ্চিত্রকারের মধ্যে আইজেনস্টাইন শ্রেষ্ঠ। সসঙ্কোচে কুলেশভ্ গর্বিত যে, অল্প সময়ের জন্য আইজেনস্টাইন তাঁর ছাত্র ছিলেন।

আইজেনস্টাইন বলতেন, যে কেউ চলচ্চিত্র পরিচালক হতে পারে। শুধু কাজটা শিখতে কারো তিন বছর লাগে আর অন্যদের লাগে তিনশ' বছর! কুলেশভ্ লিখেছেন যে, আইজেনস্টাইন তাঁর কাছে তিনমাস চলচ্চিত্রের কাজ শিখেছেন। আইজেনস্টাইন কুলেশভের ওয়ার্কশপে প্রতি সন্ধ্যায় যেতেন। প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই চলতো মন্তাজের নানা অনুশীলন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশেষতঃ জনগণের উপস্থিতির বড় দৃশ্যাবলীগুলোতে চলতো অনুশীলন।

আইজেনস্টাইন এবং কুলেশভের পদ্ধতি আর দৃষ্টিভঙ্গী তখন একই ছিলো বলে কুলেশভ্ মনে করতেন। বিনয়ের সঙ্গে কুলেশভ্ তাঁর জীবনের পরিণত বয়সে, ১৯৬ সালে, জানিয়েছেন—সম্ভবত তাঁর নিজের মধ্যে ছিলো কিছু গুণাবলী, আর আইজেনস্টাইন ছিলেন প্রতিভাশালী। চলচ্চিত্রে কুলেশভ্ যা আবিষ্কার করেছেন, আইজেনস্টাইনের প্রতিভা সেটাকে অসাধারণ ক্ষমতায় বৈপ্লবিক করে তুলেছে। আইজেনস্টাইন প্রথম বিপ্লবী চলচ্চিত্রের স্রষ্টা। যদি চলচ্চিত্রের আকৃতিতে কুলেশভ্ কোন বিপ্লব করতে সমর্থ হন, তবে আইজেনস্টাইন নতুন এক বৈপ্লবিক চলচ্চিত্র করতে সমর্থ হয়েছেন।

কুলেশভের মতে আইজেনস্টাইন তাঁর শ্রেণীতে একা ও একক। চিরদিন কুলেশভ্ ও আইজেনস্টাইন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর নিজের কাজের কথা বলতে গিয়ে কুলেশভ্ আইজেনস্টাইনকেই প্রথম স্বীকৃতি দেন।

১৯৪৮ সালে মৃত্যুর মুহূর্তে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে একটি অসম্পূর্ণ নিবন্ধ রেখে যান। আর এই অসম্পূর্ণ নিবন্ধটি ছিলো আইজেনস্টাইনের জীবনের শেষ চিঠি, কুলেশভের উদ্দেশ্যে।

আইজেনস্টাইন ভের্তভ্‌কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে পথিকৃতের আসনে বসিয়েছেন, সেই মানুষটি ছিলেন বাস্তবতার চলচ্চিত্রের একরোখা সাধক। কারো মতে সোভিয়েত তথা বিশ্বের, তথ্য-চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

১৮৯৬ সালে ২ জানুয়ারিতে দেনিস্‌ আর্কাদিয়েভিচ্‌ কউফ্‌মান (Denis Arkadievitch Kaufman) অর্থাৎ ভের্তভ্‌ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা মস্কোর সাইকো-নিউরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে নতুন সোভিয়েত রাশিয়ায়, তিনি সংবাদ-চলচ্চিত্রের কাজে যুক্ত হন। তাঁর পরিচালনায় ও সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাপ্তাহিক 'কিনোনেদিয়েলিয়া' (Kinonedielia, ১৯১৮—১৯১৯) এবং সাময়িকী 'কিনো-প্রাভ্‌দা' (Kino-Pravda, ১৯২২—১৯২৫) সংবাদ-চলচ্চিত্র।

একদল পরীক্ষামূলক তথ্যচিত্রকারের তিনি ছিলেন মধ্যমণি, যাঁদের নাম ছিল 'কিনোকি' (Kinoki), বা চলচ্চিত্র-চোখ (Kino-Eyes)।

চরিত্রের দিক থেকে ভের্তভ্‌ ছিলেন জঙ্গী তাত্ত্বিক। চলচ্চিত্র বাস্তবতার সম্পর্কে তিনি এতটুকু আপোস-রফা করতেন না।

ভের্তভ্‌ সে সময়ে রাশিয়াতে তথ্যচিত্রের যে ধারার প্রবক্তা ছিলেন, তা এখনকার পশ্চিমে 'সিনেমা-ভেরিতে' (Cinema-Verite) নাম নিয়েছে। তাঁর চলচ্চিত্র ও তাত্ত্বিক লেখা বিশ্বচলচ্চিত্রের জগতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। সাম্প্রতিককালে তার মূল্যায়ন করা হচ্ছে, আধুনিক বিশ্বে।

চলচ্চিত্র যে কতো নিখুঁত বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি হতে পারে, ভের্তভ্‌ সারা জীবন তারই পরীক্ষা করে গেছেন। প্রতিটি সংবাদ-চলচ্চিত্রকে আলাদা করে ধরলে, ভের্তভের তথ্যচলচ্চিত্রের সংখ্যা শতাধিক।

অথচ ভের্তভ্‌ মাত্র আটান্ন বছর বয়সে, ১৯৫৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মারা যান।

জীবনের শুরুতে, কল্পনাভরা কাহিনী, কবিতা আর ব্যঙ্গ ভের্তভ আবিষ্কার করেছেন। বাল্যাবস্থা যখন কেটে যাচ্ছে, তখন তিনি আশ্চর্য এক 'তথ্য-শব্দ' (Documentary-Sound) সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়েন। কিছু কথা, আবার ঝর্ণা বা করাতের শব্দ মিলিয়ে তাঁর তথ্য-শব্দের মন্তাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

১৯১৮ সালের বসন্তে ভের্তভ্‌ নিজেকে চলচ্চিত্রের মধ্যে আবিষ্কার করেন। তখনকার সংবাদ-চলচ্চিত্রে কাজ করার সময়, জীবনকে দেখার জন্য ক্যামেরার চোখকে আবিষ্কার করেন। সাধনা শুরু হয় চলচ্চিত্র-চোখের।

চলচ্চিত্র-চোখের প্রথম পরীক্ষা হয় ধীর গতির চলচ্চিত্রে। যা সাদা চোখে সম্ভব নয়। এই থেকেই চলতে থাকে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ক্যামেরা ও তার কারিগরি কৌশল কাজে লাগিয়ে চোখের থেকেও বেশি কোনো বাস্তবকে দেখানো ও দেখার চেষ্টা।

ভের্তভের বক্তব্য বা রচনা জঙ্গী এবং উগ্র।

তিনি যখন কিনো-প্রাভ্দা সংবাদ-চলচ্চিত্রের সফলতার কথা লেখেন তখন যে সব দর্শক প্রেম বা অপরাধের কাহিনীর চলচ্চিত্র পছন্দ করেন তাঁদের সমালোচনা করতে ভোলেন না। ভের্তভের মতে—এ ধরনের দর্শক দিয়ে প্রমাণ হয় না যে কিনো-প্রাভদা উপযুক্ত নয়। তাঁর মতে ঐ জনসাধারণই অনুপযুক্ত।

চলচ্চিত্র শিল্পকলা কি না, এ তর্কের মধ্যে ভের্তভ্ যেতে নারাজ। তিনি বলিষ্ঠভাবে বলেন এই বিতর্কে ব্যস্ত কমরেডদের—"আমাদের অস্তিত্ব ও আমাদের কাজকে অবজ্ঞা করে চলুন।"

ভের্তভের মতে—বিপ্লবী চলচ্চিত্র বিকাশের দিক্‌নির্দেশ পাওয়া গেছে। এ কথা লিখেছেন তিনি ১৯২৩ সালে।

তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন কল্পিত কাহিনীর সাধারণ চলচ্চিত্র ধূমপায়ীদের নেশার মতো, সিনে-নিকোটিনের বিষে স্নায়ুকে ঝিমিয়ে দেয়। আর তাই মানুষের প্রতিবাদী চেতনা ঝিমিয়ে পড়ে কাহিনী চলচ্চিত্রের নাটকীয় বিষাক্ত প্রভাবে। তাঁর মতে চেতনাই মানুষকে দৃঢ় বিশ্বাস ও মতামত তৈরি করতে দেয়। তাই ভের্তভ্ চেয়েছেন—সচেতন জনগণ। তিনি অসচেতন জনসাধারণকে চাননি।

তিনি তাই জয়ধ্বনি করেছেন—দেখতে পারে এবং শুনতে পারে যে বিশুদ্ধতা, তার সচেতনতার। তিনি জয়ধ্বনি করেছেন শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গীর।

১৯২৪ সালে তিনি ঘোষণা করেছেন এই আন্দোলনকে চলচ্চিত্র-চোখ বলে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শিল্প-চলচ্চিত্রের (Art-Cinema) বিরুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধ। আর রাশিয়ার চলচ্চিত্রে এই কিনো-প্রাভ্দা এক নতুন বাঁক হিসাবে অভিনন্দিত হয়েছে ভের্তভের লেখায়।

জঙ্গী ও উগ্র চিন্তা এবং ভাষার আবরণে ভের্তভ্ ছিলেন এক অসাধারণ পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রকার। আইজেনস্টাইন ভের্তভ্ সম্পর্কে প্রচুর লেখেননি। সংক্ষিপ্ত হলেও সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন তিনি, ভের্তভ্‌কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম চলচ্চিত্রকার হিসাবে।

আইজেনস্টাইন যখন পরিমাপ (Metric) মন্তাজের আলোচনা করেন, তখন ভের্তভের 'ইলেভেনথ্ ইয়ার' চলচ্চিত্রকে উদাহরণস্বরূপ দেখান। এই চলচ্চিত্রের মন্তাজ এতো জটিল গাণিতিক পরিমাপ দিয়ে গড়া যে, শুধুমাত্র মাপজোক করেই এর আনুপাতিক নিয়মের সূত্রটি আবিষ্কার করা যায়।

ভের্তভের 'ইলেভেনথ্' চলচ্চিত্র সম্পর্কে এ বিশ্লেষণটুকু আইজেনস্টাইন করেছেন ১৯২৯ সালে, মস্কো ও লণ্ডনে বসে।

আবার নিজের এই 'ইলেভেনথ' চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভের্তভ্ ১৯৩৪ সালে মর্মান্তিক সরস কাহিনী বলেছেন।

ভের্তভ্ যখন শিশু ছিলেন তখন এক প্রতিবেশী তাঁর একটি লেখা কপি করে শ্রেষ্ঠ নম্বর পায়। আর ভের্তভ্ পান শূন্য, এবং কপি করার অপরাধে! তাঁর প্রতিবেশী বুদ্ধিদীপ্ত আর সুখী জীবন কাটিয়েছে, ভের্তভের লেখা কপি করে। জার্মানিতে ভের্তভের 'ইলেভেনথ' চলচ্চিত্রের এক অংশ ভিন্ন নামে এবং অন্য চলচ্চিত্রকারের নামে দেখানো হতো। বছরখানেক বাদে জার্মানিতে যখন ভের্তভ্ তাঁর 'ইলেভেনথ' চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতে যান, তখন তিনি নকল করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন! আসল সত্যকে প্রমাণ করতে যথেষ্ট কষ্ট হয়। এরকম ছিলো ভের্তভের জঙ্গী ভাবনা, সূক্ষ্ম কাজকর্ম এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা। নানা ঘটনাতেই ভের্তভের মুখোমুখি হতে হয়েছে, তখনকার সোভিয়েত রাশিয়ার তরুণ চলচ্চিত্রকারদের।

আইজেনস্টাইনকেও সামান্য সময়ের জন্য ভের্তভের মুখোমুখি হতে হয়েছে, তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র তৈরির সময়।

প্রথম চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা

১৯২৩ সালে আইজেনস্টাইনের পরিচালনায় যখন প্রোলেৎকুল্ত থিয়েটারের প্রযোজনায় আলেকজান্দার অস্ত্রোভ্স্কির 'এনাফ সিমপ্লিসিটি ইন এভ্রি ওয়াইজম্যান' মঞ্চস্থ হলো, তখন চলচ্চিত্র ও নাটকের মিলনের একটা অন্যতম পরীক্ষা সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘটলো।

এই নাটকের গ্লুমভ্ চরিত্রের একটি ডায়েরি বা রোজনামচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। এই ডায়েরিতে গ্লুমভ্ তার সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার টুকে রাখতো। অন্যান্য সমস্ত জিনিসের মতোই অস্ত্রোভ্স্কির এই নাটকও আধুনিক করে তোলার সমস্যা ছিলো তখন।

সদ্য বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় নয়া আর্থনীতিক কর্মসূচীতে যে নতুন ধনীরা আবির্ভূত হচ্ছিলো, তাদের চরিত্রের সাথে পুরনো এই নাটকের চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঠিক হলো গ্লুমভের ডায়েরিটাকে আধুনিক করে তুলতে হবে। ভের্তভের 'কিনো-প্রাভদা' তখন সবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ঠিক হলো গ্লুমভের ডায়েরির বদলে 'কিনো-প্রাভদা' চলচ্চিত্র দেখান হবে।

বিভিন্ন মানুষের সাথে কোনো চরিত্রের অ্যাডভেঞ্চারের সময় মঞ্চে যে বিভিন্ন পোশাকে অভিনয় করার প্রথা চালু ছিলো, এই পরিকল্পিত সংবাদ-চলচ্চিত্রে তাকে আরও সম্প্রসারিত করা হলো। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গ্লুমভ্কে বিভিন্ন

চেহারায় দেখা গেলো। কখনো সে মেশিনগানে রূপান্তরিত, কখনো সে ক্লাউনের পোশাকে, কখনো সে চিড়িয়াখানার গাধা, কখনো সে ক্ষুদে শিশু।
১৯২৩ সালে বহির্দৃশ্যে এইসব কাণ্ডকারখানার আলোকচিত্র তোলা ছিলো রীতিমত আতংকের। আইজেনস্টাইনের অনুরোধ লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিলো। এ কাজটা ছিলো অত্যন্ত জটিল। কয়েকজন পেছনে কালো ভেলভেটের পর্দা টাঙিয়ে এসব দৃশ্যের ছবি তুলতে পরামর্শ দিলো।

এমন কি ক্যামেরাম্যান লেমবার্গ (Lemberg) এ ধরণের অ্যাডভেঞ্চারের দৃশ্য গ্রহণে রাজি হলেন না। অবশেষে ফ্রানৎসিসন (Frantzission) আলোকচিত্র গ্রহণে রাজি হলেন।

গস্কিনো (Goskino) প্রতিষ্ঠানের লোকেরা ভাবলো, আইজেনস্টাইন সমস্ত গোলমাল পাকিয়ে ফেলবেন। তাই তারা আইজেনস্টাইনকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য, ভের্তভ্‌কে নিযুক্ত করলো।

যাই হোক, দু'তিনটে দৃশ্য গ্রহণের পর, ভের্তভ্‌ আইজেনস্টাইনদের ছেড়ে দিলেন।

এক বৃহস্পতিবার গ্লুমভের ডায়েরির চিত্রগ্রহণ শুরু হলো। একদিনে তোলা হলো ১২০ মিটার। এই দৃশ্যগ্রহণকে ঠিক চলচ্চিত্র আখ্যা দেওয়া যায় না। যদিও ক্লোজ-আপ, প্যান, এমন কি অ্যাডভেঞ্চার চলচ্চিত্রের খণ্ডাংশও আছে এতে।

আলেকজান্দ্রভ্‌ একটা কালো মুখোশ পরে একটা ছাদের ওপর উঠেছেন, একটা 'এরোপ্লেন' থেকে চলন্ত গাড়ির ওপর লাফিয়ে পড়ার অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্রের শেষ মুহূর্তে গাড়িটি প্রোলেৎকুল্ত থিয়েটারের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছোয়। আলেকজান্দ্রভ্‌ এবার হাতে চলচ্চিত্রের রিলটি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে সশব্দে প্রবেশ করেন।

আগেভাগেই পরিকল্পনা ছিল একেবারে হিসাব করে ঘড়ি ধরে চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য হবে আট মিটার। কিন্তু বাস্তবে সেটা সামান্যই হেরফের হয়ে দাঁড়ালো ১২০ মিটার!

সে সময়ে 'ম্যারেজ' এবং 'আয়রন হিল' নাটকে চলচ্চিত্র মিশ্রণের সাথে সাথে, আইজেনস্টাইনের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিলো অন্যতম পথিকৃৎ কাজ। আইজেনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের সব সৃষ্টিধর্মী কাজের কিছু বৈশিষ্ট্য এই প্রথম 'হাসি' (smiles) থেকে প্রকাশিত হয়।

'কিনো-প্রাভদা'র বার্ষিকীতে ১৯২৩ সালের ১২ মে যে 'স্প্রিং কিনো-প্রাভদা' প্রদর্শিত হয়েছিলো, তার একটি অংশ হিসাবে গ্লুমভের ডায়েরির চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়।

গ্লুমভের ডায়েরি দিয়ে তৈরি এই অংশের নাম ছিল 'প্রোলেৎকুল্তের বসন্তের হাসি' (Proletkult's Spring Smile)।

আইজেনস্টাইনের সাথে আলেক্জান্দ্রভ্

একটা সময় ছিলো যখন গ্রিগরি আলেক্জান্দ্রভ্ আর এডোয়ার্ড টিসে ছিলেন আইজেনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এবং এঁরা তিনজন যৌথভাবে সফর করেছেন, চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত একসাথে থেকেছেন। অবশ্য আলেক্জান্দ্রভের সাথে আইজেনস্টাইনের ঘনিষ্ঠতা, একেবারে চলচ্চিত্রকার জীবনের প্রথম লগ্ন থেকে।

১৯২১ সালে প্রথম আইজেনস্টাইনের সাথে আলেক্জান্দ্রভের সাক্ষাৎ।

সে সময়ে আইজেনস্টাইন প্রোলেৎকুল্ত থিয়েটারে জ্যাক লন্ডনের 'দ্য মেক্সিকান' নাটকের দৃশ্যসজ্জা করতেন।

আলেক্জান্দ্রভ্ মূলত অভিনেতা হিসাবে তখন কাজ করছেন, প্রথমে সাংবাদিকের ভূমিকায়, পরে এক আমেরিকান বক্সারের ভূমিকায়। ওখানে নাটক তখন মস্কো আর্ট থিয়েটারের একজন শিল্পী পরিচালনা করতেন।

আলেক্জান্দ্রভ্ ও আইজেনস্টাইন এবার ঠিক করলেন নিজেরাই একটা থিয়েটারের দল তৈরি করবেন, যে দল রাস্তাঘাটে তাদের অভিনয় দেখাবে। এটা এঁরা বুঝেছিলেন যে, কৃত্রিম দৃশ্যসজ্জা অতীতের বিষয়বস্তু হয়ে গেছে। তাই দুজনে নিজেদের দল গড়তে শুরু করলেন। আঠারোজন তরুণ জোগাড় হলো যাঁদের পরিচালক আইজেনস্টাইন। এই দলটির শুরুর প্রযোজনা ছিলো অস্ত্রোভ্স্কির 'এনাফ সিমপ্লিসিটি'। এঁরা ঠিক করেছিলেন একেবারে সার্কাসের রিঙের মতো গোল একটা কার্পেট পাতা থাকবে, যার ওপর অভিনয় করা হবে। আর এই অভিনয় রাস্তাঘাটের কোনো একটা জায়গায় হবে আর পথিকরা দেখবেন। কিন্তু মহড়া দেওয়ার সময়েই মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন অনুভব করা গেলো।

এক সময় আলেক্জান্দ্রভ্ সার্কাসের কিছু কৌশল শিখেছিলেন এবং নিজেদেরকে বলতেন 'উড়াল পর্বতের ঈগল'।

ঠিক হলো নাটকের মধ্যে কিছু সার্কাসের ভেল্কিও থাকবে। অতএব আলেক্-জান্দ্রভ্ দড়ির ওপরে হাঁটলেন, উঁচু দোলনায় ট্রাপিজের খেলা দেখালেন। এইসব সার্কাসের কৌশল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত আইজেনস্টাইন যতো বেশি নিয়েছেন, ততো বেশি বেশি করে এর পরিমাণ বেড়েই চলেছে। নাটকে তখন বেশি জিনিসপত্র দরকার। ট্রাপিজের দোলনা আর টাইট রোপের দড়ির প্রয়োজন হলো। এতসব জিনিসপত্র দড়িদড়া নিয়ে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নাটক করতে যাওয়া ক্রমশই বেশি ঝামেলার হয়ে উঠলো। কাজেই এবার ঠিক হলো মস্কোর একটা বাড়িতে নাটকের অভিনয় হবে। এ বাড়িটা ছিল পরবর্তীকালের হাউজ

অফ ফ্রেন্ডশিপের জায়গায়। এই বাড়িতে যে হলটুকু পাওয়া গেলো, সেখানেই বসার সাময়িক বন্দোবস্ত করা হলো। নাটকের প্রদর্শনী দারুণ সফল হলো। এটা আর অন্য কোথাও করা হলো না।

এর পরের নাটক ঠিক হলো একটা গ্যাস কারখানায় মঞ্চস্থ করা হবে। আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত সাহিত্যিক সের্গেই ত্রেতাইয়াকভের 'গ্যাস মাস্ক' নাটকটির বিষয়বস্তু ছিলো গ্যাস কারখানার পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ, যার ফলে অবশেষে গ্যাস মেশিনের বিস্ফোরণ ঘটে।

আইজেনস্টাইনের মনে হয়েছিলো ধুলোময়লা ভর্তি কোনো হলে নাটক মঞ্চস্থ করা যাবে না। একটা কারখানা পাওয়া গেলো মস্কোতে, যেখানে গ্যাসের যন্ত্রপাতি ছিলো আধখানা জায়গা জুড়ে আর আধখানা জায়গা ছিলো ফাঁকা। কাজেই নকল মঞ্চসজ্জার পরিবর্তে দর্শকদের বসার আসন এমনভাবে সাজানো হলো যে, তারা যন্ত্রপাতির দিকে মুখ করে বসতে পারে, আর এই যন্ত্রপাতি তাদের যথাযথ বাস্তব ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলেক্‌জান্দ্রভ্‌ এই নাটকে এক বৃদ্ধা মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই একরোখা তরুণের দল এমন সব কায়দা আবিষ্কার করতো, যা প্রায় অসম্ভব ছিলো। এই নাটকের একেবারে শেষে ছিলো, আসল শ্রমিকরা যন্ত্রপাতির কাছে এসে ভাল্‌ভ্‌ খুলে দেবে। নাটকের বিষয়বস্তু অনুযায়ী, আগুনের শিখা দিয়ে বোঝা যাবে যে যন্ত্রপাতিগুলো সারানো হয়েছে।

এই নাটক খুব সফল হলো না। সাধারণ মানুষের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে থিয়েটারে গিয়ে বরঞ্চ নাটক দেখা। তারা কোনো কারখানায় এসে নাটক দেখতে অতোখানি উৎসাহ পায় না।

কিন্তু এই তরুণ দলের আবার, প্রচলিত থিয়েটারে সর্বান্তঃকরণে ফিরে যাওয়াও কঠিন ব্যাপার। তার ওপর এঁরা চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

প্রলেৎকুল্‌ত্‌ থিয়েটারের প্রযোজনায় আবার 'এনাফ্‌ সিম্‌প্লিসিটি' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার প্রস্তাবে তাই, এঁরা নাটকের মধ্যে চলচ্চিত্রাংশ মেশানোর কথা ভাবলেন।

'গ্লুমভের ডায়েরি' চলচ্চিত্র পর্বটি সত্যিই তখন নাটকে যুক্ত হলো, প্রায় কুড়ি মিনিটের অংশ হিসেবে।

এই চলচ্চিত্র পর্বটি ভের্তভের 'কিনো-প্রাভ্‌দা' সংবাদ-চলচ্চিত্রে যুক্ত হলো, নাটকে নতুন শিল্পকলার দৃষ্টান্তের মর্যাদায়।

টুকরো চলচ্চিত্রটার কাজ শেষ হওয়ার পরও, আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র তৈরিতে যুক্ত থাকতে চাইলেন। আলেক্‌জান্দ্রভ্‌ তাঁর সহকারী হিসেবে রইলেন।

এঁরা যৌথভাবে রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসের একটি চিত্রনাট্য লেখার কাজে

হাত দিলেন। কথা হলো, কয়েকটি পর্বে ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থান থেকে অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত কাহিনী বিভিন্ন পর্বে লেখা হবে।

কিন্তু আইজেনস্টাইনের 'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রের কাজ এসে পড়ায়, বিপ্লবের ইতিহাসের চিত্রনাট্যের প্রকল্প স্থগিত থাকে।

এটা খুব মজার ব্যাপার যে, আলেকজান্দ্রভ্ প্রায়ক্ষেত্রেই আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রে আলেকজান্দ্রভ অভিনয় করেছেন কারখানার ফোরম্যানের ভূমিকায়। 'পোতেম্‌কিন্' চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন 'গুইলিয়ারভ্‌স্কি' চরিত্রে—যে বিদ্রোহীদের ওপর গুলি চালিয়েছিলো।

'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রে এঁদের নাটকের পুরো দলটাই অভিনয় করেছিল।

এই চলচ্চিত্র নির্মাণ করা ছিলো, প্রচলিত ধারা ভেঙে নতুন ধারা তৈরি করার একটা চ্যালেঞ্জ। পুরনো রাশিয়ার চলচ্চিত্রের অভ্যস্ত পরিবেশে নতুন কিছু করার অজস্র বাধা। সব থেকে বড়ো বাধা, গল্পের নায়ক নিয়ে। চলচ্চিত্রে একটা নিটোল কাহিনী থাকে, তার নায়ক-নায়িকা থাকে।

আইজেনস্টাইন, 'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রে একক নায়কের প্রচলিত ধারা ভেঙে দিলেন। জনগণের বিশাল বাহিনী এখন নায়ক। তাঁর এই দৃঢ় পদক্ষেপ, বিতর্কের ঝড় তুললো। তবু সফলতার পথে তাদের যাত্রা শুরু হলো।

আইজেনস্টাইনের 'আকর্ষণের মন্তাজ' তত্ত্ব বা ধারণার প্রয়োগ ছিলো প্রথম শ্রমিকদের থিয়েটারের নাটক প্রযোজনায়। এ নাটকে সব ছিলো—সঙ্গীত থেকে সার্কাস পর্যন্ত। পারতপক্ষে, রুশ ভাষার বিজ্ঞাপনে লেখা হতো—এতে সবই আছে!

'এনাফ্ সিম্‌প্লিসিটি' নাটক তাই আইজেনস্টাইনের সম্পাদনার ধারণার অন্যতম পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় সফল হয়ে, 'আকর্ষণের মন্তাজ' তত্ত্ব আরো এগিয়ে নেওয়ার কাজে আইজেনস্টাইন হাত দিলেন। একটা ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া, যা এই মন্তাজের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব, আইজেনস্টাইন তাকেই কাজে লাগালেন। তাঁর কাছে চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ ছিলো পরস্পর থেকে আলাদা। নিজের কল্পনা বা ভাবনা দিয়ে তিনি, তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অনেক দূর।

কিন্তু আইজেনস্টাইন জানতেন, তাঁর তত্ত্বের পরীক্ষা চলচ্চিত্রে দর্শক-রা সবটুকু গ্রহণ করতে পারবে না। তাই, তিনি যখন চলচ্চিত্র তৈরি করতেন তখন অত্যন্ত সাবধানতার সাথে করতেন। তাঁর হিসাবে থাকতো, দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার কথা।

নিজের তাত্ত্বিক ভাবনা আর কল্পনাপ্রসূত আবিষ্কারগুলো আইজেনস্টাইন ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

আলেকজান্দ্রভের জন্ম ১৯০৩ সালে। অর্থাৎ তিনি আইজেনস্টাইনের থেকে

বয়সে পাঁচ বছরের ছোটো। একেবারে প্রথম দিকে এক অপেরা হাউসে তাঁর কাজ শুরু হয় সাজ-পোশাকের তদারক করা এবং দৃশ্য-চিত্রকর হিসাবে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি শ্রমিক এবং কৃষকের থিয়েটারে প্রযোজনার পাঠক্রমে ভর্তি হন। আর ১৯২১ সালে প্রথম প্রোলেৎকুল্ত থিয়েটারে অভিনেতা হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

তাই যখন ১৯২৫ সাল এগিয়ে এলো, তখন আলেকজান্দ্রভের বয়স সবে কুড়ি বছর পেরিয়েছে। এই ১৯২৫ সালেই রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্রের এক বিরাট প্রকল্পে আইজেনস্টাইনের সাথে তিনি যুক্ত হলেন। তাঁরা নিনার চিত্রনাট্য অবলম্বন করেই ওদেসায় পোঁছলেন।

প্রকৃতির স্বাভাবিক দৃশ্যাবলী আর অসাধারণ চওড়া বিরাট সিঁড়ি দেখে তাঁরা এই চলচ্চিত্রের প্রকল্পটির শুধু একটি পর্বই তৈরি করতে চাইলেন। যার ফল হিসেবে জন্ম নিল 'দ্য ব্যাটলশিপ পোতেমকিন'।

অতি অল্পবয়সী তরুণদের সামনে ছিলো অদ্ভুত স্বপ্ন। তাঁরা চিত্রনাট্যের অনেকগুলো পর্ব লিখেছিলেন, কিন্তু যতোই তাঁরা এগোতে থাকলেন, ততোই তাঁরা নতুন মানুষদের সাথে মিশে আর নতুন খুঁটিনাটি জেনে, চিত্রনাট্যের সব কিছুই বদলে ফেলতেন। ঘন কুয়াশার মধ্যে একদিন তাঁরা ওদেসায় কাজ করতে পারছিলেন না। মুহূর্তের জন্য কুয়াশা সরে গেলে, এক সুন্দর ঝাপ্‌সা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা গেলো। তাঁরা ঠিক করে ফেললেন এর চিত্র গ্রহণ করবেন। কেমন হবে তার ফল তাঁদের জানা ছিলো না। ঐ কুয়াশাময় ঝাপ্‌সা দৃশ্যই তোলা হলো আর সন্ধ্যাবেলায় হোটেলে ফিরে তাঁরা চলচ্চিত্রের একটি চরিত্র ভাকুলিন্‌চুকের মৃত্যুর দৃশ্যের এক চিত্র-পরিকল্পনা করলেন। এক সময়ে এই হঠাৎ তোলা দৃশ্যের ব্যবহার, চলচ্চিত্রটির বিখ্যাত দৃশ্য হয়ে গেলো।

আলেকজান্দ্রভের অভিজ্ঞতায় সেই পুরনো দিনের চলচ্চিত্র করার ঘটনাবলী পরবর্তীকালের চলচ্চিত্রকারেরা ব্যবহার করেননি। কিন্তু আইজেনস্টাইনের সাথে কাজ করার সময় দেখা যেতো, তাঁরা যত বেশী কাজ করছেন ততোই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের পরিবর্তন ঘটছে। একটা আগেভাগে তৈরি চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে তখন চিত্রগ্রহণের কাজ হতো না। বরঞ্চ চারপাশে যা দৃশ্যাবলী, যা উপকরণ পাওয়া যেতো, তাই দিয়েই চলচ্চিত্রের কাঠামো তৈরি হতো।

আলেকজান্দ্রভ ও আইজেনস্টাইনের তখন পুদভ্‌কিনের সাথে চমৎকার বন্ধুত্ব। এমনি সময়ে সবাক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব হলো। অসংখ্য সন্ধ্যা তিনজনের কেটে গেলো চলচ্চিত্রে শব্দের আগমনের ফল সম্পর্কে আলোচনা করে। তাঁরা তিনজন সবাক চলচ্চিত্রের সম্পর্কে জানলেন, তার আকৃতি ও প্রকৃতি জানলেন। এবার তাঁরা শিল্পকলার এই নতুন উপকরণটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজেদের ধারণাকে সূত্রবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আইজেনস্টাইন ও পুদভ্কিন, ১৯২৮ সালে আলেকজান্দ্রভকে দায়িত্ব দিলেন তাঁদের তিনজনের আলোচনার সারবস্তু লিখে ফেলতে।
আলেকজান্দ্রভ কয়েক পাতা লিখলেও তিনজনে একসাথে নতুন কিছু বিষয়বস্তু জুড়ে অবশেষে যৌথভাবেই লেখাটা শেষ হয়েছিলো। অনেকগুলো খসড়া তৈরি হয়েছিলো এর জন্য। যখন বাইরের দেশে সবাক চলচ্চিত্র এসে গেলো, তখন এঁদের মনে হয়েছিলো যে নির্বাক চলচ্চিত্র একটা বিপদের মধ্যে পড়েছে। তাই তাঁরা ঠিক করেছিলেন একটা ইস্তেহারের আদলে নিজেদের বক্তব্যকে ঘোষণা করবেন। সত্যি বলতে কি, আলেকজান্দ্রভ আর তাঁর সঙ্গীরা তখন খুবই তরুণ। তাঁদের শিল্পকলার চিন্তাভাবনা ও গবেষণায় তাঁরা ছিলেন 'বামপন্থী'। তাই সবাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁদের নানা জায়গায় প্রকাশিত বক্তব্যের প্রতিফলন ছিলো এই ইস্তেহার। তাঁদের মনে হয়েছিলো, একটা দীর্ঘ সময়ের মধ্য দিয়ে সবাক চিত্রকে যেতে হবে যখন চলচ্চিত্র-শিল্পকলা দুর্বল হয়ে পড়বে। পরবর্তী ঘটনাবলীও তাঁদের এই চিন্তাভাবনাকে খানিকটা প্রমাণ করে।
১৯২৮ সালে আইজেনস্টাইন, আলেকজান্দ্রভ হলিউডে আমন্ত্রিত হলেন। সে সময়ে ১৯২৯ সালের শরতে তাঁরা বার্লিনে এলেন। সেখানে এক তরুণ জার্মান চলচ্চিত্রকারকে তাঁরা কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর একটি চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে। এরপর এঁরা যখন সুইজারল্যান্ডে এলেন বিখ্যাত লা সারাজ সম্মেলনে যোগ দিতে, এঁদেরকে গর্ভপাতের উপর একটি সুইস তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।
আলেকজান্দ্রভ, আইজেনস্টাইন ও টিসে—এঁরা ছিলেন এক সময়ে মেক্সিকোর কাছে 'ত্রয়ী' বা 'ত্রয়কা' (Troika)। এই ত্রয়ীকে এক সময়ে ভাবা হতো মেক্সিকোয় চলচ্চিত্রের আবিষ্কর্তা হিসেবে।
১৯৩৬ সালে আলেকজান্দ্রভ যখন মেক্সিকোয় যান, তখন সেখানকার চলচ্চিত্র পরিচালকরা তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করেন—কারণ আলেকজান্দ্রভ সেই বিখ্যাত ত্রয়কার একজন।
তারও পরে আলেকজান্দ্রভ যখন ছয়ের দশকে তাঁর 'লেনিন ইন সুইজারল্যান্ড' (Lenin in Switzerland) চলচ্চিত্রের কাজ করছিলেন, তখন সুইজারল্যান্ডের চলচ্চিত্রকাররা তাঁকে অভিনন্দিত করেন তাঁদের জাতীয় চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। এই ত্রয়ী এক সময় প্রথম যুগের সুইজারল্যান্ডের চলচ্চিত্র তৈরির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, স্মরণ করা যেতে পারে।
আলেকজান্দ্রভ মনে করেন তাঁদের ত্রয়ী অন্তত পক্ষে তিনটি দেশের, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড এবং মেক্সিকোর, জাতীয় চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে যখন এই ত্রয়ী প্যারিসে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা সবাক চলচ্চিত্রের

টেকনিক শিখতে আগ্রহী। তাই ঠিক করলেন একটা ছোট্টো পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র তৈরি করবেন।

এর জন্য সমুদ্রের ঝড়ের ছবি তুলতে, ম্যাগনোলিয়া ফুলের দৃশ্য তুলতে তাঁরা ফ্রান্সে ঘুরলেন। এই নানা দৃশ্যের টুকরো তাঁদের নিজস্ব রুশ আবেগ দিয়ে সম্পাদনা করে একটা চলচ্চিত্রের আকার দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন তাঁরা।

আর ঠিক এই সময়েই হলিউডে ডাক পড়লো আইজেনস্টাইনের, সঙ্গে রইলেন টিসে। আলেকজান্দ্রভ একা রয়ে গেলেন ফ্রান্সের ঐ পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র 'রোমান্স সেন্টিমেন্টেল' (Romance Sentimentale) সম্পাদনা করার জন্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক মাসের মধ্যে কাজ সেরে আলেকজান্দ্রভ হলিউডে বাকি দুই বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চলে গেলেন।

আমেরিকার জীবনযাত্রায় সব কিছুই খোলামেলা দেখে তাঁরা প্রথমেই তাঁদের যে ব্যঙ্গটি করতে চাইলেন তা হলো 'দি গ্লাস হাউস' (The Glass House)। এর চিত্রনাট্যটিতে ছিলো—একটি ঘর যার সমস্ত দেওয়ালগুলো স্বচ্ছ। মানুষ কখনো এমন ঘরে বাস করতে পারে না। তাঁদের কাছে এই হলো আমেরিকার জীবন, যাতে কোন নিজস্বতা নেই, গোপনীয়তা নেই, ঘর সংসার, খাওয়া ঘুমোনো, প্রাত্যহিক জীবন সবই প্রকাশ্য। এই নির্মম ব্যঙ্গ, চলচ্চিত্র হিসাবে তৈরি করার আর্থিক সাহায্য মিললো না।

যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার এক সুইস স্কুলশিক্ষকের জীবনের কাহিনী নিয়ে 'সাটার্স গোল্ড' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য হলিউডের কাছে অতিরিক্ত বিপ্লবী মনে হলো। এই সব কাজেই এই ত্রয়ীর সাথে সহযোগী হিসাবে ছিলেন ইভর মণ্টাগু।

১৯৬৫ সালে আলেকজান্দ্রভ যখন স্মৃতিচারণ করতে বসেন তখন এই সব ঘটনার সাথে তাঁর মনে পড়ে যায় 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা ও দৃশ্য গ্রহণের কথা।

কিছু বন্ধুর আহ্বানে তাঁরা মেক্সিকোয় গিয়েছিলেন 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের কাজে। চিত্রগ্রহণের কাজ সাত মাস চলেছিলো। হয়তো আর দুই বা তিন মাসের কাজ করলে সবটুকুই শেষ হতো। এমনি সময়েই আপটন সিনক্লেয়ার, এই চলচ্চিত্রের জন্য অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। কেন?

তখন সিনক্লেয়ারের ইচ্ছা ছিলো ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার। তাঁর ভয় হলো মেক্সিকোর জীবন সম্পর্কে এই চলচ্চিত্র তাঁর নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নষ্ট করবে। তখন কোনো উপায় ছিল না আর কোনোভাবে অর্থ সংগ্রহের, তাই এই ত্রয়ী মস্কোতেই ফিরে গিয়ে চলচ্চিত্রটি সম্পাদনা করার পরিকল্পনা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের লটবহরের সাথে

চলচ্চিত্রটি পাঠিয়েও দিলেন। কিন্তু সেটা আটকে গেল সিনক্লেয়ারের আপত্তিতে। ওটা ফিরে এলো আমেরিকাতে। সিনক্লেয়ারের দাবি হলো হলিউডেই চলচ্চিত্রটির সম্পাদনা করতে হবে। তর্ক বিতর্ক করে কোনো ফল হলো না। আইজেনস্টাইন রাজি হলেন না। এর অনেক বছর পর, ছয়ের দশকে আলেকজান্দ্রভের মনে হয়েছে এই 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রটি তাঁর সম্পাদনা করা উচিত। তিনি অনুভব করেছেন এই চলচ্চিত্রের দৃশ্য উপকরণ-গুলো পুরনো হয়ে যায়নি, মৃত হয়ে যায়নি। এর শিল্পগত ও মতাদর্শ-গত আকর্ষণ আছে। আলেকজান্দ্রভ এই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের ও দৃশ্যগ্রহণের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে আইজেনস্টাইনের ভাবনাচিন্তার মূল উপকরণের অনেক কিছুই সংগৃহীত আছে, এবং তিনি আইজেনস্টাইনের সাথে অনেক সম্পাদনায় কাজ করেছেন। তাই তাঁর পক্ষে এই চলচ্চিত্রটি শেষ করা সম্ভব।

আইজেনস্টাইনের পরবর্তীকালে যে 'নুভেল ভাগ' বা চলচ্চিত্রের নবতরঙ্গের কথা বলা হয়, তার আশ্চর্য নিদর্শন রয়েছে মেক্সিকোর পটভূমিতে এই চলচ্চিত্রে। সবাক চলচ্চিত্র কতো শিল্পসম্মত হতে পারে, আইজেনস্টাইন তাঁর অনেক দুঃসাহসী পরীক্ষা করেছিলেন এই চলচ্চিত্রে।

নিউইয়র্কে 'মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট' ফিল্ম লাইব্রেরিতে মেক্সিকোতে তোলা ৭৫ হাজার মিটার নেগেটিভ সংরক্ষিত ছিল। এই বিশাল সংগ্রহ থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেগুলো আইজেনস্টাইনের মূল ভাবনাচিন্তা থেকে অনেক দূরে।

অনেক চিত্রনাট্য প্রকাশিত হয়েছে 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্র সম্পর্কে। কিন্তু কোনোটাই এই চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ শেষ চেহারাটা কেমন হবে বলতে পারেনি।

১৯৫৬ সালে রিচার্ড গ্রিফিথ (Richard Griffith), আলেকজান্দ্রভের সাথে চুক্তি করলেন মেক্সিকোর ওপর চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে। কিন্তু সেই চুক্তি খুব বেশিদিন টিঁকে রইলো না, কারণ আমেরিকার সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের অধঃপতন ঘটলো।

১৯৬৩ সালে লণ্ডনে আলেকজান্দ্রভ এই চলচ্চিত্রটির চার ঘণ্টার একটি সংগ্রহ দেখেন। এই সংগ্রহটির ব্যবস্থা করেছিলেন আমেরিকার চলচ্চিত্র ইতিহাসবিদ্ জে লীডা (Jay Leyda)। ইংরেজ দর্শকদের কাছে সেদিন বিকেল চারটে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আলেকজান্দ্রভ মঞ্চে উপস্থিত থেকেছেন, একটানা সাত ঘণ্টা নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য।

সেই দিন আলেকজান্দ্রভ অনুভব করেছিলেন, মেক্সিকোর ওপর এই চলচ্চিত্র সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ কমেনি। তাই একদিন সত্যিই আমরা 'কিউ ভিভা

মেক্সিকো' চলচ্চিত্রটি দেখতে পেয়েছিলাম, অন্যের হাতে সম্পাদিত হয়ে। আজও আমরা জানি না, আইজেনস্টাইন নিজে চলচ্চিত্রটির সম্পাদনা করলে, কেমন লাগতো।

'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্র তৈরি করার সময় এক নতুন পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেছিলেন আইজেনস্টাইন। তা হলো চলচ্চিত্রের চরিত্রদের সাথে চলচ্চিত্রকারের কথোপকথন। এ ব্যাপারে আলেকজান্দ্রভের মনে হয়েছে, আইজেনস্টাইন তাঁর সময়ের থেকে কতোখানি এগিয়েছিলেন।

ছয়ের দশকের মাঝখানে আলেকজান্দ্রভের সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে—

মেক্সিকান সৈন্যদের পেছনে পেছনে হেঁটে চলেছে তাদের স্ত্রীরা। চলচ্চিত্রকার প্রশ্ন করেন—"তোমরা কোথায় চলেছো ?"

একজন মহিলা ক্যামেরার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—"আমি জানি না।"

চলচ্চিত্রকার বলেন—"তোমরা ভালো করে ভেবে দেখো কোথায় যাচ্ছো। সৈনিকদের সাথে, যুদ্ধে যাচ্ছো। তোমাদের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছো।"

মহিলাটি উত্তর দেয়—"কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি।" মহিলাটি সৈনিকটিকে অনুসরণ করে।

'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

আইজেনস্টাইনের জীবনের প্রথম সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র 'স্ট্রাইক' দেখিয়ে দিয়েছিল, চলচ্চিত্রের সম্পাদনার কাজে মন্তাজের ব্যবহার ও ফলাফল কেমন হতে পারে। প্রথম যখন এর দৃষ্টান্ত এই চলচ্চিত্রে সূক্ষ্মভাবে তিনি দেখিয়েছিলেন, তখনো আমেরিকা বা ইংলন্ডের পর্দায় এমন মন্তাজ প্রদর্শিত হয়নি। একটি দৃশ্য আছে—

কসাইয়ের ছুরিকে এড়ানোর জন্যে একটা ষাঁড় ভীষণভাবে মাথাটা ঝাঁকাচ্ছে, ছবির ফ্রেমের ওপরের অংশ ছাড়িয়ে।

(ক্লোজ-আপ্) ছুরিধরা হাত নিচের ফ্রেমলাইন ছাড়িয়ে জোরে আঘাত করে।

(লং শট্) ১৫০০ জন একটা ঢালু জমি দিয়ে নেমে আসছে।

৫০ জন জমি থেকে উঁচু হয়ে উঠছে হাতগুলো ছড়িয়ে।

একজন সৈনিক গুলি চালানোর জন্যে লক্ষ্য ঠিক করছে।

(মিডিয়াম্ শট্) বারুদের আগুন নিয়ে গুলি বেরিয়ে এলো।

ষাঁড়ের কম্পিত দেহটা গড়িয়ে পড়ে। ফ্রেমের বাইরে তার মাথা।

(ক্লোজ-আপ্) ষাঁড়ের পাগুলো ভীষণ ঝাঁকুনি দিচ্ছে। তার ক্ষুর রক্তাক্ত।

(ক্লোজ-আপ্) রাইফেলের পেছনের অংশ।

ষাঁড়ের মাথাটা একটা বেঞ্চের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।
১000 জন ক্যামেরাকে দ্রুত অতিক্রম করে চলে যায়।
ঝোপের আড়াল থেকে একদল সৈন্য বেরিয়ে আসে।
(ক্লোজ-আপ্) অদেখা আঘাতে ষাঁড়ের মাথাটা মৃত্যুতে ঢলে পড়ে, তার চোখগুলো জ্বলন্ত।
(লং শট্) সৈন্যদের পেছন থেকে গুলিবর্ষণ দেখা যায়।
(মিডিয়াম শট্) ষাঁড়টির পাগুলো একসাথে বাঁধা হয়, মাংস কাটার প্রস্তুতি হিসেবে।
(ক্লোজ-আপ্) একটা খাড়া পাড়ে মানুষেরা গড়িয়ে আসছে।
ষাঁড়টির গলাকাটা, রক্ত বয়ে যাচ্ছে।
(মিডিয়াম ক্লোজ-আপ্) ছবির ফ্রেমে মানুষেরা উঠে আসে, তাদের হাত ছড়ানো।
কসাই ক্যামেরা অতিক্রম করে যায়, (প্যানিং) তার রক্তাক্ত দড়ি দুলিয়ে।
এক দল লোক একটা বেড়ার দিকে ছুটে যায়, আর সেটা ভেঙে ঢোকার পরে তার পেছনে লুকোয়।
ফ্রেম থেকে হাত ঝুলে পড়ে।
ষাঁড়ের মাথাটা দেহ থেকে কাটা।
গুলিবর্ষণ।
এক দঙ্গল মানুষ ঢালু জমি বেয়ে জলে গড়িয়ে পড়ে।
গুলিবর্ষণ।
(ক্লোজ-আপ্) বন্দুকের নল থেকে বুলেট ছোঁড়া হচ্ছে।
সৈনিকদের পা এগিয়ে চলেছে ক্যামেরা থেকে দূরে।
জলে রক্ত ভাসছে, জলের রং বদলাচ্ছে।
(ক্লোজ-আপ্) ষাঁড়টির কাটা গলা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে।
একটা হাতে-ধরা পাত্র থেকে বালতিতে রক্ত ঢালা হচ্ছে।
রক্তের বালতি ভরা ট্রাক, (ডিজল্ভ্) লোহা-লক্কর ভরা ট্রাক। কাটা গলার মধ্য দিয়ে ষাঁড়টির জিভ টানা হচ্ছে।
সৈনিকদের পা দেখা যায় ক্যামেরা ছেড়ে আরো এগিয়ে চলেছে।
ষাঁড়টির ছাল ছাড়ানো হয়েছে।
১৫০০টি দেহ খাড়া ঢিবির পাদদেশে পড়ে আছে।
২টি ছাল-ছাড়ানো ষাঁড়ের মাথা।
একটা হাত রক্তের মধ্যে পড়ে আছে।
(ক্লোজ-আপ্) সমস্ত পর্দা জুড়ে, মৃত ষাঁড়টির চোখ।
(টাইট্ল্) শেষ।

'পোতেম্‌কিন্‌' চলচ্চিত্র তৈরির কাহিনী

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আইজেনস্টাইন নিজেই তাঁর 'পোতেম্‌কিন্‌' চলচ্চিত্র তৈরির কাহিনী ১৯৪৫ সালে লিখে গেছেন।

'১৯০৫' চলচ্চিত্রের বিশাল চিত্রনাট্যের একটা পৃষ্ঠার অর্ধেক অংশ নিয়ে একদিন তৈরি হয়েছিলো বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র 'দ্য ব্যাটল্‌শিপ পোতেম্‌কিন্‌'।

'১৯০৫' প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছিলো আইজেনস্টাইন ও নিনা আগাদ্‌ঝানোভার যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯২৫ সালের গ্রীষ্মে। পাতার পর পাতা লেখার পর, এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে একটামাত্র চলচ্চিত্রে আদৌ অতো বিশাল চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব কি না। অজস্র চরিত্র এসে পড়েছে, অজস্র ঘটনা এসে পড়েছে। বিভিন্ন ঘটনাবলীর এই বিশাল নোটবই থেকে যখন 'পোতেমকিন' অভ্যুত্থানের চলচ্চিত্র তৈরির ভাবনা শুরু হলো, তার প্রস্তুতি ছিলো অনেক গভীর। একটা যুদ্ধজাহাজে অভ্যুত্থান দেখিয়ে, ১৯০৫ সালের পরিবেশটাকে বোঝাতে হবে, তৈরি করতে হবে।

তাই প্রত্যেকটা দৃশ্যকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হয়েছিলো, কতোখানি বাস্তবের চেহারায় আনা যায়।

আইজেনস্টাইন নিনার কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি নিনার অংশগ্রহণেই শিখেছিলেন, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মানুষ এখন 'আমি' নয়, তারা হয়ে গেছে 'আমরা'। মনের এই পরিবর্তন 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের বিশাল আয়োজনের মধ্যে প্রতিফলিত। রাশিয়ার মানুষের এই যৌথ উপস্থিতিকে বোঝার পরিবর্তনের স্তরে, নিনা সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের মন্তব্য—"এবং আমি এর জন্যে তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।"

যুদ্ধজাহাজকে নিয়ে একটা চলচ্চিত্র করতে গেলে, একটা যুদ্ধজাহাজ দরকার। আর যদি ১৯০৫ সালের কোনো যুদ্ধজাহাজের ইতিহাসকে বর্ণনা করতে হয় তাহলে, সে সময়কার যুদ্ধজাহাজেরই ব্যবহার করতে হবে। না হলে, যথাযথভাবে সে সময়কার দৃশ্যাবলীকে নির্মাণ করা যাবে না।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯২৫, বিশ বছর কেটে গেছে। এই দু'টো দশকে যুদ্ধজাহাজের চেহারায় প্রচুর পরিবর্তন এসেছে। তাই বালটিক্‌ বা ব্ল্যাকসি নৌবাহিনীতে, ১৯০৫ সালের মতো পুরনো ধরণের জাহাজ দেখা যায় না। সেবাস্তোপোল উপসাগরে যে সব জাহাজ মনের আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে, তাদের কোনোটাকে দিয়েই 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের কাজ চলতো না।

নিজের ব্যঙ্গচিত্র
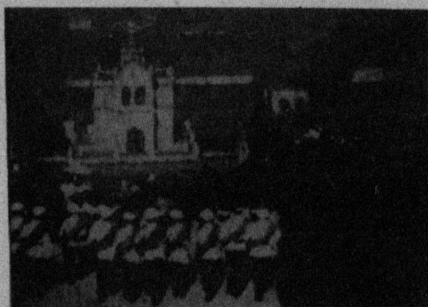
'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে মন্তাজ-১

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে মন্তাজ-২
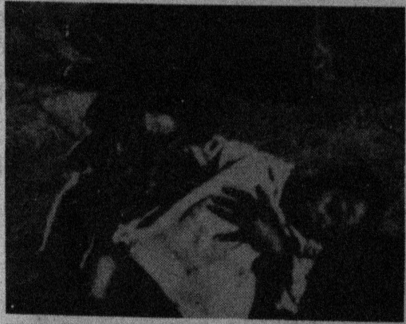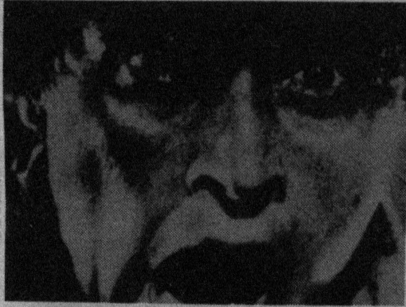
'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে মন্তাজ-৩ 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে মন্তাজ-৪
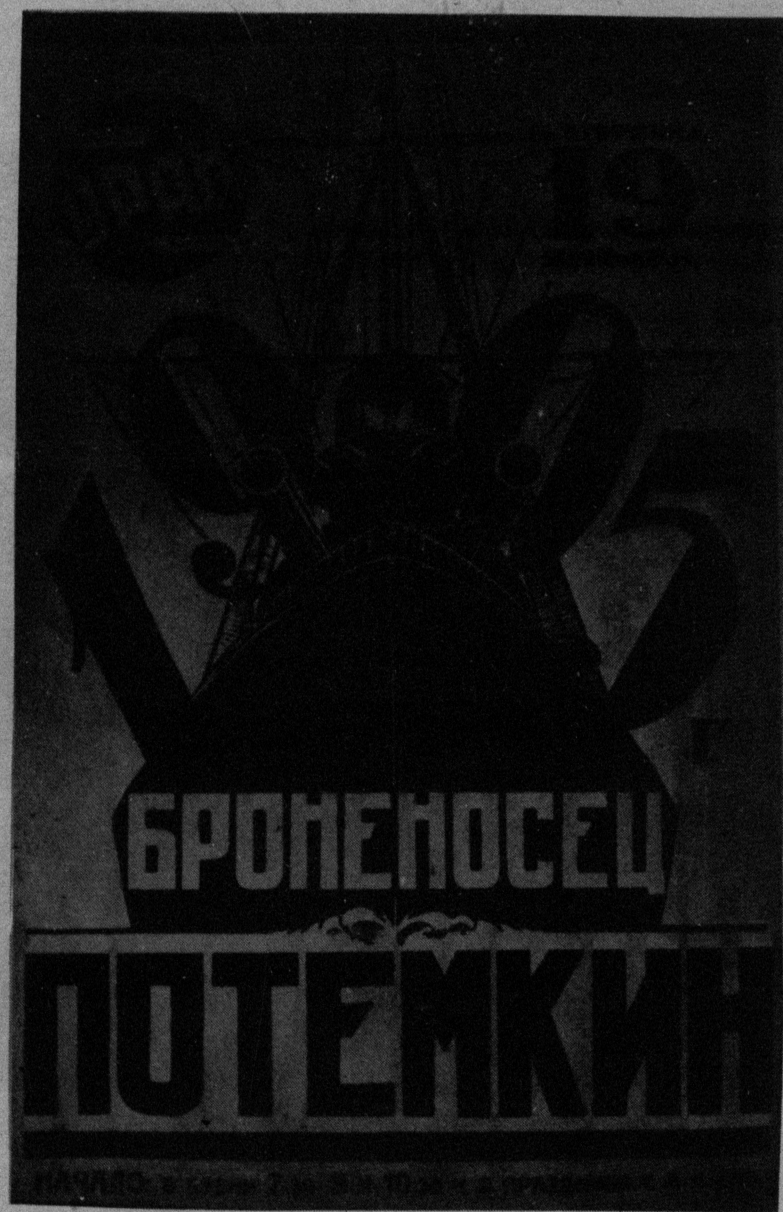
'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের পোস্টার

'পোতেমকিন' জাহাজটি অনেকদিন আগেই খুলে ফেলা হয়েছে, ভেঙে ফেলা হয়েছে। একসময় তার গায়ে লাগানো ইস্পাতের চাদর আর পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না সে জাহাজের আদলে তৈরি পাটাতন, যে পাটাতনে নাটকীয় পর্বগুলো দেখানো হবে। তাই কিছু স্বেচ্ছাসেবক ছড়িয়ে পড়লো, 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের উপযুক্ত জাহাজ খুঁজতে।
সত্যিই খবর এলো, 'পোতেমকিন' জাহাজ না থাকলেও তার ভগিনী-জাহাজ 'টুয়েলভ্ অ্যাপোস্‌ট্‌ল্‌স্' (Twelve Apostles) জাহাজটি এখনও বেঁচে রয়েছে। একসময়কার নামকরা শক্তিশালী জাহাজ এটা। পাথুরে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই বীর জাহাজের নোঙর সাগরের নিচের বালিতে আটকে রয়েছে। পুরনো দিনের স্মৃতিসমৃদ্ধ এই জাহাজ, উপসাগরে এক দূর বাঁকে শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে।
পাহাড়ের শত সহস্র খাঁজ দিয়ে উপসাগরের জল আছড়ে পড়ছে। আর ধূসর এই 'টুয়েলভ অ্যাপোস্‌টল্‌স্' জাহাজ যেন অতন্দ্র দ্বাররক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। একসময়কার মাস্তুল আর জাহাজের পাটাতনের ওপর সাজানো অন্য সব কাজের জিনিস, সময় আর সাগরের ঢেউয়ে ধুয়ে গেছে। সেই আভরণহীণ শরীরে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজটা এমন একটা পরিত্যক্ত বস্তু হিসাবে সেবাস্তোপোলের উপসাগরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক ঘুমন্ত লোহার তিমি।
এই লোহার তিমিকে আরো একবার জাগানোর ব্যবস্থা হলো, আরো একবার নড়ানোর ব্যবস্থা হলো। পাহাড়ের সাথে বাঁধা এই পুরনো জাহাজকে, একবার সমুদ্রের দিকে ঘোরানো হলো। এই যুদ্ধজাহাজটিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করানো হলো পাথুরে পাড়ের সমান্তরাল করে।
জাহাজের পাটাতনে নাটকীয় ঘটনাটি ঘটেছিলো খোলা সমুদ্রে জাহাজ যখন ভাসছিলো। তাই এমন একটা দৃশ্যগ্রহণে উচিত ছিলো না, কোনো উপসাগরে পাড়ে বাঁধা জাহাজের ব্যবস্থা করা।
আইজেনস্টাইনের সহকারীদের একজন ছিলেন লাইওশা ক্রাইয়ুকভ্ (Lyosha Krukov)। তিনি এক উপসাগরের পুরনো অভিজ্ঞ মানুষ হিসেবে সমস্যার সমাধান করে দিলেন।
জাহাজটাকে পাড়ের সাথে লম্বভাবে দাঁড় করানো হলো, উপসাগরের জলে। তাই জাহাজের পাটাতন বা ডেকের খানিকটা অংশের পেছনে দেখা গেলো উপসাগরের জল। আর আলো-আঁধারিতে জাহাজের খানিক অংশের পেছনে রইলো খোলা আকাশ। তাই সব মিলিয়েই মনে হচ্ছিল জাহাজটা জলে ভাসছে।
সীগাল পাখির দল এমন একটা জাহাজকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলো। ভাবলো এটা বুঝি এক এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের টুকরো। তাই পাখির দল

জাহাজের মাথার ওপর আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগলো। তাই আরো বেশি মনে হলো যেন খোলা সাগরের বুকে জাহাজটা ভাসছে।

একটা উত্তেজনাপূর্ণ নৈঃশব্দের মধ্যে বিশাল লোহার তিমিমাছ নড়তে থাকলো।

ব্ল্যাক সী বা কৃষ্ণসাগরের ওপরওয়ালারা বিশেষ আদেশ দিয়েছিলো, এই লোহার দৈত্যকে সাগরের মুখোমুখি হওয়ার। এবার মনে হতে লাগলো, এই যুদ্ধজাহাজ সাগরের লোনা জল কেটে এগিয়ে চলেছে।

সেই বিশাল জাহাজটার দেহটা নড়েচড়ে উঠলো। কিন্তু তার ডেকের ওপর আরো কিছু করার ছিলো।

'পোতেমকিন' জাহাজের পুরনো ব্লুপ্রিন্ট থেকে মাপজোক যোগাড় করে, জাহাজের ডেকের ওপর কাঠ দিয়ে তৈরি হলো ওপরের ঘরগুলো। এটা শুধু দৃশ্যগ্রহণের জন্যেই। সত্যিকারের ইতিহাসের ভিত্তিতে শিল্পকলার মাধ্যমে, চলচ্চিত্রে একটা অতীতকে পুনরায় তৈরি করা হলো।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে যুদ্ধ-জাহাজের পাশের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই পার্শ্ব-দৃশ্যে যুদ্ধজাহাজটি ছিলো 'পোতেমকিন' জাহাজের আদলে তৈরি নকল ছোটো একটা মডেল। মস্কোর সান্দুনভ্ সুইমিং পুলের জলেতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিলো এই মডেল। 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে এই ছোটো মডেলের আন্দোলিত চেহারা দেখে আমাদের মনে হয়েছিলো, এটা বোধহয় আসল বড়ো যুদ্ধজাহাজ।

কিন্তু পরিত্যক্ত আসল 'টুয়েলভ্ অ্যাপোস্‌টল্‌স্' জাহাজে চলচ্চিত্রের কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিলো ভিন্ন।

এই বিশাল জাহাজটার নড়বড়ে দেহটাকে খুশিমতো কখনোই ডানদিক বা বাঁদিকে ঘোরানো যাবে না। এটাকে এক ইঞ্চিও নড়ানো যাবে না। নড়লে এই খোলা সাগরের জলের দৃশ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে। ক্যামেরার ছবিতে ঢুকে পড়বে এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের কোনো অংশ।

জায়গার এই কঠিন সমস্যা, অ্যাইজেনস্টাইনদের নিজেদের নড়াচড়া করার অসুবিধা তৈরি করলো।

তার সাথে সাথে সময়ও ছিলো সীমাবদ্ধ। চলচ্চিত্রটি শেষ করতে হবে বিপ্লবের বার্ষিকী অনুষ্ঠানের মধ্যে। আর এই সব মিলিয়েই, সমস্ত পরিকল্পনাগুলো ছিলো নানা বাধ্যবাধকতায় পরিপূর্ণ।

যুদ্ধজাহাজটার পুরনো দেহটাকে শেকল আর নোঙর দিয়ে বাঁধা ছিলো, যাতে না সে সাগরে ভেসে যায়। আর আইজেনস্টাইনের স্থান ও সময় শেকল ও নোঙরে বাঁধা ছিলো, উৎসাহিত কল্পনায় ভেসে না যাওয়ার জন্য। আর বোধহয় সেইজন্যেই এই চলচ্চিত্র এতোখানি ভাবগম্ভীর হয়ে উঠেছে।

এই পুরনো জাহাজটাকে নিয়ে কাজ করার এক বড়ো সমস্যা ছিলো, যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করার জন্যে বারুদভরা মাইন।

পরিত্যক্ত জাহাজটা এই বিস্ফোরক মাইনের গুদাম। এর ভেতরে সংরক্ষিত থাকত বিস্ফোরক মাইন। আর এই অবস্থাতেই 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের কাজ করতে হয়েছে। জাহাজটা যখন নড়ে উঠলো আস্তে আস্তে তখন অবশ্য এই বিস্ফোরকের কোনো তাপ উত্তাপ ছিলো না। যখন এর ডেকে চলচ্চিত্রের কাজে ঘর তোলা হচ্ছিলো, তখনও এই বিস্ফোরকের তেমন তাপ উত্তাপ ছিলো না। সেটাই ভালো খবর।

কিন্তু আইজেনস্টাইনদের সবাইকে শুধু আতঙ্কে থাকতে হতো—বিস্ফোরক, বিস্ফোরক, বিস্ফোরক। সমস্ত কাজেই যেন এই বিস্ফোরক বারুদের স্তূপ সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাই ধূমপান করা চলবে না। ছোটাছুটি করা চলবে না। ডেকেতে কাজ শেষ হাওয়ার পরই, সব জিনিস সরিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু এই বিস্ফোরক মাইনের থেকেও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ছিলেন একজন মানুষ। এর রক্ষী গ্লাজাস্তিকভ্ (Glazastikov)। রুশ ভাষায় গ্লাজাস্তিকভ্ কথাটির অর্থ বড়ো বড়ো চোখ। আর সত্যি তিনি ছিলেন তাঁর নামের অর্থের উপযুক্ত মানুষ। সারাক্ষণ গ্লাজাস্তিকভ্ নজর রাখতো বিস্ফোরক মাইনের স্তূপের দিকে, যাতে না আগুন ধরে, ঝাঁকুনি লাগে বা বিস্ফোরণ হয়।

যদি এই বিস্ফোরক বারুদের স্তূপকে খালি করতে হতো, তাহলে কয়েক মাস লেগে যেতো। আর 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্র শেষ করতে হতো দিন পনেরোর মধ্যে, বিপ্লবের বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আগে। এটা একটা শক্ত কাজ, এমন একটা অবস্থার মধ্যে চলচ্চিত্র তৈরি করা।

কথায় আছে, "রুশরা কখনো বাধাকে ভয় পায় না।" আর সত্যি এমন সব বাধা অতিক্রম করে জাহাজের অভ্যুত্থানের চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছিলো।

পুরনো যুদ্ধজাহাজের মধ্যে জড়ো করা এই বিস্ফোরক বারুদের স্তূপ যে খানিকটা নড়েচড়ে উঠেছিলো, তা ব্যর্থ হয়নি বা জাহাজের ডেকে ঐতিহাসিক দৃশ্যের যে গর্জন শোনা গিয়েছিলো, তা-ও ব্যর্থ হয়নি। যখন চলচ্চিত্রে এই জাহাজকে দেখা গেলো, তখন তার চেহারার মধ্যেই ফুটে উঠেছিলো বিস্ফোরক ক্ষমতা।

যুদ্ধজাহাজে এক পুরনো বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে এই চলচ্চিত্র ইউরোপের অনেক দেশের সেন্সর, পুলিশবাহিনী আর পুলিশ শিবিরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিলো। এই বিদ্রোহের সুনামের উপযুক্ত ছিলো এই চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যতত্ত্বের এক বিপ্লব।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্র রাশিয়ার প্রেক্ষাগৃহগুলিতে দেখানো হচ্ছিলো, আর

উক্রেনেও এটা মুক্তি পাওয়ার কথা ছিলো। মুক্তি পাওয়া মাত্রই বিরাট শোরগোল পড়ে গেলো।

চুরির দায়ে পড়লেন আইজেনস্টাইন। অভিযোগটি করেছিলেন এক ব্যক্তি, যিনি দাবি করেন তিনি 'পোতেমকিন' বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অথচ সেইদিনও এটা রহস্য রয়ে গেলো যে, এই ব্যক্তি 'পোতেমকিন' বিদ্রোহ নিয়ে একচ্ছত্রও কোথাও লেখেননি। কিন্তু দাবিটা হলো, যেহেতু এই ব্যক্তি বিদ্রোহের অংশীদার, অতএব তার কিছু ভাগ আছে নিনা ও আইজেনস্টাইনের চিত্রনাট্য লেখার পারিশ্রমিকে।

এই দাবি ছিলো বিশ্রী গোলমেলে, অসঙ্গত এবং দুর্বোধ্য। কিন্তু যখন এই ব্যক্তি দাবি করে বসলেন যে, তিনি "গুলি চলার সময় ডেকের ওপর ত্রিপলের তলায় ছিলেন", তখন মামলাটা আদালতে গিয়ে হাজির হলো।

মামলায় যেন দাবিদারের অকাট্য প্রমাণ সব আছে, আর তাই দাবিদারের উকিলেরা রীতিমতো ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসলেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে এই বিশ্রী ঘটনাটা যেন এক ফুৎকারে বাতাসে উড়ে গেলো।

একটা ঘটনা চলচ্চিত্রের প্রযোজকরাও মামলার সময় ভুলে গিয়েছিলো যে, ওই দাবিদার নিশ্চিতভাবে বলেছে যে সে নাকি "ত্রিপলের তলায় ছিলো।"

আসল সত্য ছিলো ত্রিপলের তলায় কেউ ছিল না, কেউ থাকতে পারে না, কারণ কোনো লোককেই 'পোতেমকিন' জাহাজে ত্রিপল ঢাকা দেওয়া হয়নি। এই ত্রিপলের পরিকল্পনাটা ছিলো নিছক পরিচালক আইজেনস্টাইনের মস্তিষ্ক-প্রসূত।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে মাতাইয়ুশেংকো (Matyushenko) চরিত্রে যে প্রাক্তন নৌ-সেনা অভিনয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন আইজেনস্টাইনের উপদেষ্টা। যখন তিনি শুনলেন যে আইজেনস্টাইন পরিকল্পনা করেছেন সৈনিকদের হত্যা করার পূর্ব মুহূর্তে তাদেরকে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দেবেন, তখন এই প্রাক্তন নৌ-সেনা আপত্তি করেছিলেন। এই উপদেষ্টা বলেছিলেন, "আমরা হাস্যাস্পদ হয়ে যাবো! এটা কখনো ঘটেনি।"

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, সৈনিকদের গুলি করার আগে ত্রিপলটা জাহাজের ডেকে আনা হয়েছিলো যাতে, মৃত্যুদণ্ডিত সৈনিকেরা এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকলে ডেকে একফোঁটা রক্তও না পড়ে। তাই আইজেনস্টাইনকে এই প্রাক্তন নৌ-সেনা বলেছিলেন—"আর তুমি কিনা নাবিকদের ত্রিপল দিয়ে ঢাকতে চাও। আমরা আমাদের নিজেদেরকেই হাসির খোরাক করে তুলবো! এটা যদি আমরা করি তাহলে আমাদের কাজ তালগোল পাকিয়ে যাবে।"

উপদেষ্টার এই প্রবল আপত্তি আইজেনস্টাইনের মনে পড়ে। কিন্তু তখন

আমরা চলচ্চিত্রে যেমন দেখি, তিনি সেভাবেই দৃশ্যগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
মৃত্যুদণ্ডিতদের সাথে জীবনের এই বিচ্ছিন্নতা, বিসদৃশ, দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো।
আইজেনস্টাইনের উপদেষ্টা এই প্রাক্তন নৌ-সেনা যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আইজেনস্টাইন তা মানেন নি। তাই সত্য ঘটনার যথাযথ দৃশ্য ছিলো না 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে। কিন্তু আইজেনস্টাইনের মনে পড়ে যায়, গ্যেটের কথা—"সত্যতার জন্যে কেউ সত্যকে নাও মানতে পারে।" 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্র যেন গ্যেটের এই কথাই প্রমাণ করেছিলো।
'পোতেমকিন' জাহাজের উপর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত নাবিকের দলকে হত্যা করার পূর্ব মুহূর্তে এক বিরাট ত্রিপল ঢাকা দেওয়া হয়েছিলো, ঠিক যেন দণ্ডিত মানুষের চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া। একসাথে এতোগুলো মানুষের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অস্তিত্বকে জীবিত মানুষের চোখের সামনে ঢাকা দিয়ে আড়াল করাকে অনেক বেশি আবেগভরা মনে হচ্ছিলো। দর্শকেরা মাথা ঘামায়নি, আইজেনস্টাইন ঐতিহাসিক সত্যকে নিখুঁতভাবে দেখাচ্ছেন কি না।
মামলায় এই দাবিদারের কথায় হয়তো কিছু সত্যতা ছিল। কিন্তু তবুও তিনি হেরে গেলেন ঐতিহাসিক সত্যের কাছে। কারণ তিনি বলেছিলেন যে আসল 'পোতেমকিন' জাহাজে ত্রিপলের তলায় তিনি ছিলেন।
'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে কিন্তু দৃশ্যটি ঐতিহাসিকভাবে ভুল হয়ে গেলো। আর সেটাই একসময় এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইতিহাস হয়ে গেলো। কখনোই কোনো দর্শক দৃশ্যকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেনি। বরঞ্চ 'পোতেমকিন' জাহাজে বিদ্রোহের ঘটনার অঙ্গ হিসেবে দৃশ্যটি রয়ে গেলো।
'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলোর একজন হলো সার্জন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে একজন অভিনেতাকে পাওয়া গেলো, যদিও বিশেষ সন্তোষজনক মনে হলো না।
একদিন আইজেনস্টাইন এই সার্জন এবং নিজের ইউনিটকে নিয়ে কমিণ্টার্ন জাহাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন কিছু দৃশ্য তোলার জন্য।
সার্জনের থেকে একটু দূরে বসে আইজেনস্টাইন অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন। অভিনেতাদের মুখ দেখে ক্লান্ত আইজেনস্টাইন তখন দেখছিলেন যারা আয়না ইত্যাদি ধরে দাঁড়িয়েছিলে, তাদের মুখ।
এই কলাকুশলীদের দলে ছিলো এক ছোট্টো মানুষ। যে হোটেলে আইজেনস্টাইনরা অবসর সময় কাটাতো, তার উনুন জ্বালানোর কাজ এই ছোট্টো মানুষটির হাতে ছিলো।
আইজেনস্টাইন অবাক হয়ে ভাবলেন—"এই দুর্বল মানুষটিকে ভারী আয়না

ধরার কাজে কেন ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে? এ হয়তো জলেতেই আয়নাটা ফেলে দেবে কিংবা ভেঙেই ফেলবে। এটা খুব বিশ্রী ব্যাপার।"

কাজের লোক হিসাবে এই মানুষটির শরীরে শক্তিমত্তার কথা ভাবতে ভাবতে আইজেনস্টাইনের ভাবনা চলে গেলো মানুষটির প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের দিকে। মানুষটির একটি ছোট্টো গোঁফ ছিলো, আর ছিলো একগুচ্ছ ছাগল-দাড়ি। মানুষটির চতুর চোখ।

আইজেনস্টাইন মানুষটিকে কল্পনা করছিলেন নৌ-বাহিনীর সার্জেনের পোশাকে। মানুষটির পরনে তখনকার পোশাকটা নিয়ে আর ভাবছিলেন না আইজেনস্টাইন।

এবার যখন চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের সময় এসে গেলো, তখন আইজেনস্টাইনের চিন্তা বাস্তবে পরিণত হলো। কয়েক মুহূর্ত আগের সাদাসিধে শ্রমিকটি তখন 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের সার্জন।

একবার একটা ছবি ছাপা হয়েছিলো, যেখানে সাজসজ্জার শিল্পী আইজেন-স্টাইনের মুখে দাড়ি এঁটে দিচ্ছে আর আইজেনস্টাইন বসে আছেন পাদ্রীর পরচুলা লাগিয়ে। এই ছবি প্রকাশিত হওয়ার পরেই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে পাদ্রীর ভূমিকায় আইজেনস্টাইন অভিনয় করেছেন। এ কথাটা একেবারেই সত্য নয়।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে পাদ্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সেবাস্তোপোল শহরের ধারে এক বাগানের মালী। তাঁর দাড়িটা ছিল আসল। কিন্তু তাঁর ধবধবে সাদা চুল ছিল নকল।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে একটা দৃশ্য ছিলো, এই পাদ্রী সিঁড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছেন ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে। ক্যামেরার দিকে পেছন ফেরানো পাদ্রী চরিত্রে অভিনয়ে ছিলেন সত্যিই আইজেনস্টাইন। দৃশ্যটিকে চমকপ্রদ করার জন্য এ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিলো।

আর একজন মানুষের গল্প। তিনি ছিলেন ক্রিমিয়ার এক রক্ষী। আলুপ্‌কে প্রাসাদে পার্কের রক্ষী।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে বিখ্যাত শ্বেতপাথরের সিংহের দৃশ্যে, গোলমাল ঘটলো এই সিংহের মূর্তি নিয়েই। এই রক্ষীটি তার ময়লা প্যান্ট আর ছেঁড়া জুতো পড়ে সিংহমূর্তির একটির মাথার ওপর শক্তভাবে বসে রইলেন। যতোক্ষণ না আইজেনস্টাইনরা এই সিংহমূর্তির ছবি তোলার অনুমতি নিয়ে আসছেন, ততোক্ষণ এই রক্ষীটি ছবি তুলতে দেবেন না।

কিন্তু ওখানে সিংহের মূর্তির সংখ্যা ছিলো ছয়। তাই যখন এই রক্ষীটি একটি সিংহের ওপরে বসছেন, তখনই আইজেনস্টাইনরা ছুটছেন অপর একটি সিংহমূর্তির দিকে। এমনি করেই চললো কিছুক্ষণ আইন অনুমতির

খেলা। অবশেষে আইজেনস্টাইনরা তিনটি সিংহমূর্তির ক্লোজ-আপ ছবি তুললেন।

আইজেনস্টাইনের এই সিংহের নাচ মনে পড়ে। একটা পুরো দিন খরচ হয়ে গিয়েছিলো এর ছবি তুলতে।

বিখ্যাত কুয়াশাদৃশ্যের কথা মনে হয় এবার।

সমস্ত বন্দর ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো গভীর কুয়াশায়। আয়নার মতো উপসাগরের জল যেন তুলোর আবরণে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো।

আইজেনস্টাইনের মনে হয়, ওদেসার অপেরা হাউসের পরিবর্তে যদি 'সোয়ান লেক' নৃত্যনাট্য এই উপসাগরের পরিবেশে মঞ্চস্থ হতো তাহলে, যে কেউ ভাবতে পারতো এই হলো সেই তুষার-শুভ্র পোশাক, যে পোশাকে নৃত্যশিল্পীরা সাদা রাজহাঁসে পরিণত হয়েছিলো।

কিন্তু বাস্তবটা ছিলো আরো সুস্পষ্ট। একটা কুয়াশা মানে, একটা দিন নষ্ট। এ যেন চলচ্চিত্র তৈরির সময় এক একটা 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' বা কালো শুক্রবার। পারতপক্ষে কখনো কখনো, এক সপ্তাহের মধ্যে সাতটা দিনই এমনি 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'।

আজকের দিনটাও তেমনি এক কালো দিন। যদিও চারপাশের সবকিছুই সাদা আর সাদা। শুধু কালো চোখে পড়ে নৌকোগুলোর শরীরে। ঠিক যেন জলহস্তীর মতো।

এখানে সেখানে কুয়াশা ভেদ করে সরু সরু হয়ে এসে পড়ে সূর্যের আলো। সেখানের রংটা হয় সোনালী, গোলাপী আর তাজা। কিন্তু সূর্যটা যেন তার নিজের প্রতিবিম্ব সাগরে দেখে ঈর্ষাকাতর হয়ে মেঘের ঘোমটায় মুখ ঢাকে।

এ সবই ভালো, কিন্তু কাজ করা অসম্ভব। ওঁরা সাড়ে তিন রুবলের একটা নৌকো ভাড়া করলেন।

আইজেনস্টাইন, টিসে এবং আলেকজান্দ্রভ নৌকোয় করে কুয়াশায় ঢাকা বন্দরের মধ্য দিয়ে চললেন। বন্দরটা মনে হচ্ছিলো আপেল ফুলে ঢাকা পড়ে গেছে।

তিনজন মানুষ নৌকোর ওপর আর তার সাথে রয়েছে তাঁদের বিশ্বস্ত কুকুরের মতো, চলচ্চিত্রের ক্যামেরাটি। যেন তাঁদেরই মতো, ওটা বিশ্রাম চাইছে। কিন্তু এঁরা তিনজন তখন প্রবল উৎসাহী। তাই ক্যামেরার বিশ্রাম নেই, কুয়াশারই ছবি তুলতে হবে।

ক্যামেরার লেন্সে কুয়াশা লেগে যাচ্ছিলো। ক্যামেরার ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলো ফিসফিস করে যেন বলে উঠছিলো—"এসব জিনিসের ছবি তোলা উচিত নয়।"

পাশ দিয়ে যে সব নৌকো চলে যাচ্ছিলো, তার যাত্রীরাও বলছিলো—"কি পাগলামি!"

ওদেসায় চলচ্চিত্র তৈরি করতে এসেছিলো এক ক্যামেরাম্যান, সেও নৌকোয়

করে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় রসিকতা করে, আইজেনস্টাইনদের সৌভাগ্য কামনা করে গেলো।

সত্যি তাঁদের ভাগ্য ভালো ছিলো। কুয়াশার মধ্যেই, হঠাৎ যেন এক আবেগময় রূপকে পাওয়া গেলো। আবছা নানা জিনিসের ছবি একে একে ক্যামেরায় তোলা হলো। তারপর তার মধ্য থেকেই পাওয়া গেলো একটা অদ্ভুত নমনীয় বিষাদের সুর।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে ভাকুলিনচুকের স্মৃতিতে যে শোকের সুর, তার মন্তাজ তৈরি হয়েছিলো এই কুয়াশার দৃশ্যের টুকরোগুলো দিয়ে। আর এই কুয়াশার প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো অসাধারণ।

কিন্তু সমগ্র 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে এই কুয়াশার দৃশ্য তুলতেই সব থেকে কম খরচ হয়েছিলো। আর সেই খরচটুকুও শুধু নৌকো ভাড়ার জন্যে সাড়ে তিন রুবল।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আজ বোধহয় এমন কোনো গ্রন্থ নেই যেখানে ওদেসা বন্দরের বিশাল লম্বা চওড়া সিঁড়ির দৃশ্যের আলোচনা থাকে না। 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্র নিয়ে যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা জানেন এই ওদেসার সিঁড়ির দৃশ্যটি প্রায় এককভাবে এই চলচ্চিত্রকে অমর করে রেখেছে—তার টেকনিক্যাল ব্যবহারে এবং শিল্পসম্মত সৌন্দর্যে।

আমার মনে পড়ে চলচ্চিত্রের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি বিদেশী বইয়ের কথা, যার প্রত্যেকটি পাতায় ওদেসার সিঁড়ির দৃশ্যের এই একটি ফ্রেম ছাপা ছিল। পৃষ্ঠার ওই গুচ্ছ দ্রুত উল্টে গেলে, তৈরি হতো ওদেসার সিঁড়ির দৃশ্যের একাংশ। চলন্ত জীবন্ত।

আইজেনস্টাইন নিজেও বেশ খানিকটা দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এই ওদেসার সিঁড়ির দৃশ্য সম্পর্কে। তাঁর কাছে ওদেসার সিঁড়ি একটা প্রেরণার মুহূর্ত ছিলো।

আইজেনস্টাইনের মতে কোনো দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের মুহূর্তে দৃশ্যের নানা মালমশলা, সেট্‌স্ আর প্রপ্‌স্ কখনো কখনো পরিচালকের থেকেও আরো ভের বোদ্ধা হয়। সত্যিকারের দক্ষতা এবং প্রতিভা দিয়ে বুঝতে হয় এবং শুনতে হয় একটা দৃশ্য নিজেই কি চায়। কোনো চলচ্চিত্র সম্পাদনা করার সময় প্রত্যেক শটে ফিস্ ফিস্ করে বলা কথাগুলো শুনতে হয়। যে শট্‌গুলো পর্দায় যখন নিজেরাই জীবন্ত হয়ে উঠবে, প্রায়ই সে শট্‌গুলো প্রস্তুতির সময়কার কল্পনাকে ছাপিয়ে যাবে।

কিন্তু এটা করতে গেলে, প্রত্যেকটি দৃশ্য বা চলচ্চিত্রের স্তর সম্পর্কে পরিচালকের অসাধারণ পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। আর তারই সাথে তাঁর ধারণা প্রকাশ করার জন্য বহু বিচিত্র উপায় ব্যবহারের যোগ্যতা থাকা দরকার।

তাঁর এ ধরণের উদার নীতি ও জ্ঞান থাকা দরকার যে, অজানা বা সদ্যজানা কোনো বস্তুকে হাতে পেলে, সেটাকে যথাযথ কাজে কিভাবে লাগাতে হবে।

কার্যকরী চিত্রনাট্যে ছিলো 'পোতেমকিন' জাহাজ থেকে গুলি ছোড়ার দৃশ্যে উত্তেজনাটা কেমন হবে ওদেসার সিঁড়িতে। খসড়াতে এর তালিকাও দেওয়া ছিলো, কেমন করে এটা তুলতে হবে।

কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেলো এই একই দৃশ্যের আরো জোরালো প্রকাশভঙ্গির একটা উপায়ের। আর সৌভাগ্যক্রমে এগুলোই হয়ে উঠলো চলচ্চিত্রের একান্ত অঙ্গ। বহু দৃশ্যের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে।

ভাকুলিনচুকের দেহটাকে নিয়ে শোকের দৃশ্যের চিত্রনাট্য ছিলো কয়েকডজন পৃষ্ঠায়। ছিলো বন্দরের সব কিছুর এক ধীরগতির প্রকাশ।

কিন্তু বন্দরের কুয়াশার দৃশ্যকে ছবিতে তুলতে পেরে, এই শোকের আবেগের সাথে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়ে, এমন একটা প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলো যেটা হয়ে উঠলো আইজেনস্টাইনের ভাবনাচিন্তার নির্যাস।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে এমন অনেক দৃশ্যই নিছক সুযোগ পাওয়ার কারণে তৈরি হয়েছে। অত্যাচারীদের নৃশংসতার অনেক দৃশ্যই এভাবে তৈরি হয়েছে— রাস্তার ওপর বা দোকান ও কারখানার সম্মুখে।

মূল চিত্রনাট্য কখনোই বলে দেয়নি ওদেসার সিঁড়ির দৃশ্য কিভাবে তুলতে হবে বা কিভাবে মন্তাজে আনতে হবে। আইজেনস্টাইন প্রথম যখন সিঁড়িগুলো দেখেছিলেন, তখনই তাঁর এই ভাবনাচিন্তাগুলো এসেছিলো।

এমন একটা কিংবদন্তী প্রচার করা হয় যে, আইজেনস্টাইন যখন ডিউকের স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে দাঁড়িয়ে পাথুরে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নেমে এসেছিলেন, তখন এই দৃশ্যের পরিকল্পনার জন্ম হয়। এটি একটি কিংবদন্তী, এর সঙ্গে আরো অনেক রঙিন গল্প জুড়ে দেওয়া হয়।

আসলে ওদেসার সিঁড়ির এই বিশাল প্রত্যেকটা ধাপ, দৃশ্যটি সম্পর্কে ভাবনা যোগায়, কল্পনার নতুন ধাপের প্রেরণা যোগায়।

এটাই সত্যি যে, ভয়ার্ত মানুষের ধাক্কাধাক্কি ও শঙ্কিত গতি হচ্ছে এমনই একটা উত্তেজনা, যেটি আইজেনস্টাইন প্রথম দেখতে পেলেন ওদেসার সিঁড়িতে।

আর একটা ভাবনা হয়তো কাজ করেছে, ১৯০৫ সালের একটি পত্রিকার একটি চিত্র। যেটিতে আইজেনস্টাইন দেখেছিলেন, একজন ঘোড়ায় চড়ে ধোঁয়ায় ঢাকা সিঁড়িতে ডাইনে বাঁয়ে তলোয়ার চালাচ্ছে।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে শত শত অভিনেতা-অভিনেত্রী আমাদের কাছে নামহীন রয়ে গেছেন, অচেনা রয়ে গেছেন। এমনকি এঁদের বিরাট অংশই আইজেন-স্টাইনের কাছে ছিলেন অপরিচিত।

ভাকুলিনচুকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন আন্তনভ্ (Antonov)। গিলাইয়া-রভ্স্কির চরিত্রে অভিনয় করেছেন আলেকজান্দ্রভ। গলিকভের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রকার বারস্কি (Barsky)। আর ছিলেন লেভ্চেনকো (Levchenko)। পারতপক্ষে এঁরা ছাড়া প্রায় আর সব মানুষই ছিলো অচেনা, অজানা।

যেমন শোকমিছিলের বিশাল দৈর্ঘ্য জুড়ে হেঁটে গেছে শত শত অজানা মানুষ। চড়া সূর্যের আলোয় ওদেসার সিঁড়িতে ছোটাছুটি আর ওঠানামা করেছে শত শত অজানা মানুষ। এই চলচ্চিত্রের জন্যেই পরম উৎসাহে শত শত অজানা মানুষের কথা আইজেনস্টাইন মনে করেন, স্মরণ করেন। ১৯৪৫ সালে, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আইজেনস্টাইন মিলিত হতে চান সেই নামহীন শিশুটির সাথে, যে সিঁড়িতে গড়াতে থাকা ছোট্টো গাড়িটায় শুয়ে চিৎকার করে কাঁদছিলো। তার বয়স কতো হবে ১৯৪৫ সালে? নিশ্চয়ই ২০ বছর বয়স হয়ে গেছে। সে কোথায়? সে এখন কী করছে? সে কী এখন ওদেসাকে বাঁচানোর দলে? নাকি ওদেসার থেকে দূরে কোনো কবরখানায় সে শুয়ে আছে? নাকি সে তার নিজের শহরটাকে আবার গড়ে তুলতে ব্যস্ত আছে?

কিছু মানুষের নাম আইজেনস্টাইন মনে করতে পারেন। এর একটা কারণ আছে। চলচ্চিত্রের পরিচালকরা এই 'নেপোলিয়ন কৌশল' ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়।

নেপোলিয়নের নাকি অভ্যেস ছিলো কোনো সৈন্যের ব্যক্তিগত খবর তার বন্ধুদের কাছ থেকে নেওয়ার, আর তারপরে হঠাৎ কোনো সৈন্যকে চমকে দিতেন তার হাঁড়ির খবর উল্লেখ করে। কখনো প্রেমিকার নাম ধরে, কখনো খুড়োখুড়ির অসুখ সম্পর্কে, বা কখনো আরো কোনো খুঁটিনাটি বিষয় বলে। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কানাকানি হতো যে, নেপোলিয়ন প্রত্যেকটি সৈন্যের হাঁড়ির খবর রাখেন। এতে নেপোলিয়নের কাজ হতো খুব।

ওদেসার সিঁড়ি। বিশাল তার দৈর্ঘ্য। প্রত্যেকটি ধাপ যেন বড়ো বড়ো চাতাল। আর দৃশ্যেতে আছে শত শত মানুষের ওপরে এখানে গুলিবর্ষণ হয়েছে। দৃশ্যটা সেভাবেই শুরু হলো।

সহস্রাধিক পা নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। মানুষের ঢল নেমে আসছে ওদেসার সিঁড়িতে।

প্রথমবার তারা ভালোই করলো। কিন্তু দ্বিতীয়বার যেন একটু শক্তি কমে গেছে। তৃতীয়বার তারা সত্যিই খুব ধীর গতিতে নড়ছিলো।

সেই শত শত জুতোর আওয়াজকে ছাপিয়ে হঠাৎ একটা উঁচু জায়গা থেকে মেগাফোনে আইজেনস্টাইনের চিৎকার ভেসে এলো।

"আরেকটু ঠিক করে, কমরেড প্রোকোপেন্কো!" সেই বিশাল মানুষের দল

স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তবে কি আইজেনস্টাইন তাঁর মঞ্চ থেকে সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন? তিনি কি সবাইকে নাম ধরে চেনেন?

বিরাট জনসমুদ্র নতুন করে শক্তি পায় আর সামনের দিকে ছুটতে থাকে। সবাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে চলচ্চিত্রের পরিচালক তাদের প্রত্যেককে লক্ষ্য করছেন।

আইজেনস্টাইন যা করতেন তা হলো, যে ব্যক্তির নাম তিনি জানতেন তার নাম ধরে চিৎকার করতেন।

এই কুয়াশা, এই ওদেসার সিঁড়ি—এ সবই ঘটনাক্রমে তৈরি হয়েছিলো। ঠিক যেমন সূর্যের আলোটাও আইজেনস্টাইনকে চমৎকার সাহায্য করেছিলো। আবার কখনো কখনো এই সূর্যের আলোই সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।

১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানের সমগ্র কাহিনী একটা পর্বের আবেগের মধ্যে, অনেক টুকরো অংশ কখনো কখনো সমগ্রের জায়গা করে নিয়েছে। কখনো কখনো একটা টুকরো সমগ্রের আবেগটাকে আত্মস্থ করেছে।

আর এই অসাধারণ টুকরোগুলো হলো, ক্লোজ-আপ শট্। যা 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে অনবদ্য ও অপরিহার্য। এই ক্লোজ-আপ শটেই সমগ্রের একটা অংশকে দেখা যায় অনেক বিশদভাবে। তাই দর্শকদের যে পর্যবেক্ষণ আর অনুভূতি, তাকে এই ক্লোজ-আপ ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

আইজেনস্টাইন এই ক্লোজ-আপ নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। কোনো মানুষের কথার মধ্যেই যেমন একটা টুকরো অংশকে আরো বিশদ করে বলা হয়ে থাকে, আবেদন ও আবেগের কারণে। চলচ্চিত্র ঠিক তাই।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে সার্জনকে যখন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো, তখন তাঁর অসহায় সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিলো ঝুলন্ত চশমাটা।

সার্জনের ছাগল দাড়িসমেত চেহারাটা তাঁর শারীরিক এবং মানসিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর একটা প্রতীক ছিলো। আর এই অদ্ভুতদর্শন নাকের ওপর চশমাটিও, যেটি একটা সরু শেকল দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা থাকতো।

পাটাতনের ওপরে যে ঘটনা দেখানো হয়েছিলো, সেটা জারের আমলে যে কোনো প্রতিবাদকে ধ্বংস করার সাধারণ চিত্র। ঠিক যেমন যাদেরকে বিদ্রোহীদের ওপর গুলি করার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো, তাদের প্রতিক্রিয়াও ছিলো ১৯০৫ সালের রাশিয়ার এক সাধারণ দৃশ্য।

কোনো সেনাবাহিনীকে যখন এক দঙ্গল মানুষের ওপর, জনতার ওপর, ব্যাপক জনগণের ওপর, তাদের নিজেদের ভাইদের ওপর গুলি চালাতে বলা হতো—তখন অনেক সময়ই সেনাবাহিনী তা করতে অস্বীকার করতো। এটা ছিলো এক সময় রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলদের পাঠানো সেনাবাহিনীদের আচরণ। তাই

অনেক জায়গাতেই বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ওপর এমন নৃশংসভাবে গুলি চালানোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হতো।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে ভাকুলিনচুকের দেহ নিয়ে শোক-সমাবেশ ছিলো এক সময়ের রাশিয়ার জানা ঘটনা। বিপ্লবী বীরদের শবযাত্রা একটা নিস্পৃহ সমাবেশ থেকে হয়ে উঠতো ভীষণ নতুন কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণা, নতুন অভ্যুত্থানের দিশারী।

মস্কোর রাস্তায় যখন বৌমানের (Bauman) শবদেহ নিয়ে মিছিল হয়েছিলো, তখন যে আবেগ ও আবেদন দেখা গিয়েছিলো—ভাকুলিনচুকের শোক-সমাবেশ ছিলো প্রায় তারই অনুকরণ।

রাশিয়ার বাকুতে এবং ৯ জানুয়ারির গণহত্যায় যেমনটি হয়েছিলো, তার একটা মিশ্র প্রতিফলন ছিলো ওদেসার সিঁড়ির দৃশ্যে।

যখন ১৯০৫ সালের মুক্তির বাতাস শত শত মানুষ প্রাণ ভরে নিতে চেয়েছে, তখন প্রতিক্রিয়াশীলরা সেই আশাকে নৃশংসভাবে ধ্বংস করেছিলো। একটি সভা চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডরা। ওদেসার সিঁড়ির দৃশ্য ছিলো এই বিষাদ-স্মৃতির প্রতিফলন।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে শেষের দিকে যেমনটি আছে যে, যুদ্ধজাহাজটি গুরুগম্ভীরভাবে ভেসে চলেছে, এটা ছিলো ১৯০৫ সালের একটা প্রতীক।

বাস্তব ইতিহাসে 'পোতেমকিন' জাহাজে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিলো। বিদ্রোহের পরে প্রথমে জাহাজটিকে কন্‌স্তান্‌জাতে (Constanza) আটকানো হয়। তারপর জারের সরকারের হাতে 'পোতেমকিন' জাহাজকে তুলে দেওয়া হয়। কিছু নাবিক পালিয়ে যায়। কিন্তু মাতাইয়ুসেনকোকে জারের জহ্লাদেরা হত্যা করে।

কিন্তু 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে, সমস্ত বিদ্রোহ একটি জয়লাভে গিয়ে শেষ হয়। আইজেনস্টাইনের মনে হয়েছিলো, যদিও ১৯০৫ সালের বিপ্লব রক্তপাতের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলো, তবুও ইতিহাসের আগামী দিনে অক্টোবর বিপ্লব জয়ী হওয়ায় সেটা ছিলো এক সফল পদক্ষেপ। 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্র ছিলো ১৯০৫ সালের বিপ্লবের একটি টুকরো ঘটনামাত্র। তাই তার ব্যর্থতা না দেখিয়ে, সমগ্র লড়াইয়ের সফলতাকে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিধ্বনি করে তুলেছিলেন আইজেনস্টাইন।

এই চলচ্চিত্রে হাজার অজানা পাত্রপাত্রীদের সাথে কিছু অজানা বস্তু ছিলো, যা বেশ ভয়ের কারণ।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের দৃশ্যে নৌ-বাহিনীর যে বিশাল বিস্তার দেখানো হয়েছে, তা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। তখন ১৯২৫ সালে সোভিয়েত সামরিক বাহিনী সম্পর্কে তবে কি গুপ্তচরদের সংগ্রহ করা খবর

মিথ্যে ? ভয় হলো জার্মানির গোয়েন্দা বিভাগের। সোভিয়েতের এতো জাহাজ এলো কোথা থেকে ?

আসলে, বিদেশী নৌ-বাহিনীর পুরনো তথ্যচিত্র থেকে কিছু দৃশ্য কেটে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে। তাই 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে যে বিশাল নৌ-বাহিনী, সেটা কিন্তু ১৯২৫ সালের সোভিয়েত রাশিয়ার নিজস্ব দৃশ্য নয়।

কিন্তু রাশিয়ার মানুষের স্মৃতিতে তখনো তাজা রয়েছে পোতেমকিন জাহাজের মতো নৌ-বাহিনীর স্মৃতি। তাই তারা সানন্দে গর্বের সাথে 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে ঝালিয়ে নিয়েছে পুরনো দিনের নৌ-বাহিনীর স্মৃতি।

১৯৪৫ সালে, জীবনের শেষপ্রান্তে আইজেনস্টাইন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 'পোতেনকিন' চলচ্চিত্রের অনামী অজ্ঞাত স্রষ্টাকে।

তাঁরা হলেন রাশিয়ার জনগণ। তা হলো রাশিয়ার বিপ্লবী অতীত। তা হলো সমস্ত শিল্পী কলাকুশলীর অদম্য উৎসাহ আর মহৎ সৃষ্টিশীল প্রেরণা।

তাই আইজেনস্টাইন আহ্বান জানিয়েছেন রাশিয়ার স্রষ্টাদের—ধন্যবাদ জানাতে সেই সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণার উৎস এবং সত্যিকারের স্রষ্টাদের।

'অক্টোবর' চলচ্চিত্রের কিছু কথা

সাংবাদিক জন রিডের (John Reed) একটি গ্রন্থ ছিলো 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' (Ten Days that Shook the World)।

আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' চলচ্চিত্র বিদেশে পরিচিত 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' চলচ্চিত্র হিসাবে। মোটামুটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে জন রিডের গ্রন্থ এবং আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র দুটি এক হলেও, উভয়ের মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই।

সম্ভবত কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রের নামটি পরিবর্তিত হয়।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্র যেমন মহাকাব্যের ঢঙে তৈরি হয়েছে, তেমনি 'অক্টোবর' চলচ্চিত্র রাশিয়ার জনগণের মহাকাব্য।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে তৈরি 'অক্টোবর' চলচ্চিত্র। যখন সাময়িক সরকার গঠিত, হয়েছিলো, তখনকার এবং তার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার জনসাধারণের সংগ্রামী ঘটনাবলীর এটা এক ঐতিহাসিক কাহিনী।

কিভাবে কেরেন্স্কি (Kerensky) চলে গেলো, কিভাবে শীতের প্রাসাদ আক্রান্ত হলো, আর তার সাথে সাথে লেনিনের জয়লাভ, এই চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু।

একটা যুদ্ধজাহাজের বিদ্রোহকে যেমন চলচ্চিত্রের অসাধারণ টেকনিকে উপস্থাপিত করে 'পোতেমকিন' সৃষ্টি হয়েছিলো, 'অক্টোবর' চলচ্চিত্র তেমনি অনেক টুকরো টুকরো শিল্প উপকরণের সমন্বয়।

বিশাল দৈত্যের মতো যে মূর্তি রাস্তা পাহারা দিচ্ছে, শীতের প্রাসাদের বিরাট স্থাপত্য, নদীর ওপর ভেসে যাওয়া লিফ্‌লেট্‌, মানুষের ভীড়ে উত্তোলিত ব্যানার, রক্ষীবাহিনীর হাতে রাইফেল—এ সবই 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রের অসাধারণ শিল্প উপকরণ।

আইজেনস্টাইন তাঁর চলচ্চিত্রে দৃশ্যগুলির গতিময়তাকে ব্যবহার করেন। তাই 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রে দেখা যায়, যখন সময়কে উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

শীতের প্রাসাদে চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ করার সময় আইজেনস্টাইনের চোখে পড়ে একটি ঘড়ির আশ্চর্য অংশ। তার মূল ডায়ালটির পরিধি ধরে ছোটো ছোটো ডায়াল সাজানো আছে। আর এই ছোটো ডায়ালগুলোতে, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, সাংহাই ইত্যাদি শহরের নাম লেখা আছে। যখন মূল বড়ো ঘড়িটি রাশিয়ার পেত্রোগ্রাদ্‌ শহরের সময় দেখায়, তখন ছোটো ডায়ালগুলিতে দেখা যায় অন্যান্য শহরের সময়।

এই আশ্চর্য ঘড়িটি আইজেনস্টাইনের স্মৃতিতে থেকে যায়। যখন সাময়িক সরকারের পতনের মুহূর্ত ঘড়ির কাঁটায় দেখানোর প্রয়োজন ছিলো, তখন, পেত্রোগ্রাদের সময়ের সাথে সাথে সেই মুহূর্তটিতে দেখা যায় অন্যান্য শহরের সময়। এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, মানুষের এক ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে জয়ের মুহূর্ত হিসাবে দেখানোর সময় পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষের সাথেও যেন একাত্ম করে দেখানো হলো।

১৯২৮ সালে নভেম্বরে 'দ্য ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকায় 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রের দুটি দৃশ্য প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে নিজের তাত্ত্বিক রচনাবলীতেও 'অক্টোবর' চলচ্চিত্র স্থান পেতে শুরু করে আইজেনস্টাইনের হাতে।

'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রে যেমন কসাইয়ের ছুরির সাথে অসহায় মানুষদের মৃত্যুর বিভীষিকা দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রে রয়েছে মেশিনগানের গুলি চালনার দৃশ্য। কিন্তু অন্যভাবে। মেশিনগান থেকে গুলি ছুটে আসার ভয়াবহতা আইজেনস্টাইন দেখিয়েছেন, একটি উজ্জ্বল আলোয় মেশিনগান চালানোর কাজে ব্যস্ত সৈনিকদের ক্লোজ-আপের সঙ্গে, মেশিনগানের সাথে গুলি বেরিয়ে আসার দৃশ্য।

জেনারেল কর্নিলভের (Kornilov) সামরিক উদ্দেশ্য, আইজেনস্টাইন 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রে দেখিয়েছেন এক অদ্ভুত বারোক যীশুর মূর্তির সাথে, ডিম্বাকৃতি উজুমের (Uzume) মুখোশ এবং দেবী মার্থের (Mirth) মূর্তির সাথে ইণ্টার কাট্‌ করে।

যেমন সোভিয়েতের কংগ্রেসের সাথে মোটর সাইকেল-বাহিনীর মিলনের দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, ঘূরন্ত এক চাকার সাথে নতুন প্রতিনিধিদের প্রবেশের দৃশ্য। 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রে ঘটনাবলী তাই নিছক তথ্যচিত্রের আকারে একের পর এক বিবৃত হয়নি। নানা মন্তাজের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্রটি।

এখানেও বেশির ভাগ লেনিনগ্রাদের সাধারণ মানুষ অভিনয় করেছেন।

যদিও চলচ্চিত্রটি ছিলো নির্বাক, তবুও এর সঙ্গীতের সুর রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এডমাণ্ড মাইজেল (Edmund Meisel)।

তখনকার দিনে নির্বাক চলচ্চিত্রেও প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীত শিল্পীদের দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করা হতো। আর এটা এমন সাধারণ ব্যাপার ছিলো না যে, একটা জনপ্রিয় সুর চলচ্চিত্রের সাথে খাপ খাইয়ে পরিবেশন করা হতো। বরঞ্চ অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সুর রচনা করা হতো এবং চলচ্চিত্রের সাথে সেটা পরিবেশন করা হতো।

এডমাণ্ড মাইজেল আইজেনস্টাইনের 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রেও সুর সৃষ্টি করেছিলেন।

ঠিক এই সময়কালে, আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের ভাবনাচিন্তার মধ্যে সবাক চলচ্চিত্রের ভূমিকা এসে পড়ে।

সবাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিবৃতি

১৯২৮ সালে, সবাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে, পুদভকিন ও আলেকজান্দ্রভের যৌথ বিবৃতি নানা পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়। সময়ের দিক থেকে 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রের মুক্তির পরে এই সবাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে যৌথ বিবৃতি সবার সমক্ষে হাজির হয় ১৯২৮ সালের ৫ অগাস্টে।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন এস. এম. আইজেনস্টাইন, ভি. আই. পুদভকিন এবং জি. ভি. আলেকজান্দ্রভ।

আমরা এই বিবৃতির কিছু কিছু অংশ, শুধুমাত্র কিছু অংশ, বাংলায় ভাবানুবাদ করে আলোচনা করতে পারি।

"সবাক চলচ্চিত্রের স্বপ্ন সত্য হলো। বাস্তব সবাক চলচ্চিত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে, আমেরিকানরা এর ব্যবহার করতে দ্রুত এবং কার্যকরী প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সমস্ত পৃথিবী এখন সেই নির্বাক বস্তুর সম্পর্কে কথা বলছে, যেটা নিজে এখন কথা বলতে শিখেছে।

"আমরা যারা সোভিয়েত রাশিয়ায় কাজ করি তারা এ কথা জানি যে, অদূর ভবিষ্যতে সবাক চলচ্চিত্রের বাস্তব রূপায়নে আমরা আমাদের টেকনিক্যাল দক্ষতা

নিয়ে এগিয়ে যেতে পারব না। সেই সাথে তাত্ত্বিক ধরণের কিছু প্রধান প্রাথমিক ধারণা জানানোর সুযোগ বলে এটাকে মনে করি, কারণ এই আবিষ্কারের সাথে সাথে মনে হচ্ছে যে, চলচ্চিত্রের অগ্রগতিতে এটি ভুল দিকে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যে, এই নতুন টেকনিক্যাল আবিষ্কারের কার্যকারিতা সম্পর্কে ভুল ধারণা শিল্পকলা হিসাবে চলচ্চিত্রে বিশুদ্ধতায় ও বিকাশে শুধুমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, এর বর্তমান প্রথাগত সমস্ত সুফলকে ধ্বংস করার হুমকি দিচ্ছে।

"বর্তমানে চলচ্চিত্র, দৃশ্যাবলীর ব্যবহারে, যে কোনো মানুষের ওপর শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া ঘটায় যথাযথভাবেই শিল্পকলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।

"এটা জানা আছে যে, চলচ্চিত্রকে এমন শক্তিশালী কার্যকারিতা এনে দিয়েছে মন্তাজ্ নামক প্রাথমিক (এবং একমাত্র) হাতিয়ার।

"প্রতিক্রিয়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে মন্তাজের নিশ্চয়তা, এমন একটা বিতর্কাতীত স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছে, যার ওপর বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্রের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।

"বিশ্বের দরবারে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের সফলতা যথেষ্ট পরিমাণে মন্তাজের সেই পদ্ধতিগুলোর ওপর নির্ভরশীল, যেগুলো সে প্রথম প্রকাশ করেছিলো এবং সংহত করেছিলো।

"কাজেই, চলচ্চিত্রের আরোও বিকাশের জন্যে, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হবে সেগুলোই, যা দর্শককে প্রভাবিত করার মন্তাজ পদ্ধতিকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করবে। প্রত্যেকটি নতুন আবিষ্কারকে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরীক্ষা করলে, সবাক চলচ্চিত্রের বিশাল তাৎপর্যের সাথে তুলনা করলে, রঙিন এবং স্টিরিওস্কোপিক (Stereoscopic) চলচ্চিত্র যে কত নগণ্য, তা খুব সহজেই দেখা যায়।

"সাউন্ড-রেকর্ডিং একটা দুমুখো আবিষ্কার, আর এটাই সম্ভব যে এটার ব্যবহার সব থেকে কম বাধার পথে এগোবে, অর্থাৎ সাধারণ কৌতূহল মেটানোর পথেই এগোবে।

"প্রথমেই হবে সব থেকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের, সবাক চলচ্চিত্রের, বাণিজ্যিক ব্যবহার। সেখানে একটা স্বাভাবিক স্তরে সাউন্ড-রেকর্ডিং এগিয়ে যাবে, পর্দায় নড়াচড়ার সাথে সাথে খাপ খাইয়ে এবং সবাক মানুষ, সশব্দ বস্তু ইত্যাদি কিছু "যাদু" পরিবেশন করবে।

"চাঞ্চল্যের প্রথম যুগ নতুন শিল্পকলার বিকাশকে আহত করবে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যুগটা ভয়াবহ। এই দ্বিতীয় যুগটাই নতুন টেকনিক্যাল সম্ভাব্যতার প্রথম অনুভূতির ম্রিয়মান বিশুদ্ধতা এবং কৌমার্যের স্থান গ্রহণ করবে এবং এর "উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন নাটক" তার নাটকীয় বস্তুর অভিনয়ে গৃহীত অন্যান্য ছবির এক যুগকে প্রতিষ্ঠা করবে।

"এভাবে শব্দকে ব্যবহার মন্তাজের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবে, কারণ মন্তাজের দৃশ্যের প্রত্যেকটা টুকরোর সাথে শব্দের প্রত্যেকটার মিলন, মন্তাজের খণ্ডাংশটির গতিময়তা বাড়িয়ে দেবে এবং এর অর্থের স্বাধীনতাও বাড়িয়ে দেবে এবং এটা হবে মন্তাজের নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক, প্রথমত ক্রিয়া করবে খণ্ডাংশগুলির মিশ্রণের ওপর, কিন্তু মন্তাজের খণ্ডাংশগুলির ওপর নয়।"

আইজেনস্টাইনদের উপরের বক্তব্যের পরবর্তী ব্যাখ্যা, মূলত উপরের আশংকার থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে বেড়ানো।

তাঁদের খানিকটা আশংকা অনুযায়ীও, সোভিয়েত রাশিয়ায় সবাক চলচ্চিত্রে টেকনিক্যাল বিকাশ খানিকটা মন্থর গতিতেই হয়েছে।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেনিনগ্রাদে প্রথম শোরিন্ (Shorin) শব্দ রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা পরীক্ষা করা হয় এবং ১৯২৭ সালের মার্চে পরীক্ষার ফলাফল দেখানো হয়।

১৯২৯ সালের জুলাইয়ে মস্কোতে তাগের (Tager) শব্দ রেকর্ডিং ব্যবস্থা শুরু করা হয়। ওই ১৯২৯ সালের অগাস্ট মাসে সোভকিনোর লেনিনগ্রাদ স্টুডিওতে প্রথম সবাক প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করে, সেখানে সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রের শব্দ-ধারণের প্রথম নমুনা দেখানো হতো।

আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতিতে তখনো সবাক চলচ্চিত্র বড়ো কোনো জায়গা করে নিতে পারেনি। 'ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই নতুন পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেলো। এই চলচ্চিত্রটির মুক্তিলাভের সাথে সাথে, আইজেনস্টাইন, আলেকজান্দ্রভ এবং টিসে সবাক চলচ্চিত্রের ওপর অধ্যয়ন করতে বিদেশে পাড়ি দেন।

কিন্তু সবাক চলচ্চিত্রের বিষয়ে অপর যে স্বাক্ষরকারী রীতিমত চিন্তাশীল ছিলেন, তিনি হলেন রাশিয়ার অন্যতম চলচ্চিত্রকার পুদভ্‌কিন্। আর পুদভ্‌কিনের প্রসঙ্গ কিছুটা না বলে নিলে, রাশিয়ার চলচ্চিত্রে এখনকার গর্বিত শিল্পকলার কথা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

সমসাময়িক পুদভ্‌কিন

বয়সে আইজেনস্টাইনের থেকে পাঁচ বছরের বড়ো, ভ্‌সেভলদ্ ইলারিওনোভিচ্ পুদভ্‌কিন্ (Vsevolod Illarionovitch Pudovkin) জন্মেছিলেন ১৮৯৩ সালে। একদিক থেকে বলতে গেলে সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন চলচ্চিত্র শিল্পকলার প্রথম প্রজন্মের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ।

হয়তো একক কোনো পরিচালকের, অথবা কোনো প্রজন্মের সর্বময় ঝোড়ো

উপস্থিতিতে, পুদভ্‌কিনের নাম প্রথাগত আলোচনার টানাপোড়েনে অনেকটাই পর্দার অন্তরালে চলে গেছে। কিন্তু আইজেনস্টাইনের পাশাপাশি, চলচ্চিত্রের কাহিনীতে ব্যক্তিচরিত্রের ভূমিকার অসামান্য চিত্ররূপ যেমন পুদভ্‌কিন্‌ রেখে গেছেন, ঠিক তেমনি রয়ে গেছে তাঁর চলচ্চিত্র সম্পর্কে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা।

মস্কোর পদার্থবিদ্যা ও গণিত বিভাগে পুদভ্‌কিনের পড়াশুনা। সীমান্তে ১৯১৪-১৯১৫ সালে যুদ্ধের কারণে কাজ।

একসময়ে তিনি বন্দী হয়েছিলেন এবং পালিয়েও এসেছিলেন। মস্কোয় এসেছিলেন ১৯১৮ সালে। পরের বছরই মস্কোর সরকারি চলচ্চিত্রের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে (VGIK) যোগদান করেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'সিকল্‌ অ্যাণ্ড হ্যামার' (Sickle and Hammer)। এর পরিচালক ছিলেন গার্দিন (Gardin)। এই চলচ্চিত্রটিতে সহপরিচালক এবং অভিনেতা ছিলেন পুদভ্‌কিন্‌।

কুলেশভের স্টুডিওতে তিনি কাজ করেছিলেন কয়েকটি চলচ্চিত্রে।

১৯২৫ সালে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'চেস্‌ ফিভার' (Chess Fever) তিনি পরিচালনা করেন এবং ওই বছরই বিজ্ঞানী পাভ্‌লভের (Pavlov) পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তথ্যচিত্র তৈরি করেন, 'মেকানিজ্‌ম্‌ অব্‌ দ্য ব্রেইন্‌' (Mechanism of the Brain)।

এর পরের বছরই তাঁর অসামান্য সৃষ্টি ম্যাক্সিম গোর্কি'র 'মা' চলচ্চিত্র মুক্তি পায়।

ম্যাক্সিম গোর্কি (Maxim Gorky) যে 'মা' (Mother) উপন্যাসটি লেখেন, সেটি বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু পুদভ্‌কিনের 'মা' চলচ্চিত্র দেখলে প্রথমেই খটকা লাগে, গোর্কি'র লেখা কাহিনীর সঙ্গে মেলে না। এটা ঠিক চলচ্চিত্রের কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য ঘটেনি। যাঁদের মনে কখনো গভীর গবেষণামূলক কৌতূহল জেগেছে, তাঁরা দেখতে পাবেন, পুদভ্‌কিনের 'মা' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য খানিকটা অন্যরকম কাহিনীকে হাজির করেছে।

আইজেনস্টাইনের 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্র যেমন অভিনেতা হিসেবে রাশিয়ার ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণকে তুলে ধরেছে, অন্যদিকে পুদভ্‌কিন্‌ তাঁর 'মা' চলচ্চিত্রে রাশিয়ার জনগণের বিপুল অংশকে চিত্রায়িত করেছেন কয়েকজন ব্যক্তির কাহিনীর মাধ্যমে। গোর্কি'র উপন্যাস থেকে পুদভ্‌কিনের 'মা' চলচ্চিত্রের কাহিনীর প্রধান তফাৎ হলো, চলচ্চিত্রে সত্য কাহিনী বলার ইচ্ছার মধ্যে।

গোর্কি'র 'মা' উপন্যাস একটি সত্য ঘটনার পটভূমিতে লেখা, কিন্তু কাহিনীর শ্রমিক বিদ্রোহটি যে বাস্তবে ব্যর্থ হয়েছিলো, তা কিন্তু গোর্কি'র উপন্যাসে ছিলো না। এই সত্য, ব্যর্থতার ঘটনা ছিলো পুদভ্‌কিনের 'মা' চলচ্চিত্রে।

১৯০৫ সালের সময়কালে ঘটা এই ব্যর্থ শ্রমিক বিদ্রোহকে পুদভ্কিন সফলতা হিসাবে দেখাতে চাননি। আবার ১৯০৫ সালের 'পোতেমকিন' যুদ্ধজাহাজের বাস্তব বিদ্রোহের ব্যর্থতাকে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রে দেখাতে চাননি। তাই সেদিক থেকে, চলচ্চিত্রে কাহিনীর সততার ক্ষেত্রে, পুদভ্কিন ও আইজেনস্টাইন একেবারে বিপরীতধর্মী।

মূলত কুলেশভের কর্মশালার অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই 'মা' চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করেছিলো। এবং একজন বিপ্লবী ছাত্রীর ভূমিকায়, নায়ক পাভেলের বান্ধবীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আনা জেম্ৎসোভা (Anna Zemtsova), পুদভ্কিনের স্ত্রী। আর, এক নিষ্ঠুর পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্বয়ং পুদভ্কিন।

রাশিয়াতে 'মা' চলচ্চিত্র প্রথম দেখানো হয় ১৯২৬ সালের ১১ অক্টোবর।

এই 'মা' চলচ্চিত্রের সময় পুদভ্কিন 'ফিল্মটেকনিক' বিষয়ে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

পরে একসময় পুদভ্কিন বর্ণনা করেন যে, নির্মম পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় তিনি চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন পুলিশী ব্যবস্থার একটা যথার্থ চিত্র।

ইংলণ্ডে পুদভ্কিনের 'মা' চলচ্চিত্র প্রথমে ছাড়পত্র পায় না। তাই ১৯২৮ সালে ফিল্ম সোসাইটিতে এটা দেখানো হয়।

তারপরে দুটি মহৎ চলচ্চিত্র, 'দ্য এণ্ড অফ সেণ্ট পিটার্সবুর্গ' (The End of St. Petersburg) এবং 'স্টর্ম ওভার এশিয়া' (Storm over Asia), পুদভ্কিনকে আরো প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। চলচ্চিত্র দুটি তৈরি হয় যথাক্রমে ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালে।

এরপরই পুদভ্কিনের 'এ সিম্পল্ কেস' (A Simple Case) চলচ্চিত্র তৈরি হয় ১৯৩০ সালে। কিন্তু, এই চলচ্চিত্রটি দেখে অনেকেই পুদভ্কিনের যোগ্যতার তুলনায় নিরাশ হয়েছিলেন।

আইজেনস্টাইন ও আলেকজান্দ্রভের সাথে যৌথভাবে যখন পুদভ্কিন সবাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার বেশ কয়েক বছর পরে তাঁর নিজের হাতে এই সবাক চলচ্চিত্রে সাহসী পরীক্ষানিরীক্ষার দৃষ্টান্ত 'ডেজার্টার' (Deserter) চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র একদিকে যেমন পুদভ্কিনের হাতে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র, তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহসিকতায় তিনি রাশিয়াকে এক মূল্যবান সৃষ্টি উপহার দিয়েছেন। বিশেষত কারণ, আইজেনস্টাইন সেই সময়ে বিদেশের নানা জায়গায় অসংখ্য ব্যর্থ প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত। এবং যখন আইজেনস্টাইন মাতৃভূমি রাশিয়ায় ফিরে এসেছেন, তখনো তাঁর পরবর্তী সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র 'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' মুক্তি পেতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে।

এর পর পুদভ্‌কিন আরো অনেকগুলো চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। কখনো একা, কখনো অন্য চলচ্চিত্রকারের সাথে।

পরের পর পুদভ্‌কিন তৈরি করেছেন—'ভিক্‌টরি' (১৯৩৮), 'মিনিন্‌ অ্যান্ড পদ্‌জারস্কি' (১৯৩৯), 'সুভরভ্‌' (১৯৪০), 'টোয়েন্টি ইয়ারস অব সিনেমা' (১৯৪০, এস্‌থার শুবের সাথে), 'দ্য ফিস্ট অ্যাট্‌ জিমুর্‌ন্‌কা', 'দ্য মার্ডারার্স আর অন দ্য রোড' (১৯৪২, মুক্তি পায়নি), 'ইন দ্য নেম অফ দ্য ফাদারল্যান্ড' (১৯৪৩, দ্‌মিত্রি ভাসিলিয়েভের সাথে), 'অ্যাডমিরাল নাখিমভ' (১৯৪৬), 'থ্রি মিটিংস' (১৯৪৮, একটি পর্ব), 'ঝুকভ্‌স্কি' (১৯৫০, দ্‌মিত্রি ভাসিলি-য়েভের সাথে), 'দ্য রিটার্ন অফ ভাসিলি বর্ৎনিকভ' (১৯৫৩)।

১৯৫৩ সালের ৩০ জুন পুদভ্‌কিনের মৃত্যু হয়।

পুদভ্‌কিনের অনেক লেখার সংকলন গ্রন্থ 'ফিল্ম টেক্‌নিক অ্যান্ড ফিল্ম অ্যাকটিং' (Film Technique and Film Acting)। এই সংকলন সেই সময়ের রাশিয়ার চলচ্চিত্রের অসাধারণ তাত্ত্বিক আলোচনার চমৎকার দৃষ্টান্ত। সম্পাদনার ব্যাপারে পুদভ্‌কিনের সাথে আইজেনস্টাইনের অমিলগুলো চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর চিন্তার গভীরতা একই সাথে স্পর্শ করে আমাদের।

১৯১০ সালে পুদভ্‌কিন যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর কক্ষপথের কাছে চলে আসার কথা। সত্য-মিথ্যামিশ্রিত গুজবে আতঙ্কিত মস্কোর মানুষ। আগামীকাল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, ধূমকেতু আছড়ে পড়বে পৃথিবীর গায়ে। ছোটো ছেলে পুদভ্‌কিন তখন একই কৌতূহলের অংশীদার, কেন না আগামীকাল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। পরে বড়ো হয়ে, সেদিনের সেই অনুভূতি পুদভ্‌কিন না বোঝাতে পারলেও, তাঁর সেই অদেখা অজানা নতুন জিনিসের প্রতি কৌতূহল, ঠিক যেন ছেলেবেলার মতোই ক্রিয়াশীল। আর এই কৌতূহল একদিন পুদভ্‌কিনকে বিজ্ঞান শেখার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো।

আবার বুকের ভেতর যে স্বপ্নগুলো পুদভ্‌কিন বহন করতেন, সেগুলোকে প্রকাশ করার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা পুদভ্‌কিনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো শিল্পকলার দিকে। যখন তিনি প্রথম চলচ্চিত্রের স্বাদ পেয়েছিলেন, তখনই তাঁর কল্পনার জগতে এটা নাড়া দিয়েছিলো। অন্য কোনো শিল্পকলার সাথে এটার কোনো তুলনা হয় না। পুদভকিনের এই আকর্ষণ বোধহয় একটা সহজাত প্রবৃত্তি। যেমন অকস্মাৎ, তেমনি শক্তিশালী।

একসময় কেমিস্ট হিসেবে পুদভ্‌কিন্‌ কাজ করতেন একটি ফ্যাক্টরিতে। সেটা ছেড়ে দিয়ে তরুণ পুদভ্‌কিন্‌ কুলেশভের কাছে ছাত্র হিসেবে চলচ্চিত্র শিখতে এলেন। কুলেশভ্‌কে তখন নতুন্‌ সোভিয়েত সিনেমার গোড়াপত্তনের পথিকৃৎ হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন পুদভ্‌কিন্‌।

তখন সদ্য সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জন্ম নিচ্ছে ও প্রসারিত হচ্ছে তার নিজের চলচ্চিত্র। এই সমাজতন্ত্র গড়তে গিয়ে শত সহস্র মেহনতি মানুষ লড়াই করেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সেই বীরত্বের প্রতিচ্ছবি প্রায় প্রত্যেকটি নতুন চলচ্চিত্রে। প্রত্যেকটি চলচ্চিত্রে স্বতন্ত্র চলচ্চিত্রকার আছেন। কিন্তু তখনকার সমস্ত চলচ্চিত্রেই মানুষের সেই সংগ্রামের নির্যাসটুকু প্রতিফলিত।

আইজেনস্টাইনের 'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্র সম্পর্কে পুদভ্কিন বলেছেন যে, বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর গড়ে তোলা প্রত্যেকটি মহৎ ও নতুন জিনিসের জীবন্ত অস্তিত্বে এসময় সমস্ত প্রাক্-বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা প্রভাবিত ছিলো। শিল্পকলায়, যে মানুষদের হাতে শিল্পকলার সাথে সর্বহারার কাজের মিলন ঘটছিলো, তাদের ধ্যানধারণার সাথে তখন অতীতের ধারার নির্মম লড়াই চলছিলো। সেই নতুন ধ্যানধারণা তখনো পরিপক্ক হয়নি। আর আইজেনস্টাইন এমনি একটা সময়েই ১৯০৫ সালের বিপ্লবী সংগ্রামের বিশালতাকে 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন।

পুদভ্কিন বলেছেন যে—অনিবার্যভাবে এটাই ঘটতো, প্রত্যেকটি জিনিস আইজেনস্টাইনকে সাহায্য করেছে। আইজেনস্টাইনের নিজের বিরাট প্রতিভা, তাঁর যোগ্যতার তাজা জীবন্ত চরিত্র, একজোট হয়ে প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্রে তাঁর কমরেডদের পরম উৎসাহ এবং সর্বোপরি, পুদভ্কিন্ পুনরায় বলছেন, সৃষ্টির উত্তেজনার এই সাধারণ পরিবেশ কখনো যা প্রকাশিত হয়নি কিন্তু বিস্ফোরিত হওয়ার জন্যে বেঁচে ছিলো, বিস্ফোরিত হতে চাইছিলো।

পুদভ্কিনের ভাষায়—এবং বিস্ফোরণ ঘটলো বজ্র আর বিদ্যুতে মিশে। বিদ্যুতের এক লহমায় রাশিয়ার নিজের দেশের দর্শককে বজ্রাঘাতে অভিভূত করে দিলো। ইউরোপ ছাড়িয়ে পেঁছলো আমেরিকায়, আর রাশিয়ায় ফিরে এলো অজস্র প্রশংসার প্রতিধ্বনি নিয়ে।

পুদভ্কিনের ভাবনাচিন্তায়—যখন একজন শিল্পী তাঁর বিবেকের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারেন তাঁর নিজের জনগণের সাধারণ আবেগকে, অন্তত আংশিকভাবে, তাঁরই গৌরব তাঁরই সম্মান। এরকম একজন স্রষ্টা সত্যিকারের শৈল্পিক সফলতার যথার্থ গর্ব করতে পারেন।

পুদভ্কিনের তৈরি সবাক চলচ্চিত্রগুলি তাঁর নির্বাক চলচ্চিত্রগুলিকে শিল্পশৈলীতে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর বিস্তৃত চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে পুদভ্কিন্ সেই সত্যিকারের স্রষ্টার ভূমিকাতেই অবতীর্ণ। কখনো কাহিনী, কখনো তথ্য—চলচ্চিত্রের এই দুটি উপকরণকেই সমানভাবে কাজে লাগিয়েছেন পুদভ্কিন্। রাশিয়ার মানুষের সংগ্রামের অতীত থেকে বর্তমানে তাঁর অবাধ বিচরণ।

সেদিক থেকে আইজেনস্টাইন 'ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' চলচ্চিত্রে যেমন ভাষার ঈষৎ পরিবর্তন করেছেন, তেমনি এই চলচ্চিত্রের পর সমসাময়িক রাশিয়ার জীবনের ছবি, আইজেনস্টাইনের পরবর্তী কাজে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়নি।
তবুও অকুণ্ঠচিত্তে পুদভ্কিন যে আইজেনস্টাইনের 'পোতেম্কিন্' চলচ্চিত্র নির্মাণে বিস্ফোরক পরিবেশের কথা বলেন—আইজেনস্টাইন সেই পরিবেশকে সার্থক স্রষ্টার মতো ব্যবহার করেছেন।

'ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' ঈষৎ নতুন ভাষা

রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থার মধ্যে তখন এক বিরাট পরিবর্তন। পুরনো খামারগুলোকে বদলে, নতুন কৃষিব্যবস্থা রাশিয়া গড়ে তুলছে। এ সবকিছুরই চলচ্চিত্র তৈরি করার প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন আইজেনস্টাইন। তখন কথা ছিলো এই চলচ্চিত্রটির নাম হবে 'দ্য জেনারল্ লাইন'।
কিন্তু পরিত্যক্ত হয়েছিলো এই প্রকল্পের প্রাথমিক পদক্ষেপ। অবশেষে ১৯২৯ সালে আবার নতুন করে তৈরি হয়েছিলো, রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থার ওপরে চলচ্চিত্র 'ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' (Old and New)।
চিরকাল বিশাল জনস্রোত এবং জনগণের যৌথ উপস্থিতিতে বিশ্বাসী আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের ভাষায়, এবার যেন একটা নতুন মাত্রা দেখা গেলো। জনগণের যৌথ উপস্থিতি থাকলেও, এই প্রথম বিশেষ করে কয়েকটি স্বতন্ত্র চরিত্রের প্রাধান্য দেখা গেলো এই চলচ্চিত্রে।
সোভিয়েত রাশিয়ার বিশাল বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র, আর তার লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত কৃষকদের বিরাট পটভূমি চোখে পড়ে আইজেনস্টাইনের 'ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' চলচ্চিত্রে। তাঁর 'স্ট্রাইক্' চলচ্চিত্রের কারখানা নয়, 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের একটি যুদ্ধজাহাজ নয়—রাশিয়ার অসংখ্য কৃষকের সাথে এবার দৃশ্য হলো, বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রকৃতি, বাতাস, ঝড়, মেঘের দল।
প্রকৃতির এই অসাধারণ বিস্তার এবং সৌন্দর্যকে আইজেনস্টাইন যেমন অসাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন শিল্পশৈলীর দিক থেকে, তেমনি এই চলচ্চিত্রে সামাজিক, রাজনীতিক উদ্দেশ্যকে সফলতার সাথে মিশ্রিত করেছেন।
অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ কৃষকের চাষ করার আদিম পদ্ধতির পরিবর্তে, যন্ত্রপাতির আধুনিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করার আবেদনই ছিলো এ চলচ্চিত্রের রাজনীতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য। তাই চলচ্চিত্রের সবটুকুই নিবেদিত কৃষক সম্প্রদায়ের শিক্ষায়।
কিন্তু সেই আবেদনটুকুকে চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত করতে, আইজেনস্টাইন এবার

একটি কৃষক মেয়ের চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কৃষক মেয়ে লাপ্‌কিনা (Lapkina), আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে একটা সূক্ষ্ম স্বতন্ত্র চরিত্রের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিলো।

এই চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইন যে আশ্চর্য মন্তাজের দৃষ্টান্ত রাখেন, সেটা তিনি নিজেই তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনায় লিখে গেছেন। এক বিশেষ মন্তাজ যেন এক অদ্ভুত সুন্দর সুর সৃষ্টি করছে, এক একটি পংক্তির সুরে মালা গেঁথে! 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' চলচ্চিত্রে একটি মিছিলের দৃশ্যে এমনটি দেখা যায়ঃ

শটের পরে শট যেন দৃশ্যাবলীর উত্তাপ বাড়িয়ে চলেছে।

বারবার বদলে যাওয়া ক্লোজ-আপগুলো, একটা নমনীয় কিন্তু জোরালো প্রতিক্রিয়া রাখে। ক্লোজ-আপের নাটকীয় অন্তর্বস্তু দিয়ে চলচ্চিত্রে একটা স্বপ্নিল আবহ তৈরি হয়।

মহিলা-গায়কদের মুখ দেখা যায়।

পুরুষ-গায়কদের মুখ দেখা যায়।

ব্যানার, আইকন, আর ক্রুশ বহনকারীদের আরো স্পষ্ট করে তোলে, যে সব মানুষগুলো হাঁটু গেড়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলো ওই মিছিলকে দেখে।

খোলা আকাশের পটভূমিতে উঁচু হয়ে থাকা ক্রুশ আর ব্যানারের থেকে ক্যামেরা ঘুরে আসে সেই গীর্জার পটভূমিতে, যেখান থেকে মিছিল শুরু হয়েছিলো। ঠিক এমনি একটা মন্তাজেই হয়তো সব থেকে সুন্দরভাবে প্রযোজ্য হতো সবাক চলচ্চিত্রের টেক্‌নিক। 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার পরে, এই বিচিত্র সুরের মন্তাজ এবং সবাক চলচ্চিত্রের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আইজেনস্টাইন ১৯২৯ সালে মস্কোর 'কিশে' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন সবাক চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ চতুর্থ মাত্রা সম্পর্কে।

আইজেনস্টাইন তখনো রঙিন চলচ্চিত্র তৈরি করেননি। কিন্তু শুধু সাদা আর কালো রঙ দিয়ে কি কোনো বক্তব্যকে বোঝানো যায়? সে কথাও এসে পড়েছে 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে।

যা প্রতিক্রিয়াশীল, অপরাধী এবং পুরনো, তাকেই 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে কালো রঙে। আর এই চলচ্চিত্রে সুখ, জীবন আর নতুন পরিচালনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করেছে সাদা রঙ।

এরপর আইজেনস্টাইনের জীবন কেটেছে স্বদেশ রাশিয়ার বাইরে। রাশিয়ার গৌরবময় বিপ্লব আর পুনর্গঠনের চলচ্চিত্র তৈরির বদলে আইজেনস্টাইনের জীবনে এসেছে, অনিশ্চিত বিদেশে অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাগুলো।

অসম্পূর্ণ 'কিউ ভিভা মেক্সিকো'

আইজেনস্টাইনের মৃত্যুর পরে, আজ আমরা যে 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রটি দেখি, তার সাথে সত্যি আইজেনস্টাইনের নিজের পরিকল্পনার ষোলো আনা মিল আছে কি না, আমরা জানি না। এমন কি আজ আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি না 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' চলচ্চিত্রের মতো মেক্সিকোর চলচ্চিত্র, আইজেনস্টাইন একেবারেই আগাগোড়া বদলে ফেলতেন কি না!

মেক্সিকোর অ্যাজটেক্ (Aztec) সভ্যতার সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এক বিশাল বিস্তৃত ইতিহাসের মহাকাব্য তৈরি করতে গিয়েছিলেন আইজেনস্টাইন।

'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য আইজেনস্টাইন রেখে যাননি। তাই কোনো অর্থেই আজ প্রকাশিত 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রকে আইজেনস্টাইনের নিজের কাজ বলে কিছুতেই চিহ্নিত করা যাবে না। বরঞ্চ আইজেনস্টাইনের নিজস্ব সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটিকে একবার দেখা যেতে পারে, সেই চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত মহাকাব্যের আভাস হিসাবে।

'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রটি শুরু করার আগে, আইজেনস্টাইন একটি রূপরেখার খসড়া গড়ে পাঠিয়েছিলেন প্রযোজক আপটন সিনক্লেয়ারকে। আজও এই খসড়া হলো প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের প্রথম পরিকল্পনা। পরে ১৯৩৪ সালে 'এক্সপেরিমেন্টাল সিনেমা' পত্রিকায় আলেকজান্দ্রভের সাথে যৌথভাবে এই চলচ্চিত্রের সারাংশ প্রকাশিত হয়।

'সেরাপে' কাকে বলে জানেন? এটা হলো একটা দাগ কাটা কম্বলের মতো, যা সমস্ত মেক্সিকানরা গায়ে দেয়। এই 'সেরাপে' মেক্সিকোর প্রতীক হতে পারে। শত শত বছর ধরে মেক্সিকোর সংস্কৃতিতে যেন এই দাগ কাটার মতো পরস্পর-বিরোধী, কখনো সহিংস ঘটনার উপস্থিতি।

এই রঙিন প্রতীকের রঙগুলো নিয়ে তৈরি করার পরিকল্পনা ছিলো আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র, ছয়টি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলো আসার কথা ছিলো একের পর এক—বিভিন্ন চরিত্রে, বিভিন্ন মানুষের, বিভিন্ন জীবজন্তু, গাছপালা আর ফুলের ছবি নিয়ে।

কিন্তু এগুলো সবই একটা বুনটের ঐক্যে গাঁথা থাকতো, তার ছন্দ আর সুরের গঠন দিয়ে প্রকাশিত হতো মেক্সিকান মনোভাব আর চরিত্র।

আইজেনস্টাইন পরিকল্পনা করেছিলেন—

মৃত্যু। মানুষের করোটি। এবং পাথরের করোটি। অ্যাজটেক ভয়ঙ্কর দেবদেবী, আর ইউকাটান (Yucatan) ভয়ঙ্কর দেবতাদের মূর্তি।

অল্পবয়সের স্কেচ
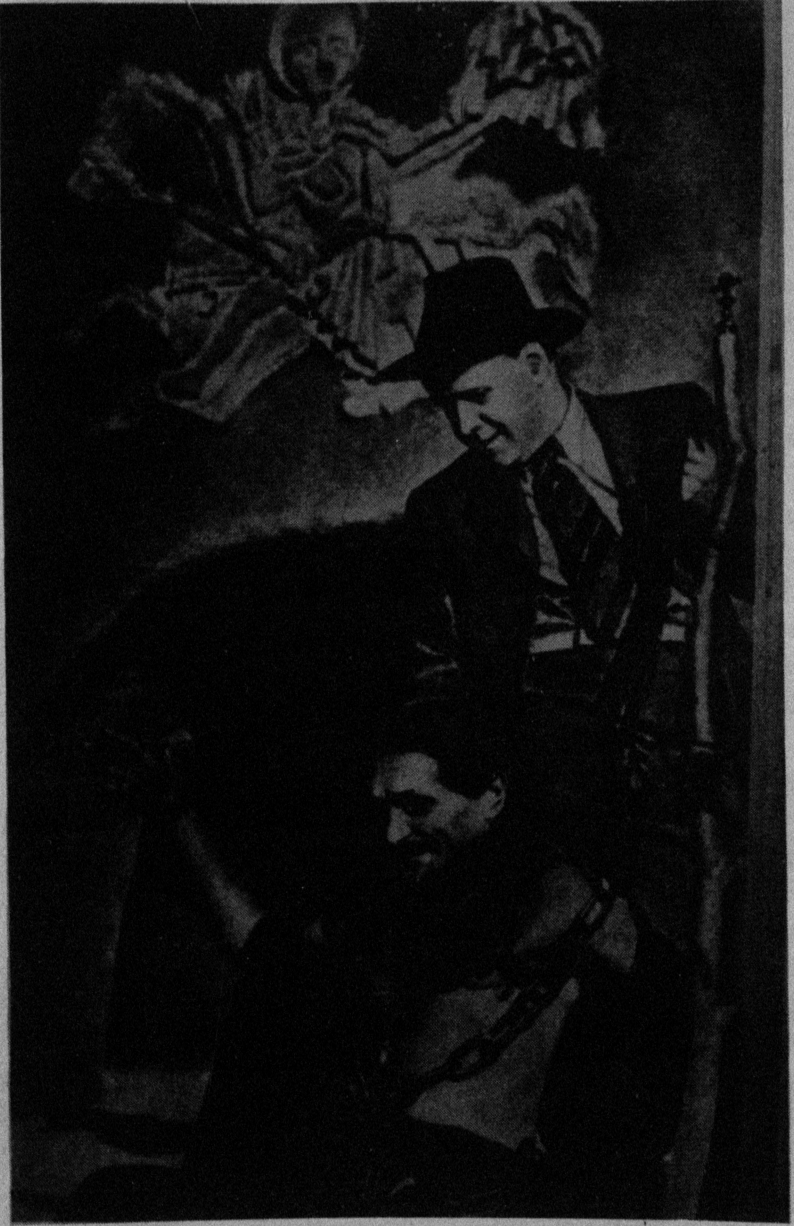
'ইভন দ্য টেরিব্‌ল্‌' চলচ্চিত্রে পুদভ্‌কিনকে নির্দেশ দিচ্ছেন আইজেনস্টাইন

বিশাল পুরাতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ, পিরামিড, পাথর আর স্তম্ভের সীমাহীন সারি, পাথরের মুখ। আর জীবন্ত মুখ।
ইউকাটান মানুষের আধুনিক চেহারা। সেই একই মানুষ হাজার হাজার বছর আগে বাস করতো, কোনো গতি নেই। কোনো পরিবর্তন নেই। অনন্তকাল ধরে একই।
মৃত্যু সম্পর্কে মেক্সিকোর মহান চিন্তাশীলতা, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ঐক্য। একজনের চলে যাওয়া এবং আর একজনের জন্ম।
অনন্তকাল এই বৃত্ত ঘুরছে। মেক্সিকোর মহান চিন্তাশীলতায় অধিকতর সংযোজন—এই অনন্তচক্রের উপভোগ।
মেক্সিকোতে 'মৃত্যুদিবস' পালন, এই দিনেই সবথেকে উচ্ছলতা আর আনন্দ। যেদিনে মেক্সিকো মৃত্যুকে আহ্বান করে আর তা থেকে আনন্দ পায়—জীবনের চক্রে সেটা এক পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছু না। তারপর তারা ভয় পায়।
ঘাসের টুপির দোকানে দেখা যায়, টুপির মাথায় রয়েছে করোটির প্রতীক। খাবার মিষ্টির আকৃতি দাঁড়িয়েছে করোটির মতো। দঙ্গল বেঁধে তারা কবরখানায় যায়, কবরের ওপরে গান করে। মৃতের খাবার জীবিতরা ভাগ করে খায়। ক্রমশই পানাহার আর গানবাজনা উচ্চগ্রামে চলতে থাকে।
মৃত্যুদিবস সারারাত ধরে চলে। মৃত্যুদিবস নতুন জীবনের জন্মদিবস হয়ে ওঠে, নতুন জীবন এসে দাঁড়ায়। এই ভয়ংকর মৃত্যুর উৎসবের ভয়াবহ করোটির নিচে উঁকি মারে নতুন শিশুর হাসিমুখ। যা দেখিয়ে দেয় মৃত্যুর অচল নিয়ম এগোয় জীবনের দিকে, আর জীবন মৃত্যুর দিকে।
জীবন···একটা ভেজা কর্দমাক্ত ঘুমন্ত। ফলগাছের বিরাট শাখা আর স্বপ্নিল জল আর মেয়েদের স্বপ্নিল চোখের পাতা। মেয়েদের, ভবিষ্যতের মায়েদের, অনেক আগের মায়েদের।
রানী মৌমাছির মতো, টেহুয়ানটেপেক্ (Tehuantepec) শাসন করতো মায়েরা। এই নারী আদিবাসী ব্যবস্থা আশ্চর্যভাবে আজও পর্যন্ত শত শত বছর ধরে এখানে রয়ে গেছে। আশ্চর্য গাছের শাখাপ্রশাখা, সাপের মতো। পুরুষের জন্যে অপেক্ষমান নারীর বিরাট স্বপ্নিল চোখকে ঘিরে রয়েছে সাপের মতো কালো আর ভারী চুলের ঢেউ।
টেহুয়ানটেপেকে মহিলাদের দিক থেকে কাজকর্ম শুরু হয়। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই মহিলারা শুরু করে নতুন পরিবারে নতুন ঘর বাঁধতে। কাপড় বোনে, ফল পাড়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজারে বসে বিক্রি করে। টেহুয়ানটেপেকের বাজারের ভীড় ধীর গতিতে নড়াচড়া করে, দিনের পর দিন। মুদ্রার পর মুদ্রা। যতক্ষণ না কোনো মেয়ের ঘাড়টা ঝুঁকে পড়ে সোনার মালার ওজনে।

সোনার মুদ্রা ঝুলছে সোনার মালায়। রাষ্ট্রের মুদ্রা। গুয়াতেমালার (Guatemala) মুদ্রা। মেক্সিকান ঈগলের ছাপ দেওয়া মুদ্রা।

পণ আর ব্যাংক, ভবিষ্যৎ আর মুক্তি, নতুন বাসা আর বিবাহ। বিবাহকে স্প্যানিশ ভাষার অর্থে বলা হয় নতুন ঘর নতুন পরিবারের ভিত্তি।

এক বর্ণাঢ্য সমাবেশের মধ্যে এ অনুষ্ঠান। অনেক প্রাচীনকালের স্প্যানিশ অনুপ্রবেশকারীরা যারা ইন্ডিয়ানদের উপনিবেশের চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলো, তারই উৎসবে মানুষেরা তাদের মুখকে সাজিয়ে তোলে। এটা সবচেয়ে পুরনো প্রথা। সেই পুরনো পোশাক, অলংকার আর সাজসজ্জায় নাচের সাথে সাথে চলে তরুণীর প্রেমকাহিনী। নানা প্রথা আর নিয়মকানুনের মধ্যে কাহিনী এগিয়ে চলে প্রেম থেকে বিবাহে। তারপর বিবাহনৃত্য থেকে চলে যায় আমগাছের ছায়ায় নতুন বাসায়।

নতুন বাসা ঢাকা পড়ে যায় তুষারশুভ্র এক মাথার চূড়ায় যেটা দেখতে পাহাড়ের মতো। এই চূড়া বিজয়ী মা আর স্ত্রীর মাথার ওপর। একটা তুষার ভরা স্নিগ্ধতা।

এমনি করে এগিয়ে গেছে আইজেনস্টাইনের পরিকল্পিত চলচ্চিত্র, এর মধ্যে এসেছে ১৯০৫ সাল নাগাদ মেক্সিকোতে দাসত্বের কথা। সে সময়ে মেক্সিকোতে বিপ্লবী আলোড়ন লেগেই থাকত।

তারপর এলো ১৯১০ সালের বিপ্লব। এ সমস্ত সময়কালের ঘটনাবলীর দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছিল আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে। যাদের হাতে জমি তাদের অধিকার, প্রতিবাদে বিস্ফোরণ আর নিপীড়নের নির্মমতা। মেক্সিকো শহরের কাছে সূর্যের বিরাট পিরামিড, অপেক্ষা করছে আরো ভালো দিনের।

আইজেনস্টাইন তাঁর 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের জন্য একটি চিত্রনাট্যের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, যার জন্যে নিজে অনেক ছবির স্কেচ্ করেছিলেন। কিন্তু এই বিশাল দৃশ্যগ্রহণের পরেও আইজেনস্টাইনকে সমস্ত পরিকল্পনাটি অসম্পূর্ণ রাখতে হয়। আর এমনি এক সময়ে বিদেশের বিচিত্র জীবনের মধ্যে আইজেনস্টাইন পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন আমেরিকার নিগ্রোদের বিদ্রোহী শিল্পী পল রোব্সনের সাথে।

পল রোব্‌সন্‌ ও আইজেনস্টাইন

১৯৩১ সালে আইজেনস্টাইন যখন মেক্সিকোয়, তখন তাঁর কৌতূহল জাগে পল রোব্‌সন্‌ (Paul Robeson) এবং নিগ্রো চলচ্চিত্র সম্পর্কে। বিশেষত যখন তিনি জন ভ্যাণ্ডারকুকের 'ব্ল্যাক ম্যাজেস্টি' গ্রন্থটি পাঠ করেন।

'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের প্রকল্পের শেষে যখন আইজেনস্টাইন মস্কোয় ফিরলেন, তখন তাঁর মাথায় নতুন ভাবনা জেগে উঠেছে হাইটির (Haiti) বিপ্লবের ওপর চলচ্চিত্র করার। অবশ্য এ চিন্তাটা হয়তো তাঁর প্যারিসে থাকাকালীনই প্রথম মাথায় এসেছিলো। 'ব্ল্যাক ম্যাজেস্টি' গ্রন্থের সাথে সাথে আরো কিছু গ্রন্থ আইজেনস্টাইন অধ্যয়ন করতে লাগলেন। হাইটিতে নিগ্রো জনসাধারণের ওপর এক অত্যাচারী একনায়কের বিপ্লব ধ্বংস করার নিপীড়নই তখন আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র পরিকল্পনার বিষয়বস্তু।

আর এই নানা সূত্রে পাওয়া কাহিনীর ভিত্তিতে যে পরিকল্পনা, তাতে অভিনয় করানোর জন্যে আইজেনস্টাইনের মনে হয়েছিলো পল রোব্‌সনের কথা।

পল রোব্‌সন্‌ তখন লণ্ডনে, 'স্যাণ্ডার্স অফ্‌ দ্য রিভার' (Sanders of the River) চলচ্চিত্রের কাজে ব্যস্ত। আইজেনস্টাইন কোনোদিন রোব্‌সন্‌কে দেখেননি, তাই দরকার পড়লো মারী সিটনের (Marie Seton) মধ্যস্থতার। আইজেনস্টাইন তাঁর ওপর দায়িত্ব দিলেন রোব্‌সন্‌কে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানানোর, যাতে প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রটি নিয়ে আলোচনা করা যায়।

লণ্ডনে মারী যখন ফিরে এলেন তখন আইজেনস্টাইনের চিঠি দিলেন রোব্‌সনের হাতে। রোবসন্‌কে মারী জানিয়েছিলেন যে, আইজেনস্টাইন হাইটির বিপ্লবের ওপর একটি চলচ্চিত্র তৈরির পরিকল্পনা করেছেন।

আইজেনস্টাইনের চিঠি পড়ে রোব্‌সনের কী প্রতিক্রিয়া হলো বোঝা গেলো না। নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার ব্যাপারে খুবই মন্থর ছিলেন রোব্‌সন্‌। কারণ তিনি নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কিছু বলতে চাইতেন না। সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে রোব্‌সনের কৌতূহল অনেক এবং মস্কোয় যেতেও তিনি আগ্রহী, একথা তিনি বলতেন। কিন্তু আইজেনস্টাইনের আমন্ত্রণে রোব্‌সনের আগ্রহ কতখানি ঠিক বোঝা গেলো না।

সেই সন্ধ্যায় রোব্‌সন্‌ পুশকিনের একটি গ্রন্থ নিয়ে সাবলীলভাবে পড়তে শুরু করলেন। মারী সিটন্‌ কোনো বিদেশীকে এমন সুন্দর রুশভাষা বলতে শোনেননি। পড়া শেষ করে মাথাটা পেছনে ঝাঁকিয়ে হেসে উঠলেন রোব্‌সন্‌। আঠারো মাস ধরে প্রায়ই রোব্‌সন মারী সিটনের সাথে রুশভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করেননি।

১৯৩৪ সালের ২০ ডিসেম্বর পল রোব্‌সন্‌ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে লণ্ডন থেকে মস্কো রওনা দিলেন। যেহেতু এই প্রথমবার তিনি মস্কোয় চলেছেন তাই মারী সিটনকেও সঙ্গে নিলেন।

২১ ডিসেম্বর পুরো দিনটাই রোব্‌সন্‌কে বার্লিনে থাকতে হলো। তারপর নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে রাশিয়ার সীমান্তে এসে পৌঁছলেন। ভীষণ ঠাণ্ডা আর প্রচণ্ড তুষারপাত। ট্রেনের মধ্যে রোব্‌সন্‌ গল্প করেছেন, ঘুমিয়েছেন।

সীমান্তের কাস্টমসে যখন তিনি এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখে পড়লো ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান এবং রুশ ভাষায় লেখা রয়েছে—'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।' রোব্‌সন্‌ খুশির হাসি হাসলেন।

পাসপোর্ট অফিসার কিন্তু রোব্‌সনের পাসপোর্টে ভুল আছে বলে তাঁদেরকে লণ্ডনে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন।

রোব্‌সনের সাথে ছিলো নিজের গানের কিছু রেকর্ড আর একটি গ্রামোফোন। এমনই একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মধ্যে কাস্টমস অফিসাররা উল্লসিত হয়ে গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপিয়ে দিল।

প্রত্যেকে তখন ঘিরে দাঁড়িয়ে শুনছেন আর বলছেন—"রোব্‌সন্‌আ! পাভেল রোব্‌সন্‌আ! অপূর্ব!"

তখনও কিন্তু কেউ চিনতে পারেনি আসল রোব্‌সন্‌কে। রেকর্ড শেষ হয়ে গেলো। কাস্ট্‌মস্‌ অফিসের অফিসার আরো গান শুনতে চাইলো। রোব্‌সন্‌ কয়েক ছত্র গান নিজের গলায় গেয়ে উঠলেন।

"রোব্‌সন্‌!" চিৎকার করে উঠলো একজন অফিসার। আর কোনো কথা নয়, নিয়মকানুনের বালাই না রেখে উল্লসিত অফিসারের দল রোব্‌সন্‌কে তুলে দিলো অপেক্ষমান ট্রেনে। অফিসাররা ভুলে গেলো পাসপোর্ট দেখার খুঁটিনাটি।

পল রোব্‌সনের ধারণা ছিল না, সোভিয়েত রাশিয়ায় তিনি কতখানি জনপ্রিয়।

রোব্‌সন্‌ এবং আইজেনস্টাইন সমবয়সী দুজনেরই আন্তর্জাতিক খ্যাতির শুরু ১৯২৫ সালে। কিন্তু এই দুই শিল্পীরই জ্ঞানের গভীরতার সাথে মিশেছিল খ্যাতির বস্তুগত লাভের প্রতি উদাসীনতা। দুজনের চেহারা ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। আইজেনস্টাইন ছোটোখাটো, সাদা। রোব্‌সন্‌ বিশাল শক্তিশালী, কালো। কিন্তু যে মুহূর্তে শিল্পকলার এই দুই স্তম্ভ একসাথে বসে কথা শুরু করতেন, তখনই বোঝা যেতো একজন অপরজনের অনুপ্রেরণার প্রতিবিম্ব।

আইজেনস্টাইন সাধারণত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে উন্নাসিক সমালোচক ছিলেন। সেই আইজেনস্টাইনই রোব্‌সনের সাথে সাক্ষাৎ করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রোব্‌সনের প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন।

আবার এ শতকের অজস্র বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত রোব্‌সন্‌ মাত্র ছয়দিনের পরিচয়ে বলেছিলেন আইজেনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎকার তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।
মস্কোয় দু'সপ্তাহ ছিলেন রোব্‌সন্‌ আর এই সময়টুকুতে আইজেনস্টাইন ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। বহু সন্ধ্যা কেটেছে উভয়ের একসাথে, আইজেনস্টাইনের ও অন্যান্য সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্র দেখে।
আইজেনস্টাইনের 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ', (অর্থাৎ, 'জেনারল লাইন') চলচ্চিত্রটি রোব্‌সনের সবথেকে ভালো লেগেছিলো।
'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে ছিলো দুই বৃদ্ধা মহিলা ষাঁড়ের করোটি ঝুলিয়ে রাখছে, যখন একটা অল্পবয়সী ষাঁড় মৃত্যুপথযাত্রী। এই দৃশ্যটির মধ্যে আফ্রিকা সম্বন্ধে এক শক্তিশালী অনুভূতি খুঁজে পান রোব্‌সন্‌। পুরনো রাশিয়ার এই প্রথার মধ্যে যেন আফ্রিকার যাদুবিশ্বাসের মিল রয়েছে।
ভোর প্রায় চারটে-পাঁচটা পর্যন্ত, রাতের পর রাত, রোব্‌সন্‌ আর আইজেনস্টাইন কথা বলে চলতেন। বিষয়বস্তু ছিলো ভাষা সম্পর্কে তাঁদের গবেষণা এবং শিল্পকলায় বিস্ময়কর প্রতীক।
আইজেনস্টাইনের ছোটো ঘরটা আরো ছোটো হয়ে গিয়েছিলো ঠাসা বইয়ে। রোব্‌সন্‌ আর আইজেনস্টাইন যখন পাশাপাশি বসে কথা বলতেন, তখন তাঁদের দুজনকে মনে হতো দিন আর রাত্রির প্রতীক।
এমনই এক সন্ধ্যায় আইজেনস্টাইন আর রোব্‌সন্‌ অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের উচ্চারণ আর আফ্রিকা ও চীনের উপভাষা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। বিছানা আর জানলার মাঝখানের সামান্য জায়গাটুকুতে দুজনে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করে দেখাতে লাগলেন প্রাচীন মানুষেরা কেমন ভাবে অঙ্গভঙ্গী করে নিজেদের কথা বোঝাতো।
অবশেষে আইজেনস্টাইনের ছোট্টো তেপায়া টুলের ওপর বসে রোব্‌সন্‌ বলতে লাগলেন কেমন করে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বাচনভঙ্গীর ছন্দের মধ্যে আমেরিকান নিগ্রোদের স্বরের ওঠানামা খুঁজে পেয়েছেন, কেমন করে তিনি সেই একই ছন্দ দেখেছেন চীনা সঙ্গীতের মধ্যে। এসব কথা বলতে বলতে রোব্‌সনের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় দ্রুততর হলো। তিনি যতোগুলো রেকর্ড আনা সম্ভব ততোগুলো বয়ে এনেছিলেন এবং সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর গ্রামোফোন। প্রথমে তিনি আফ্রিকার একটি রেকর্ড চাপালেন, তারপর চাপালেন একটি চীনা রেকর্ড, তারপরে একটি থাইল্যান্ডের রেকর্ড এবং অবশেষে তাঁর নিজের নিগ্রো স্পিরিচুয়াল।
রোব্‌সন্‌ এবং আইজেনস্টাইন এই সঙ্গীতের ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, রেকর্ডগুলো বারবার বাজিয়ে। পরে এক বিকেলে আইজেনস্টাইন এবং

অ্যালবার্ট কোয়েট্‌স্‌কে (Albert Coates) সঙ্গে নিয়ে রোব্‌সন্‌ সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর ইংরেজ স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। অ্যালবার্ট কোয়েট্‌স্‌ আমেরিকায় রোব্‌সনের গানের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এবং একসময় তিনি রাশিয়ার বিভিন্ন কনসার্টের পরিচালক ছিলেন।

তখনকার সোভিয়েত রাশিয়ার নেতাদের সাদামাটা জীবনযাত্রাকে, আজকের দিনে বলিষ্ঠতম কল্পনাতেও দেখা যাবে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রী তখন প্রত্যেকদিন সকালে সাতটার সময় বেরোতেন প্রাথমিক ইংরেজি শেখাতে। বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও ছিলো লালফৌজের ছাত্রছাত্রীরা, আর ছিলো আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র শিক্ষালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। বাড়িতে কোনো সেক্রেটারি বা আর্দালি বা চাকর ছিলো না। কিছু কৃষক ঘরের কাজের লোক হিসেবে ছিলো। সেদিন ছিলো ক্রিশ্‌মাসের আগের সন্ধ্যার নিমন্ত্রণ।

রোব্‌সন্‌ ও তাঁর স্ত্রী এসি কে (Essie) সাদর অভ্যর্থনা করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম লিৎভিনভ্‌ (Maxim Litvinove)। খাওয়াদাওয়ার শেষে এই বিখ্যাত ব্যক্তিরা ভুলে গেলেন তাঁদের খ্যাতির কথা।

ব্রিটিশ অধ্যাপকের কন্যা আইভি লিৎভিনভের (Ivy Litvinove) সাথে আইজেনস্টাইন এক উত্তেজক ট্যাঙ্গো নাচতে শুরু করলেন। হার্লেমের স্যাভয় বলরুমে নানান কঠিন পদক্ষেপ ও নিগ্রো ছন্দ শিখেছিলেন আইজেনস্টাইন। রোব্‌সন্‌ সাধারণত শান্ত ও ভাবগম্ভীর থাকেন। আজ তিনিও উঠে পড়লেন আইজেনস্টাইনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে। একসময় হঠাৎ থেমে গেলেন রোব্‌সন্‌। সবাই হয়তো এতোক্ষণের নাচে অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। রোব্‌সন্‌ এবার সবাইকে প্রশান্ত, গম্ভীর, ভারী কণ্ঠস্বরে তাঁর মানুষদের সঙ্গীত শোনালেন—

> "Go down, Moses,
> Way down in Egypt's land,
> Tell Lord Pharoah
> To let my people go !"

সেই সন্ধ্যায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি থেকে আইজেনস্টাইনের বাসায় ফিরে এলেন রোব্‌সন্‌। তাঁর মনে তখন ঘরে ফেরার ভাবনা।

খৃস্টমাসের পরেরদিন রোব্‌সনের জন্য অপেক্ষা করছিলো আইজেনস্টাইনের চমক। আইজেনস্টাইনের সেই বইয়ে ঠাসা অগোছালো ঘরটা আজ চমৎকার গোছানো। তিনি তাঁর প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনেছেন চেয়ার, টেবিলঢাকা, রুপোর বাসনকোসন। কোনো অভিজাত বাড়ির কর্তার মতো

আইজেনস্টাইনের পরনে নীল রঙের নতুন পোশাক। অতিথিদের মধ্যে একজন সেদিন আইজেনস্টাইনের ক্যামেরাম্যান টিসে।

খাওয়াদাওয়ার শেষে আইজেনস্টাইন রোব্‌সন্‌কে নিয়ে যেতে চাইলেন দোমকিনো (Domkino), হাউজ অব দ্যা ওয়াকার্সে। সেখানে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা চলচ্চিত্রে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে। সেই বিরাট বৈঠকে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রায় সমস্ত সদস্যের উপস্থিতিতে রোব্‌সন্‌ চমৎকৃত।

সবাই রোব্‌সন্‌কে দেখে উল্লসিত এবং তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে চলে এলেন রোব্‌সনের কাছে। চিৎকার করে উঠলেন—"পল! পল!"

মুরিয়েল ড্রেপারকে (Muriel Draper) দেখে উঠে দাঁড়ালেন রোব্‌সন্‌, আর ড্রেপার তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে দুই গালে চুম্বন করলেন। ড্রেপারকে দেখে রোব্‌সন্‌ অবাক। নিউইয়র্কে তাঁর প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর তিনি তাঁকে দেখেছিলেন।

ড্রেপার ঘোষণা করলেন যে, রোব্‌সন্‌কে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠানের আগে থেকেই চেনেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় ড্রেপার এসেছিলেন শিক্ষা নিতে। এই ড্রেপারেরই যখন চুল সাদা হয়ে গিয়েছিলো, অর্থাৎ এই ঘটনার পনের বছর পর, তিনি আমেরিকায় রোব্‌সনের পাশে দাঁড়িয়ে নিগ্রো নারীদের সমানাধিকারের জন্য লড়েছেন।

কিছুক্ষণ পর আইজেনস্টাইনকে রোব্‌সন্‌ জিজ্ঞাসা করলেন চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের তিনি গান শোনাবেন কিনা। আইজেনস্টাইন হাসলেন। রোব্‌সন্‌ উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন মঞ্চের মাঝখানে, সেখানে কোনো যন্ত্রসঙ্গীত-শিল্পী নেই, নাচের জন্যে ফাঁকা করে রাখা হয়েছে জায়গাটা। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে, দুটো হাতকে শক্ত করে ধরে রোব্‌সন্‌ রুশ ভাষায় বলে উঠলেন—"আপনারা জানেন এমন গানই আমি গাইতে চেষ্টা করবো।"

আড়ষ্ট লাগছিলো রোব্‌সন্‌কে, তাঁর স্পর্শকাতর মুখের প্রত্যেকটা রেখা জোরালো আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। কোনো যন্ত্রী ছাড়াই তাঁর একক কণ্ঠ মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিলো। শ্রোতারা তাঁদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—এই কণ্ঠে সত্যিকারের রুশ আবেগ রয়েছে। তাঁদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—এক বিশাল নিগ্রোদেহের আফ্রিকান বৈশিষ্ট্যগুলো যেন রূপান্তরিত হয়েছে রাশিয়ার স্লাভদের বৈশিষ্ট্যে।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন আইজেনস্টাইনও। রোব্‌সনের পিছনে একটু ওপরে টাঙানো রয়েছে লেনিনের প্রতিকৃতি। আইজেনস্টাইন তাকিয়েছিলেন রোব্‌সনের দিকে। লেনিন আইজেনস্টাইনের জীবনে পরিবর্তন এনেছেন। আর এবার রোব্‌সনের ভবিষ্যতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন আইজেনস্টাইন।

গানের শেষ সুরটুকু মিলিয়ে যাওয়ামাত্রই সমস্ত শ্রোতা বন্যার মতো ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন রোব্‌সন্‌কে। তাঁরা তাঁকে চুম্বন করলেন, কাঁদলেন, হাসলেন, আর রুশভাষায় সব থেকে আদরের নামে ডাকলেন—পাভেল্‌শকা, প্রিয় স্নেহের পল।

আরেকদিন আইজেনস্টাইন রোব্‌সন্‌কে নিয়ে গেলেন এক নাট্যকার সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে। বন্ধু সেগেঁই ত্রেতিয়াকভ্‌ (Sergei Tritiakove) তখন শিল্পকর্মীদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের কেন্দ্রে। এই শীতে বনের ধারে, পাহাড় আর জঙ্গল পেরিয়ে, রাশিয়ার চিরাচরিত তিনঘোড়ায় টানা গাড়ি ত্রয়কা ছাড়া যাওয়া যায় না। তাতেই উঠলেন রোব্‌সন্‌ আর আইজেনস্টাইন। বেড়াতে বেড়াতে যখন অন্ধকার নেমে আসছে, তখন ত্রয়কা থেমে পড়লো। তার প্রাপ্তবয়স্ক বিখ্যাত সওয়ারিরা নেমে পড়লেন ঘন তুষারের মধ্যে খেলা করতে। তুষারের গোলা তৈরি করে পরস্পরকে ছুঁড়ে মারলেন, শিশুর মতো নকল যুদ্ধে মেতে হেসে গড়িয়ে পড়লেন পরস্পরের দিকে তুষার গোলা ছুঁড়ে।

রাশিয়ার মানুষ, কর্মস্থল আর শিল্পচর্চার নমুনা দেখার পর, একদিন ন্যাশনাল হোটেলে ফিরে এসে নরম পায়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন রোব্‌সন্‌। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বলশয়ে স্কোয়ারের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। তারপর আইজেনস্টাইনের পাশে বসে বললেন—"এখানে আসতে আমি ইতস্তত করেছিলাম। সবাই যেমনটা বলে তেমনই শুনেছিলাম। অন্য জায়গার থেকে এই জায়গাটার কোনো তফাৎ থাকতে পারে বলে ভাবিওনি। কিন্তু—তুমি হয়তো বুঝবে—বড়ো হবার পর এই প্রথম নিজেকে মানুষ বলে অনুভব করছি আমি। এখানে আমি একজন নিগ্রো নই, আমি একজন মানুষ। এমনটা যে হতে পারে, আসার আগে বিশ্বাসও করতে পারতাম না। এই ক'দিনের মধ্যেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি। এখানে, আমার জীবনে এই প্রথম, আমি সম্পূর্ণ মানুষের মর্যাদায় হাঁটছি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না নিগ্রো হিসাবে আমার কাছে এটা কতোখানি।"

আইজেনস্টাইনের আমন্ত্রণে রোব্‌সন্‌ এরকম এক গভীর অনুভূতির জগতে পৌঁছেছিলেন। যদি এর থেকে কম কিছু ঘটতো, হয়তো রোব্‌সনের পরবর্তী জীবন অনেকটাই বদলে যেতো।

১৯৩৫ সালের ৬ জানুয়ারি, রোব্‌সন্‌ আর তাঁর স্ত্রী মস্কো থেকে লন্ডনের পথে রওনা হন। আইজেনস্টাইনকে রোব্‌সন্‌ বলেছিলেন যে 'ব্ল্যাক ম্যাজেস্টি' চলচ্চিত্রে তিনি শরৎকালে এসে অভিনয় করতে পারবেন। কারণ এখন তাঁর ব্যস্ততা রয়েছে অন্য অভিনয়ের কাজে।

১৯৩৫ সালের শরৎকালে সত্যিই রোব্‌সন্‌ চেয়েছিলেন মস্কোয় ফিরে যেতে, আইজেনস্টাইনের প্রস্তাবিত 'ব্ল্যাক ম্যাজেস্টি' চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্যে।

কিন্তু সেটা আর হলো না, কারণ মে মাস থেকে আইজেনস্টাইন অন্য চলচ্চিত্রের কাজে হাত দিয়েছিলেন।
আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র নিয়ে ব্যস্ত মানে তখন ভবিষ্যতের আরো কয়েকটি অসম্পূর্ণ প্রকল্পের ইতিহাস। দীর্ঘ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো আইজেনস্টাইনের সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের প্রকল্পের জন্য।

'আলেকজান্দার নেভস্কি' চলচ্চিত্র

১৯৩৮ সালের 'আলেকজান্দার নেভস্কি' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা শুরু হয়েছিলো এক বছর আগে থেকে। চলচ্চিত্র হিসেবে, প্রায় দশ বছর পরে একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে পারলেন আইজেনস্টাইন। এর আগে তাঁর সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র ছিলো 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ', ১৯২৯ সালে।
দৃশ্যাবলীর বিশালত্ব ও চমকের সাথে সাথে এই চলচ্চিত্র, আইজেনস্টাইনের সমসাময়িক রাশিয়া থেকে অনেক অতীতে নিয়ে গেলো কাহিনীকে। শুধু তাই নয়, অনেক অতীতের কাহিনী বলতে গিয়ে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে খোলাখুলি প্রাধান্য পেল ব্যক্তি-চরিত্র। যাকে নিয়ে কাহিনী, যাকে কেন্দ্র করে কাহিনী।
'আলেকজান্দার নেভস্কি' চলচ্চিত্রের কাহিনী ও দৃশ্যের বিস্তারে ছিলো কয়েকশো বছর আগেকার যুদ্ধের পটভূমি। আর এই পুরনো রাশিয়ার কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র করতে নামার সমস্যা অনেক।
কয়েকটা ভাঙা তলোয়ার, একটা হেলমেট, গোটা কয়েক ছোটোখাটো জিনিসপত্র যাদুঘরে রয়েছে, সেই পুরনো দিনের স্মৃতি হিসাবে। আর আইজেনস্টাইনরা চলচ্চিত্র করতে নেমেছেন প্রায় ছয়শতরও বেশি বছর আগের কাহিনী নিয়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এমন একটা পুরনো সময়, যখনকার কিছুই এখন ছবি তোলার মতো নেই। এই অতীতের সবকিছুই বর্ণিত হতো অতিরঞ্জিত ভাবে, নায়ককে হতে হবে এক শক্তিশালী জননায়ক। তার চেহারা হতে হবে দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে চেহারা পরাজিত করবে অন্য দেশের সমস্ত রাজাদের। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে সে হবে দীর্ঘতম, তার কণ্ঠস্বরে থাকবে দুন্দুভির নিনাদ। শক্তিমত্তায় সে হবে স্যামসনের কাছাকাছি, আর তার থাকবে সলমনের মতো জ্ঞান।
এই দুন্দুভির নিনাদের মতো কণ্ঠস্বর কি চলচ্চিত্রের পর্দা কাঁপাবে? চলচ্চিত্রের দর্শককে কি এই অতিরঞ্জিত বর্ণনায় আলোড়িত করা হবে? পরস্পরবিচ্ছিন্ন

তথ্যগুলোকে আর পুরনো ছোটো ছোটো চিত্রকলাকে একজোট করে খাড়া করতে হবে চলচ্চিত্রের কাঠামো।
সে যুগের সংস্কৃতির সামান্য উপকরণ, আর প্রাচীন দুর্গ আর শহরের দেওয়ালের শ্বাস-প্রশ্বাস।
আইজেনস্টাইন কিন্তু প্রথমেই এই প্রথাগত আবেগ ছেড়ে দিলেন। তাঁর গভীর অনভূতি ছিলো, তিনি প্রথমত একটি সমসাময়িক চলচ্চিত্র করতে চলেছেন। তাঁর সময়কালের সোভিয়েত রাশিয়ার ঘটনাবলীর সাথে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘটনাবলীর আশ্চর্য মিল রয়েছে। ঠিক প্রত্যেকটি কথা ধরে না-হলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘটনাবলী আবেগের দিক থেকে আইজেনস্টাইনের সমসাময়িক রাশিয়ার অনেক কাছাকাছি ছিল।
এমনকি কখনো কখনো টুকরো কাহিনীও মিলে যায়। আইজেনস্টাইন কোনোদিন ভুলতে পারেন নি খবরের কাগজে পড়া সেই খবরটা—ফ্যাসিস্টদের আক্রমণে 'গুয়েনিকা' (Guernica) শিল্পকর্ম ধ্বংস হচ্ছে। আলেকজান্দার নেভস্কির জীবনীর পাতা উল্টে আইজেনস্টাইন দেখেছেন, এরকমই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।
আইজেনস্টাইনের সমস্যা হলো, একজন টিউটনিক্-লিভোনিয়ান্ নাইট সাবলীলভাবে রুশ ভাষায় কথা বলবে? ভাষার সমস্যাটা বিরাট। ত্রয়োদশ শতাব্দীর জার্মান ভাষা ব্যবহারের সাথে রয়েছে সে সময়কার মাতৃভূমি রাশিয়ার পুরনো রুশ ভাষা। এমনকি কোনো কোনো জায়গায় হয়তো ল্যাটিন ভাষারও ব্যবহার রয়েছে।
আইজেনস্টাইন নিজের কাছেই যখন এই সমস্যা তুলে ধরলেন তখন দেখা গেলো এই সমস্যার সমাধান। তাঁর কাছে প্রশ্নটা ছিলো এরকম—
চলচ্চিত্রের দর্শকদের কাছে কোন্‌টে বেশি গুরুত্বপূর্ণ—অদ্ভুত অজানা দুর্বোধ্য ভাষা শুনে নিজের ভাষায় সাবটাইট্‌ল্ পড়া, নাকি সাবলীল বোধ্য রুশ ভাষায় বিজিত মানুষের ওপর বিশ্বাসঘাতকতা আর নির্যাতনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী দেখা? দর্শকের সময় ও শক্তি, দুর্বোধ্য ভাষা শুনে, রুশ সাব-টাইট্‌ল্ পড়তে নষ্ট হবে।
আইজেনস্টাইনের কাছে কোন্‌টে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ—ভাষার ক্ষেত্রে এই গবেষণা করা যাতে ছয়শত বছর আগে ভাষা কেমন ছিলো বোঝা যায়, নাকি আলেকজান্দার নেভস্কি বোধ্য আধুনিক রুশ ভাষায় তার পরিকল্পনা বলবে সেনাবাহিনীকে?
আলেকজান্দার নেভস্কি বরফের উপর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে, নিজের রাজ্য-সীমার মধ্যে শত্রুকে পরাজিত করার পরিকল্পনা করতে, সৈন্যবাহিনীর সামনে সাবলীল আধুনিক রুশ ভাষায় কথা বলছে—এটাই আইজেনস্টাইনের কাছে

অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। দর্শকের কাছে বোধ্য ভাষায় চলচ্চিত্রের ঘটনাবলী পৌঁছে দিতে হবে, যাতে তারা বোঝে কি ঘটছে।
ত্রয়োদশ শতকের মানুষেরা কেমন করে হাঁটতো? কেমন করে খেতো? কেমন করে দাঁড়াতো?
আলেকজান্দার নেভস্কি ছিলেন নভোগরদের রাজকুমার। সে সময়ের নভোগরদের বৈশিষ্ট্য সাজপোশাকে কেমন করে দেখানো হবে? আইজেনস্টাইনের কাছে সমস্যা, সেই সুদূর অতীতের মানুষের সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক কি করে গড়ে তুলবেন।
আইজেনস্টাইন নভোগরদ শহরে দাঁড়িয়ে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলেন—তখনকার মানুষ কি দেখতো? যে কয়েকটা পুরনো জিনিস পাওয়া গিয়েছিলো, যেমন, ছুঁচলো মাথার বুটজুতো বা মেয়েদের অলংকার, সেগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আইজেনস্টাইন অনুভব করতে চেষ্টা করলেন সে সময়কার মানুষদের চলার ছন্দকে। নভোগরদ শহরের তখনকার কাঠবাঁধানো ফুটপাত ধরে কেমনভাবে মানুষেরা হাঁটতো—অনুমান করতে চেষ্টা করলেন তিনি।
কিন্তু এ সবই ব্যর্থ হচ্ছিলো অনুমান-নির্ভর কল্পনা ও পরিকল্পনায়। কিন্তু হঠাৎ যেন সব স্বচ্ছ হয়ে গেলো।
১১৯৮ সালে তৈরি এক অপূর্ব দেওয়ালচিত্রপূর্ণ গির্জার সন্ধান পাওয়া গেলো। আইজেনস্টাইনরা মুগ্ধ হয়ে এর অপূর্ব গঠন আর বিশুদ্ধতা লক্ষ্য করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর এই স্মৃতিস্তম্ভটি আলেকজান্দারকে দেখেছিলো, আবার আলেকজান্দার তাকে দেখেছিলেন।
আইজেনস্টাইনরা এই বিশাল ইমারতের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সৌন্দর্য, অনুপাত এবং বিশুদ্ধ রেখার সমাহার। হঠাৎ তাঁদের চোখে পড়লো স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ একটি পাথরের ফলক। তাতে লেখা আছে স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরি করা কবে শুরু হয়েছিলো, কবে শেষ হলো। যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ এই ফলকটুকু লাগিয়ে আইজেনস্টাইনের অনেক সুবিধে করে দিয়েছিলো। এই গির্জাটির ভিত্তিপ্রস্তর থেকে এর নির্মাণের সময়কালটা খুব সহজেই পাওয়া গেলো। বোঝা গেলো, গির্জাটি তৈরি করতে মাত্র মাস কয়েক লেগেছিলো।
ফলকের লেখাটা থেকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া গেলো—সমস্ত খিলান, সমস্ত গম্বুজ সচল প্রক্রিয়ায় তৈরি। এখন যেন মনে হলো, পুরো গির্জাটা তৈরি হয়েছে এমন এক সচল প্রক্রিয়ায়, যেটা আইজেনস্টাইন অনুভব করতে পারছেন বাইরে থেকে নয়, একেবারে ভেতর থেকে। মানুষের শ্রমের গতিশীলতায় সৃষ্টি এই শিল্পকলা। শত শত বছর ধরে সেই মানুষেরা আমাদের সাথে সম্পর্কিত একটি ভাষায়—মানুষের সৃজনধর্মী কাজের ভাষায়।
আইজেনস্টাইনের মনে হলো—এমন একটি স্থাপত্য যারা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে

গড়ে তুলতে পেরেছে, তারা কিন্তু পুতুল, ছবি বা প্রস্তরমূর্তি নয়। তারা আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। পাথর এখন আর আইজেনস্টাইনকে টানছে না, তাঁকে ইতিহাসের কাহিনী শোনাচ্ছে না। বরঞ্চ সেই মানুষরাই তাঁকে ইতিহাস শোনাচ্ছে—যারা পাথর কেটেছে, খোদাই করেছে, ওই বিরাটাকার অট্টালিকা গড়ে তুলেছে।

শত্রুর প্রতি সেই মানুষদের ঘৃণা, দেশের প্রতি তাদের ভালবাসা তাদেরকে সোভিয়েত জনগণের অনেক কাছে টেনে এনেছে। আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হবে, সেই মানুষদের দেশপ্রেমের অন্তর্বস্তুর মধ্যে দিয়ে।

আলেকজান্দার নেভস্কিকে গির্জা থেকে 'সন্ত' বিশেষণ দিয়েছিলো। যদি গির্জার পাদ্রীদের হাতে এই বিশেষণের ব্যাখ্যার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হতো—সেটা অন্য ব্যাপার। আইজেনস্টাইন ব্যাপারটা এভাবে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। 'সন্ত' বিশেষণটির ব্যাখ্যা অন্যভাবে খুঁজে দেখলেন তিনি।

নেভস্কি শহীদ হননি—তাঁকে কেউ হত্যা করেনি। তবুও তিনি কেন 'সন্ত' বলে পরিচিত? আসলে 'সন্ত' বিশেষণটি নেভস্কির নামের সাথে ব্যবহার করা হয়েছিল, নিশ্চয়ই তাঁর গুণাবলীর সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হিসেবে। অন্য কোনো শব্দ দিয়ে সেই গুণাবলী বোঝানো সম্ভব ছিলো না। এই 'সন্ত' বিশেষণের সাথে ধর্মীয় কোনো কারণ জড়িত ছিলো না। অথচ যুগে যুগে যাজকসম্প্রদায় 'সন্ত' কথাটির ধর্মীয় ব্যাখ্যাই দিতো।

এই নতুন ব্যাখ্যায়, আলেকজান্দার নেভস্কির চিরস্মরণীয় শৌর্য-বীর্যকে আর তাঁর দেশ সম্পর্কে বীরের ভূমিকাকে প্রকাশ করে—তাই তিনি 'সন্ত' আজও পর্যন্ত।

আলেকজান্দার নেভস্কি সম্পর্কে এমন একটি বিশেষণের ব্যাখ্যায় আইজেনস্টাইনের কাছে 'সন্ত' শব্দের যাবতীয় জটিলতা দূর হয়ে গেলো। পড়ে রইলো নেভস্কির দেশকে শক্তিশালী আর স্বাধীন করে তোলার জ্বলন্ত ধারণা।

যে সব পুরনো লেখাপত্র ছিলো, তাতে দু'একটা সংযোজন ও সংশোধন করে নেভস্কির ভাবমূর্তিটা প্রস্তুত করা গেলো। নেভস্কির সম্পর্কে এই চলচ্চিত্রে প্রধান অন্তর্বস্তুই ছিলো দেশপ্রেম।

চুদস্কোয়ে (Coudskoye) হ্রদের বিশাল বুক তখন জমে বরফ হয়ে গেছে। রাশিয়ার শীতকালের সেই অসাধারণ দৃশ্য, তার বিশালত্ব, এমনভাবে চোখের সামনে আর হাতের মুঠোয় পাওয়ার উত্তেজনা আইজেনস্টাইনের মনের মধ্যে। ১৯৩৮ সালের শীতকালে যখন আইজেনস্টাইনরা নভোগরদে গিয়েছিলেন, তখন ইলমেন্ (Ilmen) হ্রদের বরফ যেন তাঁদেরকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে শেষ করে

দিচ্ছিলো। বরফ আর তুষারের অসীম বিস্তৃতির চেহারাকে লিখে রাখার জন্যে আঙুল টানতে পারছিলেন না তাঁরা। ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গিয়েছিলো আঙুলগুলো।
চিত্রনাট্য প্রস্তুতিতে দেরি হয়ে গেলো। শীতকালের দৃশ্য বাস্তবে তুলতে গেলে অপেক্ষা করতে হয় ১৯৩৯ সালের শীত আসা পর্যন্ত।
আইজেনস্টাইনের সামনে তখন বিরাট সমস্যা। সত্যিকারের বরফ কি চলচ্চিত্রে দেখানো যাবে না ? পরের বছর হয়তো বরফের সেই অসাধারণ মূর্চ্ছনা ক্যামেরায় তুলে রাখতে পারবেন আলোকচিত্রকর টিসে। কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে অনেকদিন। প্রয়োজনটা শীতের সৌন্দর্য দেখানোর, নাকি চলচ্চিত্রটি অবিলম্বে শেষ করে রাশিয়ার বীরত্বের দৃশ্য তুলে ধরার ?
আইজেনস্টাইনের দলের নতুন সদস্য ভাসিলাইয়েভ্ (Vasilyev) এক সাহসিক পরামর্শ দিলেন, গ্রীষ্মকালে শীতের দৃশ্য তোলার। সমস্ত খুঁটিনাটি সমস্যা বিচার করে, অবশেষে আইজেনস্টাইন এই চলচ্চিত্রের বরফের ওপর যুদ্ধের দৃশ্যটি, ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মেই গ্রহণ করলেন।
তখন বরফ আর তুষারের সৌন্দর্য গলে গেছে। চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুর জরুরি প্রয়োজনে নির্বাচন করা হয়েছে একটি জায়গা যেখানে বরফের ওপর যুদ্ধের দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। গলা কাচ দিয়ে বরফের টুকরো গড়ে তোলা হলো। সমস্ত জমি ঢেকে দেওয়া হলো সাদা খড়িচূর্ণের গুঁড়ো দিয়ে। তার ওপরেই অভিনীত হলো যুদ্ধের দৃশ্য।
'আলেকজান্দার নেভস্কি' চলচ্চিত্রে বরফের ওপর যুদ্ধের এই দৃশ্য অসাধারণ সফল। কিন্তু সত্যিই কি এক নকল শীতের দৃশ্য রচনা করে দর্শকদের ঠকানো হয়েছিলো ? আইজেনস্টাইন কিন্তু এ ব্যাপারে পরিষ্কার মতামত দিয়েছেন—রাশিয়ার শীতকে কখনো নকল করা যায় না যথাযথভাবে।
শীতের দৃশ্যকে নকল করার পরিবর্তে আইজেনস্টাইনরা শীতের সূত্র ধরে এগিয়েছেন। সেই সূত্র ধরেই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। শব্দ আর আলোর আনুপাতিক ব্যবহার শীতকে ফুটিয়ে তুলেছে—জমিটা সাদা আর আকাশটা অন্ধকার। আইজেনস্টাইন শীতকে দেখাতে চাননি—বরং চলচ্চিত্রে শীতকে সৃষ্টি করেছেন।
আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন আইজেনস্টাইন—চলচ্চিত্রে শীতকে দেখানোর পরিবর্তে যুদ্ধকে দেখিয়েছেন। দর্শকরা সেই যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে দেখতে শীতকে অনুভব করেছেন মাত্র।
আইজেনস্টাইন শীতকালের পরিবর্তে গ্রীষ্মকালে যেমন দৃশ্যগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনই চলচ্চিত্রের কাজ তিনগুণ এগিয়ে নিতেও বাধ্য হয়েছেন, সমস্ত কলাকুশলীর অপরিমেয় উৎসাহের জোয়ারে।

'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' হলো আইজেনস্টাইনের জীবনের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। অথচ তাঁর সহকর্মীদের কয়েকজন ইতিমধ্যেই সবাক চলচ্চিত্রে অভিজ্ঞ।

আইজেনস্টাইন ভাবতে, কল্পনা করতে, পরীক্ষামূলক কাজের চিন্তা করতে ভালোবাসতেন। তাই শব্দ ও দৃশ্যের মধ্যে নানান মিশ্রণের কল্পনা ও পরিকল্পনা তাঁর মাথায় খেলা করতো। কিন্তু 'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' চলচ্চিত্র তো স্বপ্নবিলাস নয়। সেটাকে বাস্তবে সম্পূর্ণ করতে হবে অবিলম্বে।

নভেম্বরের ৭ তারিখের মধ্যেই শেষ করতে হবে 'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' চলচ্চিত্র। শব্দ ও দৃশ্যের যথাযথ মিশ্রণে, সেটা কি সত্যিই সার্থক রূপ পাবে? মনে মনে একটা শপথ উচ্চারণ করতেন আইজেনস্টাইন—"চলচ্চিত্রটি ৭ তারিখের মধ্যে শেষ করতেই হবে।"

সঙ্গীতকে দরকার হলো এই চলচ্চিত্রের অন্তর্বস্তুকে প্রস্ফুটিত করার জন্য। সময় অবিশ্বাস্যরকম কম, কাজ করতে হবে তাই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। যদিও বা দৃশ্যাবলীকে সম্পাদনা করার পর চলচ্চিত্রের কাহিনীকে দাঁড় করানো গেল, আইজেনস্টাইনের বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো সঙ্গীত। কেমন করে সম্ভব দৃশ্যের সাথে সঙ্গীতকে যথাযথভাবে মিশ্রিত করা?

আইজেনস্টাইনকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন যাদুকরের মতো সঙ্গীতবিশারদ সের্গেই প্রকোফিয়েভ্। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার, কেমন করে এই আশ্চর্য কাজটি করলেন প্রকোফিয়েভ্।

চলচ্চিত্রের দৃশ্যের অন্তর্বস্তু বুঝি নিলেন প্রকোফিয়েভ্। কম্পোজিশনের যৌক্তিক কাঠামোটিও আবিষ্কার করতে পারলেন মোটামুটি নিলেন। আগে কাটছাঁট করা দৃশ্যাবলী থেকে। বিস্ময়কর সঙ্গীত প্রস্তুত করার সময় বার করে কখনো স্টুডিওতে যা হয়নি, তাই করলেন তিনি—একাধিক মাইক্রোফোন ব্যবহার করে শব্দ সংযোজন করলেন। প্রকোফিয়েভের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে কাজ করলেন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ভল্স্কি (Volsky) এবং অপারেটর বগ্দানকেভিচ্ (Bogdankevich)।

দৃশ্য ও শব্দ সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত দ্রুতবেগে করে চলেছেন আইজেনস্টাইন। তাঁকে সাহায্য করে চলেছেন তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পাদনার সহকর্মী ফিরা তোবাক্ (Fira Tobak)। তাই তাঁর হাতের কাছে ঠিক সময়ে দৃশ্য ও শব্দের উপকরণগুলো প্রস্তুত থাকতো।

হাতে সময় খুব কম। এই কম সময়ের মধ্যেই দ্রুত দৃশ্য ও শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র গড়ে উঠলো। এর দ্বিগুণ সময় হাতে পেলেও এর থেকে ভালো কিছু করতে পারতেন না আইজেনস্টাইন।

প্রকোফিয়েভের অপরিসীম প্রতিভা এ চলচ্চিত্রে বিরাট অবদান রেখেছে। তাঁর

কাজ মিলিত হয়েছে স্টুডিও ও কলাকুশলীদের অবিস্মরণীয় ভূমিকার সাথে। সকলের মিলিত প্রয়াসেই এই বিশাল কাজটা এতো অল্প সময়ে শেষ হয়েছে। ১৯৩৯ সালে আইজেনস্টাইন যখন আলেকজান্দার নেভস্কি চলচ্চিত্রের এই বর্ণনা দিচ্ছেন তখন তিনি ঘোষণা করেছেন—"আমাদের বিষয়বস্তু হলো দেশপ্রেম। আমরা এটা সফলভাবে করতে পেরেছি কিনা, সোভিয়েতের দর্শকরাই তা বলবেন।"

'আলেকজান্দার নেভস্কি' নির্মাণের বৈচিত্র্য

'আলেকজান্দার নেভস্কি' চলচ্চিত্র নির্মাণের আট বছর পর, ১৯৪৬ সালে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আইজেনস্টাইন এই চলচ্চিত্রের প্রস্তুতি ও নির্মাণের কিছু বৈচিত্র্যের কথা লিখে গেছেন। এই লেখাটিও যেন হঠাৎ অসম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে।

সোভিয়েত লেখক পি. এ. পাভলেঙ্কো (P. A. Pavlenko), 'আলেকজান্দার নেভস্কি' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখার কাজে আইজেনস্টাইনের সাথে যৌথভাবে কাজ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পাভলেঙ্কোর জন্ম ১৮৯৯ সালে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫১ সালে।

চিত্রনাট্য লেখার সময়, সব চরিত্রই যে ইতিহাসের বাস্তবতা দিয়ে এসেছে, তা নয়। চরিত্রগুলো নির্মিত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পটভূমিতেই, কিন্তু কল্পনার মিশ্রণে। আলেকজান্দার নেভস্কিকে এক অমিত প্রতিভাশালী হিসাবে দেখানোর জন্য, তাঁকে নানা ঘটনার ও চরিত্রের আবিষ্কারকের ভূমিকায় রাখা হয়েছিলো। এমনই একটি চরিত্র অস্ত্রাগার-রক্ষক ইগ্নাৎ (Ignat)। ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাশিয়ায় যে বৈচিত্র্য ছিলো কারিগরি ও হস্তশিল্পে, তারই এক সঙ্গত চরিত্র চিত্রনাট্যে রাখার ইচ্ছে ছিলো। ইগ্নাতের চরিত্র, আইজেনস্টাইনের মনে হয়, ইতিহাসে ছিলো না। অথচ খসড়া চিত্রনাট্যে ইগ্নাৎ জন্মালো যেন ঠিক আলেকজান্দারের মগজ থেকে।

এই অনুভূতিটা আলেকজান্দার নেভস্কি সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের আগাগোড়াই ছিলো। কিংবদন্তীতে যেমন শোনা যায় একটা আপেলের পতন দেখে বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের সূত্র পেয়েছিলেন, আলেকজান্দার সম্পর্কেও তেমন কোনো ঘটনা কাহিনীতে রাখার আকাঙ্ক্ষা ছিলো আইজেনস্টাইনের।

আলেকজান্দারের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো বরফের ওপর। টিউটনিক নাইটদের দুর্ভেদ্য বাহিনীর কাছে মারাত্মক হয়ে উঠলো নেভস্কির যুদ্ধ পরিকল্পনা। 'সাঁড়াশি অভিযান' এ যুদ্ধের রণনীতির অন্যতম হাতিয়ার। শত্রুর বাহিনীকে

ঘিরে ফেলে এই 'সাঁড়াশি অভিযান'। এই যুদ্ধের রণনীতির পরিকল্পনায় আলেকজান্দার নেভ্‌স্কি এক প্রতিভাবান আবিষ্কারক।
অতীত ইতিহাসে এই 'সাঁড়াশি' ছিলো হ্যানিবলের (Hannibal) গৌরব। আবার স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে এই রণনীতি অমিতবিক্রমে প্রয়োগ করেছিলো লালফৌজ।
চলচ্চিত্রে কোনটা দেখানো হবে, আইজেনস্টাইন সেটা আগেভাগেই দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমস্ত নাট্যকার বা সাহিত্যিকের একটা গুরুতর সমস্যা হলো—কোনো সূত্র ধরে কাহিনীর চরিত্রেরা প্রস্ফুটিত হবে, না কি চরিত্রের প্রয়োজনে কাহিনী এগোবে? আগেভাগে একটা সূত্র পেয়ে গেলে কাহিনীর চরিত্রচিত্রণ নিঃসন্দেহে অনেক সহজ হয়ে যায়। এমন একটা সূত্রের সন্ধান যে 'আলেকজান্দার নেভ্‌স্কি' চলচ্চিত্রে পাওয়া যায় নি, তা নয়। কিন্তু সেই সূত্র ধরে এগোনোর অনেক বাধা।
কাহিনীর কাঠামো থেকেই দৃশ্যের জন্ম হতে শুরু করে, সমস্ত সূত্রকে এড়িয়ে। এমনি করেই চরিত্রগুলির বিভিন্ন ভাবমূর্তি তৈরি হয়। আইজেনস্টাইনদের কোনো বিকল্প ছিলো না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নামতেই হলো। তাঁরা তাঁদের মগজের মধ্যে খুঁজতে আরম্ভ করলেন, ঘাঁটতে আরম্ভ করলেন, কঠিন এক সমস্যার সমাধান।
যুদ্ধের আগে আলেকজান্দার ঠিক কি দেখেছিলো? আইজেনস্টাইনদের কাছে যুদ্ধের পরিকল্পনাটি জানা। রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শত্রুসৈন্য গজালের মতো ঢুকে আটকে গেলো। রুশ সৈন্যবাহিনী শত্রুদের ঘিরে ধরলো এবং হত্যা করলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে কায়দায় যুদ্ধটা হয়েছিলো সেটার পরিকল্পনা কেমন করে আলেকজান্দারের মাথায় এলো।
পাভলেঙ্কো তৎক্ষণাৎ চিত্রনাট্যের দৃশ্য পরিকল্পনা করছিলেন—রাত্রি. ক্যাম্পের আগুন, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান করার জন্য আইজেনস্টাইনের চোখে ঘুম ছিলো না।
হয়তো আলেকজান্দার হ্রদের ওপর জমা পাতলা বরফের আস্তরণের কথা ভেবেছিলেন। ভেবে পাচ্ছিলেন না, আকস্মিক কোনো ঘটনার সূত্র ধরে বরফের ওপর যুদ্ধের পরিকল্পনা মাথায় আসতে পারে।
রাত্রে আইজেনস্টাইনের মাথায় শুধু সেই চিন্তা, তাই তাঁর ঘুম আসে না। মনটাকে যা হোক কিছু দিয়ে ব্যস্ত রাখতে আইজেনস্টাইন রুশ লোককাহিনীর একটি বই খুললেন।
প্রথম গল্পটিই হলো 'খরগোস ও পাতিশেয়াল'। এক আশ্চর্য আকস্মিক যোগাযোগ। এই গল্পটি তো আইজেনস্টাইনের প্রিয় কাহিনীর একটি। একে কি ভোলা যায়? বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন তিনি, ছুটে গেলেন
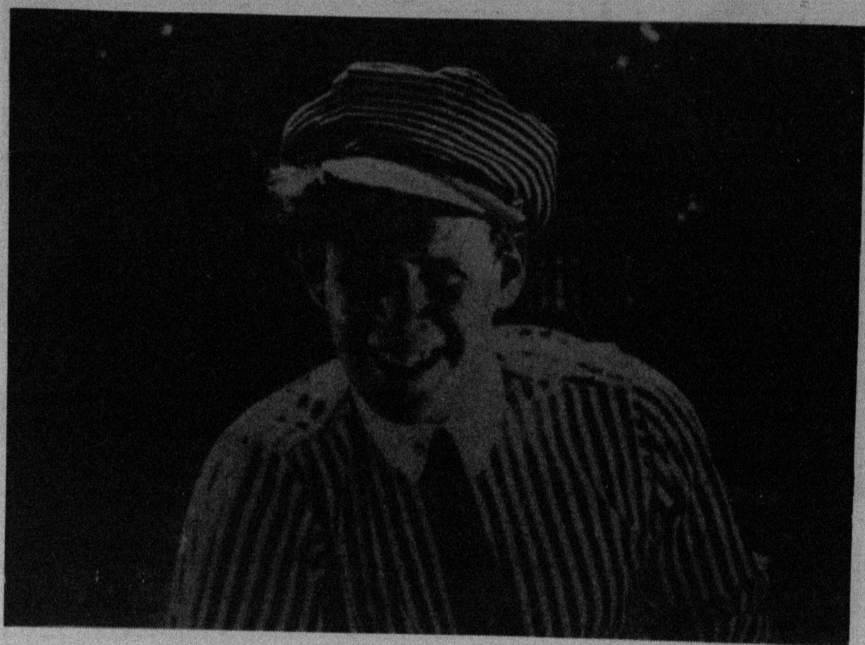
আইজেনস্টাইন (১৯২১)
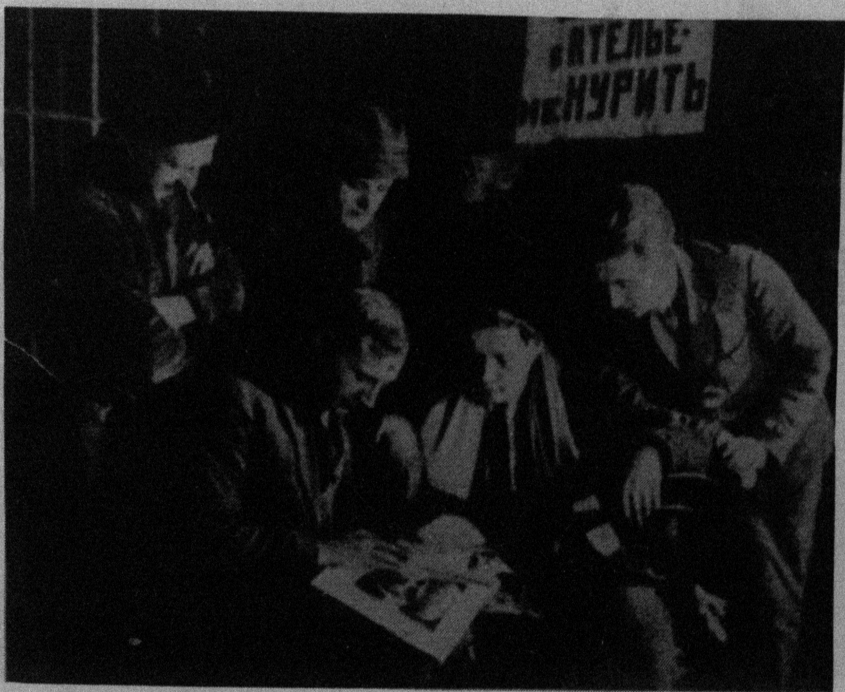
'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রের কাজে টিসে, আইজেনস্টাইন ও আলেকজান্দ্রভ

'অক্টোবর' চলচ্চিত্রের কলাকুশলীবৃন্দ
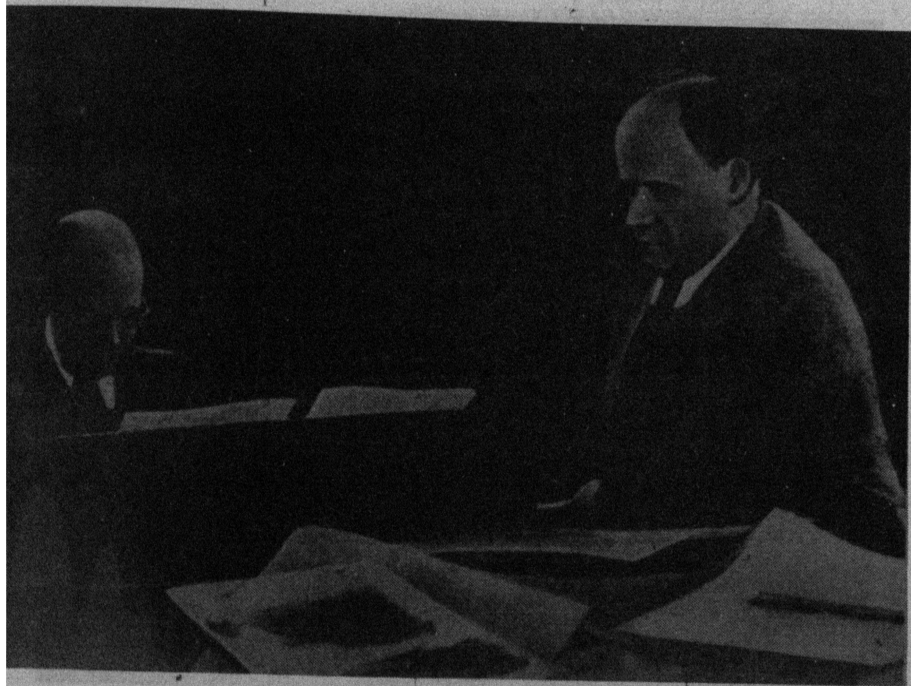
'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্‌' চলচ্চিত্রের সঙ্গীত সৃষ্টির সময় প্রকোফিয়েভ ও আইজেনস্টাইন

টেলিফোনের দিকে। উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন—'আমি পেয়েছি!' 'খরগোস আর পাতিশেয়াল' গল্প—খরগোসের পেছনে পাতিশেয়াল তাড়া করে, নিজেই আটকে গেছে ফাঁদে পড়ার মতো।

আইজেনস্টাইন আধ ঘন্টা কাজ করার পর, ওই কাহিনীটা চিত্রনাট্যের মধ্যে রূপ পেলো—ইগ্‌নাতের বলা কাহিনী হিসেবে। চলচ্চিত্রে সৈন্যরা শিবিরের আগুনের চারপাশে বসে গল্প শুনছে! ইগনাৎ তাদের গল্প বলছে।

তাড়া খেয়ে খরগোসটা বেহড়ে লাফিয়ে পড়লো, পেছন পেছন পাতিশেয়ালটাও তাই করলো। খরগোস যেখানেই ছোটে পাতিশেয়াল তার পেছনে তাড়া করে। তারপর খরগোসটা দুটো বার্চ গাছের ছোট্টো ফাঁক দিয়ে দৌড়ে পালালো, আর তাকে তাড়া করতে গিয়ে পাতিশেয়ালটা গেলো গাছ দুটোর ঐ ছোট্টো ফাঁকে আটকে। যত প্রাণপণেই নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করুক না কেন, পাতিশেয়ালটা ওখানে আটকেই রইলো। খরগোসটা পেছন থেকে বেরিয়ে এসে পাতিশেয়ালকে বললো, 'তাহলে বিদায়, শ্রীমতী পাতিশেয়াল!'

গল্পের এ অংশটি শুনে সৈন্যরা হাসিতে ফেটে পড়লো। ইগ্নাতের গল্প বলা তখনো চলছে—"কাতর হয়ে পাতিশেয়াল বললো—'বন্ধু, যেও না। আমি লজ্জায় মরে যাবো। দয়া করো।' খরগোসটা উত্তর দিলো—'আমার দয়া করার সময় নেই।' তারপর খরগোসটাকে পাতিশেয়াল যে ভয় দেখিয়েছিলো, খরগোসটা পাতিশেয়ালকে ঠিক তাই করলো।"

চলচ্চিত্রে আলেকজান্দার নেভস্কিকে সৈন্যবাহিনীর সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার দৃষ্টান্ত হিসাবে, তাঁকেও ইগ্নাতের গল্পের শ্রোতা হিসাবে দেখানো হয়েছিলো। ইগ্নাতের গল্প শুনে আলেকজান্দার প্রশ্ন করলো—

"তাহলে, পাতিশেয়ালটা ঐ বার্চ গাছদুটোর ফাঁকে আটকেই রইলো?"

বিরাট হাসির রোলের মধ্যে উত্তর এলো—"এবং খরগোসটা তাই করেছিলো, পাতিশেয়ালটা তাকে যে ভয় দেখিয়েছিলো।"

এখানে পাতিশেয়ালের মতো শত্রুটিকে খরগোসটা হত্যা করেছিলো কি না, আইজেনস্টাইন উহ্য রাখলেন। শুধু ইঙ্গিত দিলেন, শত্রু যে ভয় দেখিয়েছিলো, খরগোসটা সেই শাস্তিই দিলো।

লোককাহিনীর নীতিটিকে সুন্দরভাবে একটা রণনীতির সূত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন আইজেনস্টাইন। তাঁর প্রিয় একটি লোককাহিনী 'খরগোস ও পাতিশেয়াল'।

আলেকজান্দার নেভস্কি যেন তাঁর যুদ্ধের সূত্রকে আবিষ্কার করলেন। টিউটনরা এভাবে ঢুকে পড়বে একটি সরু ফাঁদে। তাদেরকে নানাভাবে যুদ্ধের প্রলোভন দেখিয়ে আটকে দেওয়া হবে সেই ফাঁদে। আর পিছন থেকে কৃষক সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করবে।

আলেকজান্দার বললেন—"আমরা বরফের ওপর যুদ্ধ করবো।"
ঠিক হলো, গ্যাব্রিলো আর বুস্লাই দুটি বাহিনীতে থাকবেন পরিচালনার জন্য। অবশ্যই গ্যাব্রিলোর বাহিনীর মূল পরিচালক আলেকজান্দার স্বয়ং। সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আলেকজান্দার উঠে পড়লেন।
ছোটখাটো প্রতীক বা সাংকেতিক দৃশ্যের পরিবর্তে, এরকম একটা সমাধান নিয়ে আইজেনস্টাইন কাজ শুরু করলেন। ধ্যানস্থ হয়ে চিন্তা করার সময় নেই। হাতে সময় খুব কম। তাই, তিনি প্রথমে সিদ্ধান্ত করলেন, সাজসজ্জার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।
দর্শকদের কাছে দৃশ্যাবলীর যথার্থ আবেদনের জন্য দরকার যথাযথ সাজসজ্জা। যেমন, কৃষক সৈন্যরা মাথায় পরবে খরগোসের চামড়ার বিরাট টুপি। যুদ্ধের দৃশ্যের সাথে সাজসজ্জাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
এর সাথে শুরু হলো যথাযথ অভিনেতা খোঁজা। যেমন, কে ভালো গল্প বলতে পারে? ইগ্নাতের চরিত্র সে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। এমন একটি চরিত্র যার মধ্যে থাকবে রাশিয়ার কৃষক, শ্রমিক বা হস্তশিল্পীর বৈশিষ্ট্য, অথচ যে সবথেকে সুন্দরভাবে তার সাদামাটা বাহিনীর নীতিকথা পেঁছে দেবে। ইগ্নাতের চরিত্র ছিলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাশিয়ার মানুষের সাদামাটা মনের মধ্যে সে জাগিয়ে তুলবে দেশপ্রেমের অনুভূতি।
ইগ্নাৎ সৈন্যদের লোককাহিনী বলেছিলো। আবার ইগ্নাৎ ছিলো অস্ত্রভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ও কারিগর। তার মধ্যে ছিলো চিরায়ত গ্রাম্য সরলতা, কিন্তু দেশপ্রেমের জ্বলন্ত তাগিদ। তাই, যখন, একের পর এক অস্ত্র সে ভাণ্ডার থেকে সৈন্যদের হাতে তুলে দিচ্ছে, তখন তার নিজের জন্য একটা অস্ত্রও অবশিষ্ট থাকে নি।
রুশ একটা প্রবচন আছে—"যে জুতো তৈরি করে, তারই জুতো জোটে না।" ইগ্নাৎ যেন সেই প্রবচনের দৃষ্টান্ত।
দিবারাত্র নভোগরদের অস্ত্রশালার জন্য অস্ত্র তৈরি হতো। ইগ্নাৎ তার ভাণ্ডারী। তার মুখে লেগে থাকতো প্রচলিত প্রবাদ ও প্রবচন। এমনই একটা চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্য আইজেনস্টাইন অভিনেতা খুঁজছিলেন এবং সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় এমন একজনকে খুঁজেও পাওয়া গেলো।
দ্মিত্রি নিকোলাইয়েভিচ্ ওর্লভ্ (Dmitri Nicolayevich Orlov) এমনই একজন মানুষ। ওর্লভ্‌কে লোকে চিনতো তাঁর গল্প বলার ক্ষমতার জন্য। ইগ্নাতের ভূমিকায় একেবারে যথাযথ উপযুক্ত ছিলেন ওর্লভ্। কাজেই, ইগ্নাতের মুখ দিয়ে-ঠিক রুশ দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষের কথা বেরিয়ে এলো।

কিন্তু দর্শকদের সহানুভূতিকে জাগাতে গেলে, রুশ জনতার কোনো প্রিয়জন বা বীরকে হত্যা করতে হবে। আর এই নাটকীয়তার জন্য শত্রুর প্রতি দর্শকদের তীব্র ঘৃণা জেগে উঠবে।
ইগ্নাৎ সব অস্ত্র দিয়ে দিয়েছিলো সৈন্যবাহিনীর হাতে। নিজের জন্য শুধু একটা বর্ম ছিলো তার। সে বর্মটাও ছিলো ছোটো। আর সব মিলিয়েই এই ছোটো বর্ম পরিহিত ইগ্নাতের চেহারাটা আপাতভাবে খানিকটা মজার ছিলো।
"বর্মটা খানিকটা ছোটো!"
এই কথাটা কিন্তু অবশেষে খুব মজার রইলো না। এই ছোটো বর্মটাই আইজেনস্টাইনের চিন্তার মধ্যে কোনো চরিত্রকে চলচ্চিত্রে হত্যা করার পথ বাৎলে দিলো। এই ছোটো বর্ম শুধু যে নিচের দিকে খাটো তাই নয়, ঘাড়ের দিকেও খাটো। তাই হত্যাকারীর ছোরা সুযোগ পেলো খাটো বর্মের ওপরে কোনো বীর চরিত্রের গলায় বসে যাওয়ার।
কিন্তু হত্যাকারী কাকে করা যেতে পারে? তার জন্য চলচ্চিত্রে ঠিক করা হলো এক বিশ্বাসঘাতক চরিত্র ৎভেদিলা (Tverdila)। তারই হাতে নিহত হলো এক দেশপ্রেমিক।
ইগ্নাতের ভূমিকায় ওর্লভ্ অবিরাম সক্রিয়। তাঁর মুখে অজস্র প্রবাদ ও প্রবচন। প্রবচনের তালিকা বেড়েই চললো, ওর্লভের সংযোজনে। কোথায় যেন শুনেছেন তিনি এই প্রবচন, ঐ প্রবচন। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো হয়তো আর একটা। আবার সেটা ঠিক যুৎসই করে ব্যবহার করার যথাযথ জায়গাও ঠিক করতেন তিনি। এমনি করেই ইগ্নাতের চরিত্র গড়ে উঠলো, দর্শকদের প্রিয় দেশপ্রেমিক হিসাবে।
কিন্তু হাতে অল্প সময়ের কারণে 'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' চলচ্চিত্র নির্মাণে অবিশ্বাস্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন সঙ্গীতস্রষ্টা সের্গেই প্রকোফিয়েভ্। তাঁর ভূমিকা ও সৃষ্টি, আইজেনস্টাইনের জীবনের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র থেকে শেষদিন পর্যন্ত অবিস্মরণীয়ভাবে বিস্তৃত।

সঙ্গীতস্রষ্টা প্রকোফিয়েভ্

সের্গেই প্রকোফিয়েভের জন্ম ১৮৯১ সালে। রাশিয়ার অনেক বিস্ময়কর শিল্পস্রষ্টার মতই তিনি খানিকটা অকালেই ১৯৫৩ সালে প্রয়াত হন।
সঙ্গীতসৃষ্টির ক্ষেত্রে সের্গেই প্রকোফিয়েভ্ এক বিস্ময়। মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি অপেরা, সোনাটা আর পিয়ানো সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন।
তাঁর সারাজীবনে সিম্ফনি রচনার সংখ্যা সাত আর রয়েছে অসাধারণ কিছু অপেরা ও ব্যালে।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে ১৯১৮ সালে প্রকোফিয়েভ্ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে এবং প্যারিসে তিনি ছিলেন প্রায় পনেরো বছর। তারপর ১৯৩৩ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় ফিরে আসেন প্রকোফিয়েভ্। জন্ম নেয় সোভিয়েত রাশিয়ার অবিস্মরণীয় কিছু সঙ্গীত।

সের্গেই প্রকোফিয়েভ্, আইজেনস্টাইনের সঙ্গে 'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' চলচ্চিত্রে কাজ করার আগে সৃষ্টি করেছেন 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট্' (১৯৩৫—৩৬) ব্যালে সঙ্গীত। আবার আইজেনস্টাইনের প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের সাথে কাজ করার পরে, প্রকোফিয়েভের অন্যতম সৃষ্টি 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (১৯৪১—৪৩) অপেরা।

প্রকোফিয়েভ্ সম্পর্কে, তাঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে, ১৯৪৬ সালে জীবনের শেষ প্রান্তে আইজেনস্টাইন দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছেন। 'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় প্রকোফিয়েভ্ সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করেন আইজেনস্টাইন। তাই তিনি সেই চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই প্রকোফিয়েভের আশ্চর্য প্রতিভার বর্ণনা করেছেন।

'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' চলচ্চিত্রের নতুন কোনো দৃশ্য, স্টুডিওর ছোটো প্রেক্ষাগৃহে মাঝরাত্রে প্রকোফিয়েভকে দেখিয়ে আইজেনস্টাইন বলতেন—"দুপুর বারোটার মধ্যে এর সঙ্গীত প্রস্তুত করতে হবে।" তাঁরা বেরিয়ে আসতেন প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে। ধীর প্রশান্ত থাকতেন আইজেনস্টাইন।

আইজেনস্টাইন জানতেন দুপুর বারোটা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে একটি ছোটো গাঢ় নীল রঙের গাড়ি করে প্রকোফিয়েভ্ স্টুডিওতে এসে পোঁছবেন, হাতে থাকবে 'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' চলচ্চিত্রের নতুন দৃশ্যের জন্য নতুন সঙ্গীত।

এই হলেন সের্গেই প্রকোফিয়েভ্। তিনি কাজ করতেন ঘড়ির মতো, যে ঘড়ি পিছিয়ে বা এগিয়ে চলে না সময়ের থেকে। নিখুঁত সময়ের লক্ষ্যে তাঁর কাজ। নিখুঁতভাবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করাটা প্রকোফিয়েভের কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের অভ্যাস নয়। তাঁর নিখুঁত সময়ের কাজটা আসত নিখুঁত সৃষ্টির অভ্যাস থেকে। একেবারে গাণিতিক হিসাবে তাঁর সঙ্গীতের প্রকাশভঙ্গীর বিশুদ্ধতা।

অনেককেই স্বীকৃতির জন্যে একশত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু প্রকোফিয়েভ্ সেখানে ভাগ্যবান। তাঁকে শত বছর অপেক্ষা করতে হয়নি স্বীকৃতির জন্যে। ইতিমধ্যেই তিনি স্বদেশে ও বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছেন সঙ্গীতসৃষ্টির জন্য।

চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত হয়ে প্রকোফিয়েভের খ্যাতি আরও বিস্তৃত হয়েছে। এর কারণ কিন্তু এই নয় যে, চলচ্চিত্র নিজেই একটা জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে

স্বীকৃত বা চলচ্চিত্রের কাহিনী খুব জনপ্রিয় বা চলচ্চিত্রটির অনেক কপি প্রচার পেয়েছে।

বস্তুত, প্রকোফিয়েভের সৃষ্টি ছিলো এমন ঘটনা, যেটি তাঁর নিজস্বতার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলো। সমগ্র চলচ্চিত্র প্রক্রিয়ায়, সমস্ত অংশের আকার আকৃতির পেছনে তাঁর শিল্পকলা কাজ করেছে। চলচ্চিত্র শুরু হয় ক্যামেরায় দৃশ্যগ্রহণ থেকে, তারপর প্রদর্শিত হয় চলচ্চিত্র হিসাবে যন্ত্র দিয়ে। পর্দায় সেটা একটা নতুন যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রথম থেকে শেষ পর্যায়টুকুর মধ্যে আরও কিছুর সুসংহত বাঁধুনি, তৈরি করে চলচ্চিত্রের ছন্দোবদ্ধ অনুভূতি। আর ঠিক এমনি একটি ছন্দের উপকরণের সজ্জা, প্রকোফিয়েভের সুরসৃষ্টিতে।

চলচ্চিত্রের দৃশ্য, মন্তাজের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বিতর্কাতীত বিশারদ আইজেনস্টাইন কিন্তু সুরের অভ্যুত্থান আর সাঙ্গীতিক অবয়বের জন্মের রহস্য সম্পর্কে অপরিসীম বিস্মিত ও কৌতূহলী।

আইজেনস্টাইনের নিজের ধারণায়, একটা সুর বাইরে থেকে, লোক-সঙ্গীত থেকে ধার করা হয়েছে, না কি নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে বা আবিষ্কার করা হয়েছে, সঙ্গীতের জন্মে তাতে কিছু এসে যায় না। সঙ্গীতশিল্পীর অন্তরে প্রকাশের যে সৃষ্টিশীলতা, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরকে তিনি বেছে নেন। আর এই বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গীতসৃষ্টি করার কোন তফাৎ আইজেনস্টাইন করেননি। তাঁর কাছে বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক শব্দকে চয়ন করে যে সঙ্গীতস্রষ্টা সৃষ্টি করেন এক বিশৃঙ্খলা থেকে সুরের সুশৃঙ্খল মূর্চ্ছনা, সেটাই বিস্ময়ের।

এই বিস্ময়ের আর কৌতূহলের অনুভূতি নিয়ে, আইজেনস্টাইন তাঁর গাড়ি-চালক গ্রিগরি ঝুর্কিন্‌কে (Grigory Zhurkin) প্রশংসাযোগ্য অংশীদার বলে মনে করেন।

ঝুর্কিন চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, প্রদর্শন, মহড়া সবই দেখেছেন। তাই তিনি বলেন—"আমি চলচ্চিত্রের সব কিছুই জানি। আমি সবই দেখছি। শুধু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারি না—সেগেই প্রকোফিয়েভ্‌ কি করে সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন!"

ঠিক এই কথাটাই আইজেনস্টাইনকেও স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। অবশেষে একদিন, কেমন করে প্রকোফিয়েভ্‌ তাঁর সৃষ্টিশীল কাজ করেন, উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন আইজেনস্টাইন। যখন প্রকোফিয়েভ্‌কে তিনি লক্ষ্য করেছেন তখন তাঁর চোখে শুধুমাত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া বড়ো সমস্যা নয়, আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনাও চোখে পড়েছে। এই ছোটো ঘটনাগুলোই দেখিয়ে দেয়, কেমন করে প্রকোফিয়েভের মন সুরসৃষ্টিতে কাজ করে।

আইজেনস্টাইন সেই প্রক্রিয়ার এক অংশে দেখেছিলেন, প্রকোফিয়েভ্‌কে টেলিফোনের নম্বর স্মরণে রাখতে। ঘটনাটি আইজেনস্টাইনকে এমনভাবেই নাড়া দেয় যে, তিনি "টেলিফোন চিনিয়ে দেয়" (The Telephone Betrays) শিরোনামে কিছু নোট লিখে ফেলেছিলেন—১৯৪৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর, রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে। ফিল্ম ওয়ার্কারস্‌ ক্লাবে যাওয়ার আগে লেখাটি শেষ করেছিলেন।

১৯৪৫ সালে নববর্ষ আসতে তখন কয়েক ঘণ্টা বাকি। আইজেনস্টাইন প্রকোফিয়েভ্‌কে শুভ নববর্ষ জানাতে টেলিফোন করলেন।

প্রকোফিয়েভ্‌ তখন সম্প্রতি বাসা বদল করেছেন। তাঁর নতুন টেলিফোন নম্বর 'কে ৫-১০-২৩, এক্সটেনশন ৩৫' আইজেনস্টাইনের মনে ছিলো। আইজেনস্টাইনের স্মরণশক্তি ভালোই। এই নম্বরটি মনে করতে তাঁর টেলিফোনের খাতা খোলার দরকার ছিলো না। যদিও তাঁর একটা ছাই রঙের ছোটো নোটবই ছিলো, টেলিফোন নম্বর টুকে রাখার। আর তিনি সাধারণত টেলিফোন নম্বর মুখস্থ রাখার জন্য মাথার মধ্যে চাপ নিতেন না। কিন্তু প্রকোফিয়েভের টেলিফোন নম্বরটি তাঁর স্মৃতিতে এমন শক্তভাবে রয়ে গেলো কি করে?

একদিন প্রকোফিয়েভ্‌ একটি সাউন্ড বুথে বসে ছিলেন আইজেনস্টাইনের ঠিক পাশেই। সে সময়ে তিনি মোঝাইস্ক হাইওয়েতে একটা নতুন বাসায় এসেছেন। বাসাটিতে গ্যাস আছে, টেলিফোন আছে।

প্রকোফিয়েভ্‌ ঠিক সেই মুহূর্তে আইজেনস্টাইনের 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্‌' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যের সঙ্গীত প্রস্তুত করছিলেন। দৃশ্যটিতে ছিলো অপূর্ব সুন্দর ডাব্‌ল্‌ বেস্‌ বাদ্যের প্রধান সুর আর দৃশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অসাধারণ সঙ্গীতের কাঠামো।

ইতিমধ্যে আইজেনস্টাইনের 'আলেকজান্দার নেভ্‌স্কি' চলচ্চিত্রের সময়ে প্রকোফিয়েভের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই তাঁর জানা ছিলো যে, প্রকোফিয়েভ্‌ দুই তিনবার চলচ্চিত্রের দৃশ্য দেখার পরে, ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গীত প্রস্তুত করতে পারেন পরের দিনই। এখনো এটা একটা ধাঁধা আইজেনস্টাইনের কাছে, কেমন করে এটা সম্ভব?

আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের শেষ সম্পাদিত দৃশ্যের প্রস্তুতির আগেই, প্রকোফিয়েভ ঠিক নিখুঁত দৈর্ঘ্যের বা মাপের সুর সৃষ্টি করে আনতেন। যেন প্রতিটি দৃশ্যের ছন্দ ও যতি প্রকোফিয়েভ আগেভাগেই জানেন। তাই তাঁর সঙ্গীতের জটিল কাঠামো একেবারে নিখুঁতভাবে খাপ খেয়ে যেতো দৃশ্যের সাথে।

সেদিনের কথা—

প্রকোফিয়েভের সঙ্গীতের স্বরলিপি অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্রীরা মহড়া দিচ্ছিলেন। অবশেষে তাঁরা স্বরলিপি যখন রপ্ত করলেন, তখন পরিচালক বা কন্ডাক্টর স্তাসেভিচ্ (Stasevich) প্রস্তুত হলেন রেকর্ডিঙের জন্য। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ভল্স্কি (Volsky) প্রস্তুত হলেন তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে।

সঙ্গীত রেকর্ডিং হলো মোট পাঁচবার। পঞ্চম বারেরটি একেবারে ত্রুটিহীন। কোট ও টুপি পরিহিত উৎসাহী সঙ্গীতস্রষ্টা প্রকোফিয়েভ্ দ্রুত আইজেনস্টাইনের সঙ্গে করমর্দন করলেন। দরজা দিয়ে চলে যাওয়ার আগে তিনি আইজেনস্টাইনকে তাঁর টেলিফোন নম্বরটি বলে গেলেন—"কে ৫-৩০-২০, এক্সটেনশন ৩৫!"

কিন্তু এই টেলিফোন নম্বরের উচ্চারণভঙ্গীর মধ্য দিয়ে আইজেনস্টাইন যেন প্রকোফিয়েভের সৃষ্টি করার ক্ষমতার রহস্য ভেদ করলেন। সেই নম্বরটি প্রকোফিয়েভ্ কিভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, তা দেখাতে গিয়ে আইজেনস্টাইন লিখেছেন—"কে! ৫! ১০!! ২০!!! এক্সটেনশন ৩০!!!! ৫!" (K. 5 ! 10 !! 20 !!! extension 30 !!!! 5)।

যে কেউ আইজেনস্টাইনকে প্রশ্ন করতে পারেন, এই টেলিফোন নম্বর উচ্চারণের মধ্যে সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার এমন কি ইঙ্গিত রয়েছে? আইজেনস্টাইন নিজেই সেটা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর নিজস্ব পাণ্ডিত্য দিয়ে।

মানুষ কোনো কিছুকে স্মৃতিতে রাখতে পারে অনেক পদ্ধতিতে। যেমন একটি বস্তুর সাথে আরেকটি বস্তুর সম্পর্ক (association)। আবার কোনো বস্তুর কাঠামো (composition) স্মৃতিতে ধরে রাখার পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু, কে কিভাবে স্মৃতিতে কোনো বস্তুকে ধরে রাখছে, সেটা জেনে তার মানসিক প্রক্রিয়া কখনো কখনো বোঝা যায় বা অনুমান করা যায়। প্রকোফিয়েভের স্মৃতির কৌশলটি থেকে আইজেনস্টাইন আন্দাজ করতে চেষ্টা করেছেন মানসিক প্রক্রিয়াকে।

আইজেনস্টাইন মনে করেছেন যে প্রকোফিয়েভ্ টেলিফোন নম্বরটা সম্পর্কে কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, ৫, ১০, ২০, ৩০—এই সংখ্যাগুলি একটি সুশৃঙ্খল ক্রমে সজ্জিত। এই গাণিতিক ক্রমটি খুব সাধারণ প্রচলিত সূত্র ধরেই মনে রাখা যায়।

কিন্তু প্রকোফিয়েভ্ এই সংখ্যাগুলির ক্রমটিকে স্মরণে রেখেছেন, এর সাথে খানিকটা আবেগ মিশিয়ে।

অনেক সঙ্গীতজ্ঞরা টেলিফোন নম্বর মনে রাখেন সংখ্যার ছন্দ দিয়ে। আইজেনস্টাইন এমন সঙ্গীতজ্ঞকে দেখেছেন, যিনি সুর মনে রাখেন দাঁড়িতে গিঁট বেঁধে রেখে। কেউ কেউ কোনো সংখ্যাকে বা কথাকে মনে রাখেন ধাপে ধাপে কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তুলে। কিন্তু এগুলোর কোনোটাই প্রকোফিয়েভ্ করেননি। টেলিফোন নম্বরটির উচ্চারণের মধ্যে ধরা পড়েছিলো প্রকোফিয়েভের

ক্রমবর্দ্ধমান আনন্দ, ৫ ! ১০ !! ২০ !!! ৩০ !!!! যেন প্রকোফিয়েভ্ হাজার হাজার টাকা জিতেছেন। এই আনন্দের কণ্ঠস্বর হয়তো প্রকোফিয়েভের বহু বছর হোটেলে কাটানোর পর একটা বাসা পাওয়ার আনন্দেরই প্রকাশ।

একটা টেলিফোন নম্বর সম্পর্কে এতোখানি বর্ণনা আইজেনস্টাইন দিয়েছেন, প্রকোফিয়েভের ধ্বনি সম্পর্কে সুশৃংখল মানসিক প্রক্রিয়াকে বোঝাতে। একটি চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলীর মন্তাজের গাঁথুনির সাথে, নিখুঁত গাণিতিক শৃংখলায়, সঙ্গীতসৃষ্টিতে প্রকোফিয়েভ এক আশ্চর্য সফল কারিগর।

এটা যে শুধু একটা যান্ত্রিক কাকতালীয় ব্যাপার ছিলো তা নয়। প্রকোফিয়েভ্ মাত্র যে দুই তিনবার চলচ্চিত্রের দৃশ্য দেখে সঙ্গীত সৃষ্টি করতেন, স্টুডিওর প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে বসে আইজেনস্টাইন তা লক্ষ্য রাখতেন। যদিও অন্ধকার, তবুও পর্দার ছবি থেকে প্রতিফলিত সামান্য আলোয় আইজেনস্টাইন দেখতে পেতেন প্রকোফিয়েভের গতিবিধি।

পর্দায় যখন চলচ্চিত্রের অংশ প্রদর্শিত হতো, প্রকোফিয়েভের চেয়ারের হাতলে রাখা হাতটার আঙুলগুলি নড়াচড়া করে উঠতো, হাতলে তাল ঠুকতো। কিসের তাল ? সেটা এক জটিল ব্যাপার। অবিরাম আঙুল দিয়ে তাল ঠুকে হয়তো প্রকোফিয়েভ্ সম্ভাব্য সুরের ছন্দ-শৃংখলাকে মনের মধ্যে গেঁথে নিতেন। এটা ঠিক নিছক তাল ঠোকা নয়। বরঞ্চ, সঙ্গীতের গাণিতিক হিসাব করা।

হয়তো কোনো দৃশ্যের একটি অপ্রচলিত ও অবাধ্য ছন্দ দেখে প্রকোফিয়েভ্ উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন—"কী দারুণ !"

আইজেনস্টাইনের মনে হতো সেই মুহূর্তে, প্রকোফিয়েভ্ হয়তো গুনগুন করে কোনো সুর ভাঁজছেন। এ সময়ে প্রকোফিয়েভের সাথে কথা বলা বারণ। কারণ তিনি হয় অন্যমনস্ক হয়ে এলোমেলো উত্তর দেবেন, নয়তো প্রশ্নকর্তাকে গালি দিয়ে উঠবেন।

প্রকোফিয়েভ্ তখন নিশ্চয়ই গুনগুন করে দৃশ্যাবলীর সাঙ্গীতিক অনুবাদ করতেন। দৃশ্য ও সুরের একই ছন্দ এবং অন্তর্বস্তু।

পরের দিন যখন প্রকোফিয়েভের সঙ্গীত রচনা এসে পৌঁছতো, তখন দেখা যেতো আগের দিনের ঐ ছন্দের হিসাব আর সুরের গুনগুন থেকে সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ এক সঙ্গীত।

একদিন 'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রের 'নীল, নীল সাগর' গানের মহড়া চলছে। সাগরের দিকে মুক্তি পাচ্ছে এক স্বপ্ন। মহড়ার সময় প্রকোফিয়েভ্ সঙ্গীতদলের পরিচালক।

প্রকোফিয়েভের ছিপছিপে চেহারাটি এপাশ-ওপাশ দুলছিলো, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিলো বাদ্যযন্ত্রীদের ছড় টানার তালে তালে।

প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্র, প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্রের গোষ্ঠী মেলে ধরছিলো সাগরের এক একটি বৈশিষ্ট্য। একসাথে তারা সৃষ্টি করছিলো বিশাল বিস্তৃত সাগরের আশ্চর্য চেহারা, ভেঙে পড়া ঢেউ, উপছে পড়া ফেনা, সূর্যের টুকরো আলোর মধ্যে এক প্রশান্ত নীল, ঠিক যেমনটি রাশিয়ার দেশ-নির্মাতা তাঁর স্বপ্নে দেখেছিলেন।

শিল্পীদের দেখিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে আইজেনস্টাইনের সাথে কথা বলছিলেন প্রকোফিয়েভ্‌—"এই শিল্পী ঢেউয়ের ওপর আলো ভেসে যাওয়া বাজাচ্ছেন। ঐ শিল্পী বাজাচ্ছেন ফুলে ওঠা ঢেউ। এই শিল্পী বাজাচ্ছেন বিশাল বিস্তৃতি। ঐ শিল্পী বাজাচ্ছেন রহস্যময় গভীরতা।"

প্রকোফিয়েভের সঙ্গীতসৃষ্টিতে সাগরের যে নীল রঙ, সেটা শুধু নীল আকাশের রঙের প্রতিফলন নয়, সেটা স্বপ্নের রঙ। তাঁর কাছে সাগরের জলের গভীরতা, জনগণের আত্মার অভ্যন্তরের ক্রিয়াশীল গভীর অনুভূতি। যে অনুভূতি ওই স্বপ্নকে বিস্ময়করভাবে কাজে লাগাবে।

ব্যঞ্জনধ্বনির ওপর প্রকোফিয়েভের আশ্চর্য দুর্বলতা। আইজেনস্টাইনের মনে হয়, প্রকোফিয়েভ্‌ হয়তো শুধু ব্যঞ্জনধ্বনির কাছেই তাঁর কোনো নিবন্ধ উৎসর্গ করতেন, যদি তিনি লিখতেন।

প্রকোফিয়েভের নিজের স্বাক্ষরে থাকতো শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ 'পি-আর-কে-এফ-ভি' (P-R-K-F-V)। স্বরবর্ণ ব্যবহার করতেন না প্রকোফিয়েভ্‌। এটা কি সঙ্গীতস্রষ্টার মানসিক গঠন ?

আইজেনস্টাইন এ প্রসঙ্গে জার্মান সঙ্গীতস্রষ্টা বাখের উদাহরণ টেনেছেন। শোনা যায়, বাখ তাঁর নিজের নামের 'বি-এ--সি-এইচ (B-A-C-H) বর্ণগুলির মধ্যে স্বর্গীয় ধ্বনির সমন্বয় আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই চারটি স্বরকে ব্যবহার করে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রকোফিয়েভ্‌ যেমন কোনো অপেরায় অষ্টাদশ শতকের ইতালির পরিবেশকে সাঙ্গীতিকভাবে সৃষ্টি করতে পারেন, তেমনি পারেন 'আলেকজান্দার নেভ্‌স্কি' চলচ্চিত্রের ত্রয়োদশ শতকের পরিবেশ তৈরি করতে। সেই ত্রয়োদশ শতকের উন্মত্ত হিংস্রতা, প্রকোফিয়েভের সঙ্গীতে ছন্দোবদ্ধ হয়। এসব মিলিয়েই প্রকোফিয়েভ্‌ আন্তর্জাতিক স্রষ্টা।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রকোফিয়েভ্‌ আইজেনস্টাইনের কাছে, রেনেসাঁসের মহৎ শিল্পীর মতো। যেখানে একজন চিত্রকর একই সাথে দার্শনিক, ভাস্কর এবং গণিতজ্ঞ।

আইজেনস্টাইন মনে করেন, প্রকোফিয়েভ্‌ শুধু যে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-স্রষ্টাদের একজন তাইই নয়, তিনি সব থেকে আশ্চর্য চলচ্চিত্রস্রষ্টা।

জীবনের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'আলেকজান্দার নেভ্‌স্কি' তৈরি করতে গিয়ে আইজেনস্টাইন ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এমনই একজন সঙ্গীতস্রষ্টা প্রকোফিয়েভের সাথে।

রজত-জয়ন্তীবর্ষে আলোকচিত্রী টিসে

'আলেকজান্দার নেভ্‌স্কি' চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার কিছু পরেই, আইজেনস্টাইনের চিরসঙ্গী আলোকচিত্রশিল্পী এডোয়ার্ড টিসে বা এদুয়াদ্‌ তিসে (Edward Tisse বা Aduard Tisse) তাঁর কর্মজীবনের পঁচিশ বছর পূর্ণ করলেন।

১৯৩৯ সালে আইজেনস্টাইন এই অসাধারণ সঙ্গী ও আলোকচিত্রীর কর্মজীবনের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি নিবন্ধ লেখেন, যার নামকরণ 'পঁচিশ এবং পনেরো।'

বয়সে টিসে আইজেনস্টাইনের থেকে মাত্র বছর খানেকের বড়ো। কিন্তু কর্মজীবনে তিনি আইজেনস্টাইনের থেকে দশ বছরের জ্যেষ্ঠ। তাই ১৯৩৯ সালে টিসের কর্মজীবন 'পঁচিশ' বছর আর আইজেনস্টাইনের 'পনেরো' বছর।

এই পরমবন্ধুর প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে, আইজেনস্টাইন নিজের কথাই বেশি লিখে ফেলেছেন। নিজেও সেটা বুঝেছিলেন। তাই পাঠককে জানিয়েছেন যে, নিজের যখন কর্মজীবনের রজতজয়ন্তী বর্ষ আসবে, তখন এডোয়ার্ড টিসে আইজেনস্টাইন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নিশ্চয়ই নিজের কথাই বেশি লিখবেন।

যদিও একথা লেখার দশ বছর পরে নিজের কর্মজীবনের রজতজয়ন্তীবর্ষ সম্পর্কে কোনও লেখা দেখার জন্য আইজেনস্টাইন বেঁচে ছিলেন না। তিনি তাঁর কর্মজীবনের রজতজয়ন্তীর ঠিক আগেই মারা যান।

টিসে ক্যামেরা ঘোরাতে শুরু করেছিলেন যে সময়ে, তখন আইজেনস্টাইনের কল্পনাতেও ছিলো না চলচ্চিত্রকার হয়ে ওঠা। যখন তিনি সবেমাত্র চলচ্চিত্র সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করছেন, যেটা নিছক ভালোবাসার থেকে বেশি কিছু নয়, তখন টিসে সক্রিয় আলোকচিত্রশিল্পী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর রুশ বিপ্লবের সময়ে সোভিয়েতের আলোকচিত্র শিল্পীদের মধ্যে এডোয়ার্ড টিসে শ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত। আর সেই ঘটনাবলী টিসের জীবনের পথ ঠিক করে দিয়েছিলো। আর আইজেনস্টাইনের নিজের জীবনের গতি বদলে গিয়েছিলো রাশিয়ার বিপ্লব আর গৃহযুদ্ধে।

ঘটনার আবর্তে আইজেনস্টাইন একদিন ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে চলে আসেন নাটকে, তারপর নাটক থেকে চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্র নিয়ে পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে গিয়ে তিনি পরিচিত হন সে সময়কার এই শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী টিসের সাথে।

বা, আইজেনস্টাইনের নিজের ভাষায়—তিনি মারাত্মকভাবে ছিটকে এসে পড়েন এমন একজনের হাতে যাঁর মেজাজ গরম, যিনি তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ছুটেছেন গৃহযুদ্ধের সমস্ত ফ্রন্টে, আর কারখানা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জায়গায় জায়গায়, অবশেষে যা জনগণের সম্পত্তি হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে।
এই মেজাজের অধিকারী মানুষটি কিন্তু বিস্ময়করভাবে শান্ত ও লাজুক তরুণ এডোয়ার্ড টিসে। মাথায় টুপি নেই, পরণে সাদা কাপড়ের কোট।
'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য নিয়ে আইজেনস্টাইন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন চিত্রগ্রহণের জন্য ক্যামেরাম্যান বা আলোকচিত্রশিল্পী। নিজে তখন ব্যস্ত রয়েছেন সার্কাস, শারীরিক কসরৎ মেশানো নাটক নিয়ে।

ফিল্ম স্টুডিওর এক ম্যানেজার বরিস মিখিন্ (Boris Mikhin) ঠিক করে দিয়েছিলেন এডোয়ার্ড টিসেকে, আইজেনস্টাইনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হিসাবে।
বরিসের মতে—"তোমার থিয়েটার কসরৎপূর্ণ। আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তুমি চলচ্চিত্রেও কৌশলের চমক দেখাবে। এদুয়ার্দের চমৎকার কাজকর্ম করার অভিজ্ঞতা রয়েছে সংবাদ চলচ্চিত্রে, আর সে নিজে ভালো খেলোয়াড়। আমি নিশ্চিত যে তোমরা দুজন একসাথে চমৎকার কাজ করবে।"
মিখিনের দূরদৃষ্টি সত্য হলো। আইজেনস্টাইন ও টিসে, ১৯৩৯ সালে তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব একটানা ১৫ বছর ধরে অটুট রাখলেন।
টিসের সাথে আইজেনস্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎ, তাঁদের থিয়েটার যেখানে ছিলো সেই বাড়ির ছোট্টো বাগানে। প্রথমদিন কথাবার্তা খুব কমই হয়েছিলো। আইজেনস্টাইনের হাতে ছিলো 'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রের প্রথম খসড়া। খসড়াটিতে আইজেনস্টাইন 'ফেড-ইন ওভার ফেড-ইন' কথা কটি লিখেছেন দেখে টিসে এটি ব্যাখ্যা করে বলেন যে কথাটি হবে 'ডাবল্ এক্সপোজার'।
সেই সন্ধ্যায় আইজেনস্টাইন কি ধরনের পরিচালক দেখার জন্য টিসে তাঁর সাথে থিয়েটারে গেলেন। আইজেনস্টাইনের ভাষায়—"এই থিয়েটার দেখতে আসায় টিসের প্রায় জীবনটাই খরচ হয়ে গেলো।"
অস্ত্রোভ্স্কির 'ওয়াইজ ম্যান' নাটকটি তখন আইজেনস্টাইনরা মঞ্চস্থ করছেন। দড়ির ওপর কসরৎ দেখানোর কথা আলেকজান্দ্রভের, যাঁর তখন পেশাদার নাম মর্মোনেনকো (Mormonenko)।
ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই দড়ি ছিঁড়ে গেলো আর ভারি ধাতব মঞ্চটি, যার সাথে দড়িটি বাঁধা ছিলো, সশব্দে নীচে ভেঙে পড়লো, এসে পড়লো একেবারে এডোয়ার্ড টিসের গা ঘেঁষে। টিসের ঠিক পাশের চেয়ারটার ওপর মঞ্চটা পড়া মাত্রই টুকরো টুকরো হয়ে গেলো চেয়ারটা। একটুর জন্য সেদিন বেঁচে গেলেন ভবিষ্যতের আলোকচিত্রী এডোয়ার্ড টিসে।
সেদিনই আইজেনস্টাইন প্রথম দেখলেন টিসে কতোখানি অচঞ্চল এবং ধীর।

তার পরবর্তী পনেরো বছর ধরে একসাথে কাজ করে আইজেনস্টাইন দেখেছেন, অনেক দুর্যোগের সময়েও টিসে ধীর, স্থির, প্রশান্ত।

খুব দ্রুত বাস্তব ঘটনাকে বুঝতে পারতেন টিসে, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়ার জন্য ধৈর্য ও স্থৈর্য বজায় রাখতে পারতেন।

হিমশৈল এবং বালিতে, উত্তরের কুয়াশায় এবং উষ্ণ অঞ্চলে, মেক্সিকোর ষাঁড়ের লড়াইয়ের প্রাঙ্গনে, ঝোড়ো সাগরে টিসে ছিলেন অতুলনীয় পরিশ্রমী। এই প্রত্যেক জায়গায় তিনি কৃষক বা খনিশ্রমিক, কোনো মানুষের থেকেই কম যেতেন না।

টিসে তাঁর তীক্ষ্ম নীল চোখ আর হাড় বার-করা বিশাল হাত দিয়ে শিল্পকলার সূক্ষ্মতম স্রষ্টাদের মতো শিল্পসৃষ্টি করতেন। তাঁর মধ্যে ছিলো নিখুঁত ও সূক্ষ্ম মানসিক হাতিয়ার এবং নিজের ভাবনাকে রূপ দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা।

আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র নিয়ে কতোটুকু আর কথা বলেছেন টিসের সাথে। প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই এ অভ্যাসটাই দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো। টিসেকে দেখলে প্রশ্ন জাগে—কোনো মানুষ কি চোখ দিয়ে কোনো আলোচনা করতে পারে? কোনো মানুষ কি তাঁর হৃদপিণ্ডকে বলতে পারে, ছন্দোবদ্ধভাবে চলতে?

টিসে এবং আইজেনস্টাইনের মধ্যে দেখা, অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার যে ঐক্য ছিলো—আইজেনস্টাইনের মতে সারা বিশ্বে তার কোনো তুলনা নেই।

এতো ঘনিষ্ঠতা থাকলেও, আইজেনস্টাইন ও টিসে কখনো পরস্পরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করার বদলে 'তুই' বলে ডাকতেন না। পরস্পরকে 'তুই' সম্বোধন করলে, নিজেদের মধ্যেকার গভীর হৃদ্যতাকে ব্যঙ্গ করা হতো।

আইজেনস্টাইন ও টিসের মধ্যে হৃদ্যতা ছিলো ভেতরের গভীর হৃদ্যতা। আর এই হৃদ্যতা তাঁদের উভয়কে বিপরীত মতামত বা দৃষ্টিকোণ থেকে—ঠিক একই বিন্দুতে নিয়ে আসতো। একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যকে দুজনে দু'টি কোণ থেকে খুঁজতে শুরু করলে, এসে পৌঁছতেন একই দৃশ্যে—চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে একই দৃশ্য গ্রহণ করতেন।

এই গভীর হৃদ্যতার জন্যে, উভয়েই কোনো দৃশ্যের ফ্রেম করতেন ঠিক একই রকম। দেখা যেতো পরিচালক আইজেনস্টাইন এবং আলোকচিত্রী টিসের ফ্রেমের মাপ ঠিক একই।

এই সৃষ্টিশীল গভীর হৃদ্যতা উভয়ের মধ্যে তৈরি করেছিলো চলচ্চিত্রের সব থেকে মূল্যবান দৃশ্যগ্রহণের পদ্ধতি। সমুদ্রের জাহাজ, প্রাক্-বিপ্লব কারখানা, কৃষিক্ষেত্র, কাক্তে, ফণিমনসা গাছ, ত্রয়োদশ শতকের বরফ-ঢাকা হ্রদ—যে দৃশ্যই তুলতে চান না কেন, আইজেনস্টাইন ও টিসে একইভাবে সেটা করতেন। যে

ফ্রেমটি উভয়ে ঠিক করতেন, সেটা কোনো সময় অনুমাননির্ভর নয়। কখনো কোনো ভুল কোণ থেকেও দৃশ্যগ্রহণ করা হতো না।

উভয়ের ঐক্যবদ্ধ চিন্তায় প্রত্যেকটি দৃশ্য গ্রহণ করা হতো সব থেকে সম্ভাব্য প্রকাশভঙ্গীতে। ওঁরা দুজন প্রত্যেক ক্ষেত্রে খুঁজে বেড়াতেন নিছক দৃশ্য দেখানোর পরিবর্তে, একটি দৃশ্যের সাধারণীকৃত প্রকাশ।

এটা করতে গিয়ে দুই বন্ধুকে যে কতো রকম ক্যামেরার কোণ, অবস্থান ইত্যাদি খুঁজতে হয়েছে! নিজেদের কাছে যতো রকম লেন্স আর ফিল্টার থাকতো তা ব্যবহার করে দেখতে হতো, সব থেকে উপযুক্ত দৃশ্যগ্রহণ কি ভাবে করা যায়। এখানে ওখানে ক্যামেরা নাড়াতে হতো, সরাতে হতো বারবার।

শ্রেষ্ঠ শট্‌টি নিতে, টিসে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি হিসাব করতেন, চলচ্চিত্রের দৃশ্যের বক্তব্য অনুযায়ী।

নিজেদের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে কখনো আইজেনস্টাইন ও টিসে বিবৃতি প্রকাশ করেননি। উভয়ে কখনো রাতের পর রাত অসংখ্য সিগারেট ধ্বংস করে করে, জেগে থাকেননি। কিন্তু বছরের পর বছর তাঁরা দু'জনে একসাথে কাজ করেছেন। সেই উপযুক্ত দৃশ্য উপকরণ অনুসন্ধানে। সফলতার মাপকাঠিতে সেই অনুসন্ধান সুফল দিয়েছে।

অবশেষে, 'আলেকজান্দার নেভস্কি' চলচ্চিত্রে এই প্রথম তাঁরা দৃশ্যের উপস্থাপনের সাথে সংগীতের সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটাতে পারলেন। এই চলচ্চিত্রে উপস্থাপন ও দৃশ্যের সংগীতে আবেগের সাথে সমন্বয় ঘটেছিলো, প্রকোফিয়েভের অত্যন্ত আবেগপূর্ণ সংগীতের। বহু বছর ধরে আইজেনস্টাইন এমন একটি উপস্থাপন, দৃশ্য আর সচেতন প্রকৃতি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

প্রকোফিয়েভের সাথে আইজেনস্টাইন ও টিসের সাক্ষাৎ ঠিক, আইজেনস্টাইন ও টিসের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের মতো সৃষ্টিশীল আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলো। এ'রা দু'জন সবাক চলচ্চিত্রকে জয় করার অভিযানে প্রকোফিয়েভের মতো বন্ধু চাইছিলেন।

১৯৩৯ সালে টিসের কর্মজীবনের রজতজয়ন্তী বর্ষে আইজেনস্টাইন আশা করেছিলেন—আরো দশ বছর তাঁদের মধ্যে যেন সৃষ্টিশীল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বজায় রেখে একসাথে কাজ করতে পারেন।

টিসের সাথে সত্যিই বন্ধুত্ব আর একসাথে কাজ করা অটুট ছিলো আইজেনস্টাইনের, কিন্তু দশ বছর পূর্ণ হয়নি।

'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্‌' চলচ্চিত্রে সেই শেষ দশ বছরের শুরু এবং শেষ। আলোকচিত্রীর সাথে পরিচালকের এমন অটুট বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিরল।

ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু

আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ্ পেশ্‌কভ্ (Aleksei Maksimovich Peshkov), যাঁর ছদ্মনাম ম্যাক্সিম গোর্কি (Maxim Gorky), ১৮৬৮ সালে রাশিয়ায় জন্মেছিলেন। গত শতকের শেষে প্রধানত ছোটো গল্পলেখার পর, উপন্যাস ও নাটক লেখায় হাত দেন তিনি। ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লবে অংশ গ্রহণের অভি-যোগে তিনি কারাগারে বন্দী হন এবং বিপ্লবী কাজকর্মের অভিযোগে নির্বাসিত হন। দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়ে অবশেষে রাশিয়ায় ফেরেন গোর্কি।

১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে তিনি শেষ করেন তাঁর যুগান্তকারী আত্মজীবনীর তিনটি পর্ব। তাঁর লেখা 'মা' উপন্যাস সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে অমর আসন দেয়। বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় এই উপন্যাস যেমন অনুবাদ হয়েছে, তেমনি শুধু রাশিয়াতেই অন্তত তিনবার 'মা' উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়। এর মধ্যে পুদভকিনের 'মা' চলচ্চিত্রের পরিচিতি সারা বিশ্বে।

১৯৩১ সালের সময় গোর্কিকে মনে করা হতো রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা প্রয়োগের পথিকৃৎ। সোভিয়েত রাশিয়ায় তাঁর স্বীকৃতি ও সম্মান তখন বিতর্কাতীত। কিন্তু এর মাত্র কয়েক বছর পর, ১৯৩৬ সালে, ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু হয়।

গোর্কির মৃত্যু নিয়ে রাশিয়া তথা সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষের দরদী সাহিত্য জগতে যে গভীর শোক, তারই অংশীদার আইজেনস্টাইন।

গোর্কির মৃত্যুর পরে, ১৯৩৬ সালে আইজেনস্টাইন একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখেন—'মহত্তম সৃষ্টিশীল সততা'। এই নিবন্ধে আইজেনস্টাইনের কলমে ম্যাক্সিম গোর্কি সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রতিফলিত।

গোর্কির জীবনের শেষ বছরগুলিতে আইজেনস্টাইন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেই অভিজ্ঞতা কোনো দিন ভোলা যায় না। আইজেনস্টাইন, গোর্কির মৃত্যুর পর সেই স্মৃতি মন্থন করেন, যার পুনরাবৃত্তি করা যায় না।

আইজেনস্টাইনের কাছে গোর্কির চরিত্রের বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য অবিস্মরণীয়। কতোরকম বিষয়ে আগ্রহ ছিলো গোর্কির। যখন শত্রু বা শয়তানদের সম্বন্ধে কথা বলতেন, তখনও তিনি ছিলেন সুরসিক। জীবন থেকে সার্থকভাবে গোর্কি নিঙড়ে নিয়েছিলেন সব থেকে দামি সারবস্তু।

আইজেনস্টাইনের প্রজন্মের কাছে যেসব মানুষের কাজ চিরায়ত হয়ে গেছে, তাঁদের সম্পর্কে গোর্কি'র ব্যক্তিগত স্মৃতি কী পরিপূর্ণ! লোককথা বা লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে কী আশ্চর্য জ্ঞান গোর্কি'র!

মেহনতী মানুষের সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম গোর্কি এমন অনেক কথা বলেছেন, যা আইজেনস্টাইন কখনো ভোলেননি। কিন্তু লিখতে বসে আইজেন-স্টাইন সৃষ্টিশীল ভাবনার এই মহৎ মানুষটির অত্যাশ্চর্য বিনয়ের কথাই প্রধানত লিখেছেন।

আইজেনস্টাইনের চোখে গোর্কি'র বিনয় কোনো লোক-দেখানো ব্যাপার ছিলো না। এ বিনয় তাঁর জন্মগত। মানুষ, স্রষ্টা ও শিল্পী হিসাবে গোর্কি'র এটা অপরিসীম দামি বৈশিষ্ট্য। তাঁর সৃষ্টিধর্মী সততা আর দায়িত্বজ্ঞানের একান্ত অঙ্গ হলো এই বিনয়।

গোর্কি'র এই বিনয়কে আইজেনস্টাইন তাঁর স্মৃতিতে 'ক্লোজ-আপ' দৃশ্যের মতো ধরে রেখেছেন। গোর্কি'র স্মৃতিকে বোঝাতে গিয়ে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের এই 'ক্লোজ-আপ' ভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

১৯৩২ সালে গোর্কি, গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে আর গৃহহীন শিশুদের পুনঃশিক্ষাদানের বছরগুলিতে শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে 'ডেলিন্‌কোয়েন্টস্‌' (Delinquents) চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের কাজে যুক্ত থাকেন। এ বিষয়ে যে-সব চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিলো, সেগুলো গোর্কি অত্যন্ত অপছন্দ করেছেন।

১৯৩৪ সালে গ্রীষ্মের শুরুতে আইজেনস্টাইন এবং গোর্কি'র ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একসাথে বসে গোর্কি'র মুখ থেকে শিশুদের সম্বন্ধে এই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখার গল্প শুনেছিলেন। গোর্কি চেয়েছিলেন সত্যিকারের কাজ করতে। এই কথাবার্তার মধ্যে থেকে আইজেনস্টাইন এক মুহূর্তে আবিষ্কার করেছিলেন গোর্কি'র অপরিসীম আবেদন।

আইজেনস্টাইনরা তখন তরুণ, অতি উৎসাহী এবং অধীর। তাঁরা গোর্কি'র প্রতিভার গুণমুগ্ধ। এই মহান বিশেষজ্ঞ, আইজেনস্টাইনদের মতো তরুণদের কাছে নিজের নতুন লেখা পড়ে শোনাতে আগ্রহী। এমন কি এই তরুণদের থেকেও তিনি অধিকতর উত্তেজিত। চাপা অথচ গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে পড়তে শুরু করার আগে পাণ্ডুলিপির পাতা ওল্টাচ্ছিলেন গোর্কি। এই বিশ্ববিখ্যাত এবং চিরায়ত সাহিত্যিকের আঙুলগুলো কাঁপছিলো। এই উত্তেজনা প্রমাণ করে, সত্যিকারের মহান শিল্পী তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে কতোখানি দায়িত্বশীল।

আইজেনস্টাইনের মনে হয়েছে, রাশিয়ার যে জনগণের সম্মানে তাঁরা তাঁদের কাজকে উৎসর্গ করে একসাথে ঐতিহাসিক বিজয়ের দিকে এগিয়ে গেছেন, সেটাও বোধহয় যথেষ্ট শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ ছিলো না।

গোর্কি'র কাঁপা আঙুল যে পাণ্ডুলিপির পাতা ধরে ছিলো, সেটা হয়তো

আইজেনস্টাইনকে মনে করিয়ে দেয় যে—একজন শিল্পীর মধ্যে সততা ও বিনয় অবিচ্ছিন্ন।

আইজেনস্টাইনের মনে পড়ে—বিদেশ থেকে যখন গোর্কি ফিরে এলেন স্বদেশে, হাজার হাজার মানুষ বাইলোরুশ স্টেশনে জমায়েত হয়েছিলো গোর্কিকে স্বাগত জানাতে। চোখে জল নিয়ে গোর্কি বলেছিলেন—"আমি বলতে পারি না, আমি লিখবো··· ।"

আইজেনস্টাইন গোর্কিকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর লেখা, গোর্কির সেদিনের বক্তব্যের মতোই সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু গোর্কির সাথে কোনোদিন যে আর আইজেনস্টাইন কথা বলতে পারবেন না। এ বেদনাটা অনুভব করে, গোর্কির মৃত্যুর পরে লেখা ছাড়া আর কিছু করা যায় না।

কিন্তু আইজেনস্টাইনের মনে হয়—গোর্কির রচনাবলীর মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর শত শত বছর ধ্বনিত হবে।

দেখতে দেখতে যুদ্ধের সময় এসে পড়ে। এরই মধ্যে আইজেনস্টাইন রাশিয়ার মানুষের গৌরবময় অতীতের পটভূমিতে বর্তমানের ভূমিকাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি এখন অনেক বেশি সফল ও স্বীকৃত।

পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তিনি অনেক বেশি সম্মানিত। আর আইজেনস্টাইনের কাজে তাই প্রতিফলিত হয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম।

'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রের শুরু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখে 'আলেকজান্দার নেভ্স্কি' চলচ্চিত্রের সফলতার ফল হিসাবে রাশিয়ায় 'মসফিল্ম' আহ্বান জানিয়েছেন নতুন চলচ্চিত্র তৈরি করার।

কিন্তু জার্মান সৈন্যবাহিনী মস্কোয় প্রবেশ করার হুমকি দিল ১৯৪১ সালে। 'মস্ফিল্ম' মধ্য এশিয়া থেকে সরে গেলো। তাদের স্টুডিওর নতুন জায়গা হলো উরালের আল্মা-আতা (Alma-Ata)।

সমস্ত বিশ্বই তখন আতঙ্কিত জার্মানির নাট্সীবাদ আর ইতালির ফ্যাসিবাদের বিভীষিকায়। চিরকাল স্বৈরতন্ত্র ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র তৈরি করে অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত আইজেনস্টাইন এখন শুধুমাত্র একটি সংবাদচিত্রের সঙ্গে কাজ করলেন। মস্কো তখন লড়াই চালাচ্ছে।

জন্ম নিল সংবাদ-চলচ্চিত্র 'মস্কো ফাইটস্ ব্যাক' (Moscow Fights Back)। এর সাথে যুক্ত ছিলেন আইজেনস্টাইন।

আইজেনস্টাইনের পরিকল্পনা ছিলো এবার 'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রের
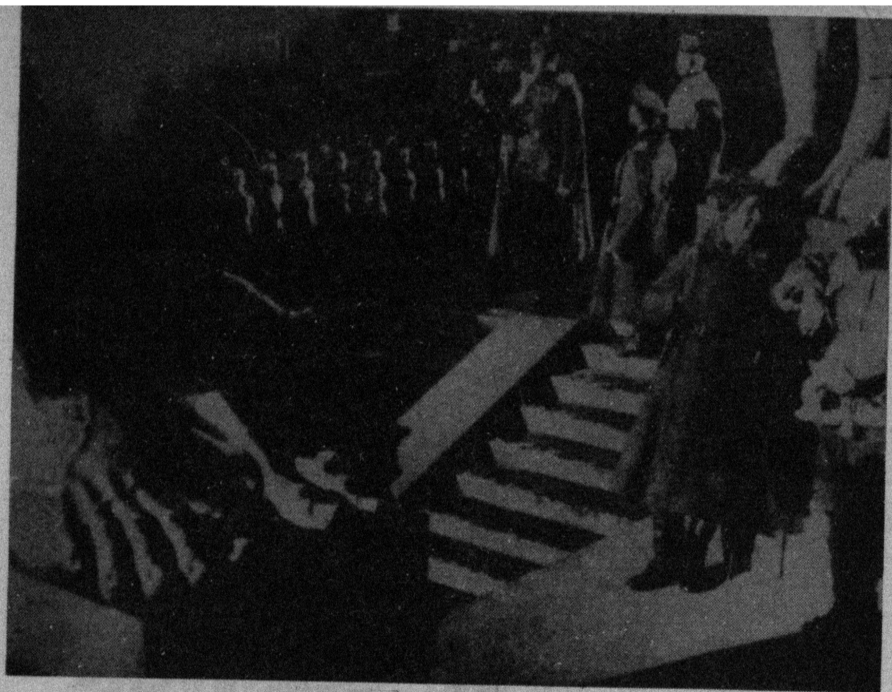
'ইভান দ্য টেরিবল্'

'অক্টোবর' চলচ্চিত্রের দৃশ্য

প্রচারপত্রে ভের্তভের প্রতিকৃতি

বিশাল কাহিনী তিনটি পর্বে শেষ করা। নিজের মতো করে সমস্ত পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাজটা অনেক পিছিয়ে দিলো। তাই ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কয়েকটা বছর চলে গেলো শুধু সত্যিকারের চলচ্চিত্রের কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিতে।

ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন 'ইভান্ দ্য টেরিব্‌ল্' চলচ্চিত্রের আবরণে আইজেনস্টাইন নিজের এবং অন্য কিছু মানুষের জীবনের কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন রাশিয়ার সমসাময়িক রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছিলো এই চলচ্চিত্রে, স্বৈর-তন্ত্রের বিরুদ্ধে আইজেনস্টাইন কথা বলেছিলেন চলচ্চিত্রের ভাষায়। তাঁরা আরো বলেন যে 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্' চলচ্চিত্র আইজেনস্টাইনের আত্মঘাতী পরিকল্পনা। আইজেনস্টাইন যে এই চলচ্চিত্র দিয়ে আত্মহত্যাই করেছেন, এমন আভাসের অভাব নেই।

তবে এটা সত্যি যে, আইজেনস্টাইনের জীবনের শেষ কটা বছর উত্তাল হয়ে উঠেছিলো সমালোচনার ধারায়। অজস্র প্রশংসা পেয়েছেন এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, আবার রাজনীতিকভাবে আক্রান্তও হয়েছেন এর দ্বিতীয় পর্বে। আইজেন-স্টাইনের মতো মানুষ খুব সহজে আপোস করতে পারেননি স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে।

'ইভান্ দ্য টেরিব্‌ল্' চলচ্চিত্রের কাহিনী রাশিয়ার জারের ইতিহাস। নুস্কোভির (Nuscovy) রাজপুত্র ইভান সতের বছর বয়সে রাজা (Tsar) হয়েছেন। তিনি রাজা হওয়ার পর কাহিনীতে একের পর এক চরিত্র এসেছে—কখনও তাঁর বিবাহকে কেন্দ্র করে, কখনও গির্জাকে বা ধর্মকে কেন্দ্র করে।

গির্জা অনুভব করেছে রাজার হস্তক্ষেপ। আবার খুব সাধারণ মানুষও আক্রমণ করেছে ইভানকে।

অবশেষে একটা সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরাজয় ইভানের মধ্যে এক ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যদিও সমস্ত দুঃসংবাদের পরেও তিনি চিৎকার করে ওঠেন—"নুস্কোভির জার এখনো ধ্বংস হয়ে যায়নি।" তবুও একটা চাপা বেদনা ফুটে ওঠে চলচ্চিত্রের শেষ দিকে।

প্রথম পর্বের কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার পর থেকে দ্বিতীয় পর্বের কাহিনীর শুরু। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের কাহিনী শেষ হয়েছে একজন স্বৈরতন্ত্রীর স্বরূপ উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে। এক সময় চলচ্চিত্রে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিজ্ঞা—"আমরা রাশিয়ার সাথে থাকবো।"

এ চলচ্চিত্রের অনেক চরিত্র ইতিহাসের সাথে ঠিক মেলে না। ইভানের কথা রাশিয়ার ইতিহাসে আছে। চতুর্থ ইভান (Ivan IV) ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক অনেক চরিত্রকে আইজেনস্টাইন কিছুটা ওলট-পালট করে নিয়েছেন। এসব করতে গিয়ে মারাত্মক সমালোচনার ঝুঁকি নিতে হয়েছিলো তাঁকে।

ইভানের চরিত্র হয়তো খানিকটা যথাযথভাবেই চলচ্চিত্রে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সে যুগটাকেও যথাযথভাবেই দেখানো হয়েছে। ষোড়শ শতকের পরিমণ্ডল নিখুঁতভাবে তৈরি করে দেখানোর কঠিন কাজটি সফলভাবেই করেছেন আইজেনস্টাইন।

কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে আইজেনস্টাইনের একান্ত নিজস্ব বক্তব্য। কোনো অর্থেই এই চলচ্চিত্র তথ্য-চলচ্চিত্র নয়। তাই ইতিহাসের ইভানকে এখানে খুঁজতে চাইলে হতাশ হতে হবে।

১৯৪৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'ইভান্ দ্য টেরিব্‌ল্' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্ব মুক্তি পেলো। এই চলচ্চিত্র তৈরি করতে যে বছরগুলো ব্যয় হয়ে গেল, সেই বছর-গুলো রাশিয়া তথা পৃথিবীর ইতিহাসের অসংখ্য উত্থান-পতনের বছর। এই বিশাল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে আইজেনস্টাইন যে ইতিহাসের সমসাময়িক উত্থান-পতনকেই তুলে ধরবেন, সেটা একান্তই স্বাভাবিক। ষোড়শ শতকের কাহিনী ও চরিত্রের ভূমিকা শুধুমাত্র সমসাময়িক চিত্রের ক্যানভাসের মত।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় আইজেনস্টাইন। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন তাঁর পুরনো বন্ধু টিসে। কিন্তু আলোকচিত্রী টিসে বহির্দৃশ্যের কাজগুলো করেছেন। যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে খ্যাত এবং অখ্যাত সবাই আছেন। আর আছেন নিকোলা (Nikola) চরিত্রে চলচ্চিত্রকার পুদভ্‌কিন্। চলচ্চিত্রের সঙ্গীত রচনা করেছেন সের্গেই প্রোকোফিয়েভ। তাই আয়োজনের এবং উপস্থাপনের উপকরণের কোনো ত্রুটি ছিল না।

১৯৪৩ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে আল্‌মা-আতায় 'ইভান্ দ্য টেরিব্‌ল্' চলচ্চিত্রের শুটিং শুরু হল। একই সাথে আইজেনস্টাইন শুরু করলেন তাঁর জীবনের সব থেকে বড়ো ও বিপজ্জনক চলচ্চিত্রের নির্মাণ।

'ইভান' পরিচালনার কিছু কথা

'ইভান' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্ব মুক্তি পাওয়ার পর আইজেনস্টাইনের নিজের লেখা কিছু নোট প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এই লেখা 'নোট্‌স্ ফ্রম এ ডাইরেক্টার্স ল্যাবরেটরি' নামে পরিচিত।

'ইভান' চলচ্চিত্রের কাজ চলার সময় আইজেনস্টাইন তাঁর চিন্তাভাবনাগুলিকে লিখে রেখেছিলেন। খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ওই সময়ে তাঁর চিন্তাভাবনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন এই লেখা।

আইজেনস্টাইনের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকা। এবং তার পরেই গুরুত্বপূর্ণ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আয়ত্ত করা এবং বজায় রাখা। কেউ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখছে, নাকি পুরো চলচ্চিত্রটাই তৈরি করার পরিকল্পনা করছে, অথবা বিশেষ কোনো একটা বিষয়ের সমাধানের কথা ভাবছে কি না, এ ব্যাপারে তাতে কোনো তফাৎ হয় না।

আইজেনস্টাইন বলেন, কোনো ব্যক্তি যা চিন্তা করছে, সেটা তাকে দেখতে হবে এবং অনুভব করতে হবে, দেখতে হবে এবং আয়ত্ত করতে হবে। তাকে সেটা ধরে রাখতে হবে এবং নিজের স্মৃতি আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। আর তা করতে হবে এখনই।

যখন কেউ কাজ করতে গিয়ে ভালো মেজাজে থাকে, তখন কল্পনাও আসে বিপুল সংখ্যায়। সেগুলোকে ধরে রাখা ঠিক একঝাঁক মাছকে ধরার মতোই। হঠাৎ মনে হবে যেন সমগ্র দৃশ্যের রূপরেখাটা দেখা যাচ্ছে। ভেতরের চোখ দিয়ে যেন একই সাথে দেখা যায় তার বিশদ ক্লোজ-আপ।

আইজেনস্টাইন অভিজ্ঞতায় লিখছেন, যখন কল্পনার মধ্যে নানান অবয়বের আসাযাওয়া, তখন জার ইভানের বৈশিষ্ট্যের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে, ছবি আঁকার পেন্সিল ছেড়ে ধরতে হবে কলম। দৃশ্যের কথোপকথন লিখে ফেলতে হবে। আবার লেখার কালি শুকিয়ে আসার আগে পেন্সিল ধরতে হবে সেই কথোপকথনের সময়কার দৃশ্য আঁকতে।

আঁকতে হবে জারের ধূসর মাথা বেয়ে নেমে এসেছে পাদ্রীর দীর্ঘ সাদা চুল।

আইজেনস্টাইনের অভিজ্ঞতায়—এমন একটা মেজাজ শেষ হবার আগে দেখা যায় কলম দিয়ে নিজে নিজে ছবি আঁকছেন আর পেন্সিল দিয়ে ছবির ওপর কথোপকথনের নোট রাখছেন।

একটা সময় আসে যখন পরিচালনাটা পরিণত হয় ছবি আঁকায়। বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠস্বর আর কথা বলার কায়দা হয়ে দাঁড়ায় মুখের চেহারার চিত্রগুচ্ছ। সত্যিকারের কথাবার্তার আদলে কোনো দৃশ্য প্রকাশিত হবার আগে, কতকগুলি আঁকা ছবির গুচ্ছের আকারে দেখা দেয় সেটা।

এইভাবে আঁকা ছবির পাতা জমে ওঠে পাহাড়ের মতো, চিত্রনাট্য লেখার চারপাশে। চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা যতো এগোতে থাকে, ততোই প্রত্যেকটি দৃশ্যের বিশদ পরিকল্পনার ছবি সংরক্ষণ করার সমস্যা দেখা দেয়।

কোনো চলচ্চিত্রের একেকটি দৃশ্যের খুঁটিনাটি সম্পর্কে মাথায় চিন্তার উদয়েরই ফল হলো এমন বিশদ করে লেখা ও ছবি আঁকা।

'ইভান' চলচ্চিত্র তৈরির সময়ে আইজেনস্টাইন নিজের হাতে অসংখ্য স্কেচ করেছেন, ছবি এঁকেছেন। তাঁর মনে প্রতি মুহূর্তে যে-সব দৃশ্যের আকার আকৃতির কথা উদয় হচ্ছিলো, তারই প্রতিফলন এইসব স্কেচ। তিনি নিজেই

বলেছেন, ওই ছবিগুলো এর থেকে বেশি কিছু দাবি করতে পারে না। এমন কি ওগুলোকে ঠিক ছবিও বলা যায় না।

'ইভান' চলচ্চিত্র নির্মাণে এই স্কেচ বা ছবিগুলোর দাবি কিন্তু এর থেকে কমও নয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস যে কাজ করতে হবে, তার খুঁটিনাটি চিন্তাভাবনা, পরামর্শ, নির্দেশ ধরা ছিলো এই স্কেচগুলোতে। ষোড়শ শতকের যে দৃশ্য পরিকল্পনা, তার ধারণা ডিজাইনার পেতে পারে এই স্কেচ-গুলো থেকে। পেন্সিলে আঁকা এই সাদামাটা স্কেচগুলো থেকে প্রতিটি চরিত্রের সাজসজ্জা ঠিক করতে সুবিধে হয়।

চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করার সময় সাজসজ্জা ও পোশাকের দিকে রীতিমত নজর রাখতে হয়েছিলো। কল্পনার চোখ দিয়ে আইজেনস্টাইন যখন এই সমস্ত দৃশ্য-সজ্জা ও সাজ-পোশাককে দেখেন, তখন এই স্কেচগুলো যেন ঠিক জাপানি কাগজের খেলনার ভূমিকা গ্রহণ করে। সেগুলো যেন ফুল, পাতা ও শাখা বিস্তার করে নিজেদের মেলে ধরে।

যখন কোনো পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করতে হবে, তখন সেটিকে কাগজে-কলমেই অনেক আগে করে দেখা যায়। কখনো একটা খিলানের বা দৃশ্যের অংশের ভূমিকার যথাযথ প্রয়োগ করতে হলে কাগজে-কলমেই সেটা ঠিক করে নেওয়া যায়। কখনো কোনো অভিনেতার যথাযথ ভূমিকা বা আলোক-প্রক্ষেপণের সম্ভাব্য পথ, প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী বা পরিকল্পনাকে বদলে দিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রথমবারের দৃষ্টিভঙ্গী বা ভাবনাচিন্তার মধ্যেই পরিবর্তিত পরি-কল্পনাটি নিহিত থাকে।

এই ভাবেই 'ইভান' চলচ্চিত্রের প্রতিটি ধাপ ঠিক করেছিলেন আইজেনস্টাইন। এতো নিখুঁত তাঁর কল্পনাশক্তি ও পরিকল্পনা, যার ফলে ক্যামেরার সামনে কাজ করতে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়নি তাঁকে। সেই স্তরের অভিজ্ঞতার কথা তিনি নিজেই বলেছেন।

তাঁর স্বপ্ন এবার বাস্তবে পরিণত হলো।

এখন আর কলম, পেন্সিল, নোটবই, খামের ছেঁড়া পাতা, টেলিগ্রামের পৃষ্ঠা, আমন্ত্রণপত্রের টুকরো, যেগুলো শুধু স্কেচ আর নোটে ভর্তি হয়ে গিয়েছে, স্তূপীকৃত হয়ে সামনে পড়ে আছে—সেগুলো নয়। স্বপ্ন এখন পরিণত হচ্ছে এক বিশাল কাজে। চিত্রনাট্যের কথাগুলো এখন ব্যবহারিক কাজে পরিণত হয়েছে। কাজানকে ধরা এখন আর কথার কথা নয়, দৃশ্যত সামরিক শিবিরে পরিণত হয়েছে।

দৃশ্যগ্রহণের সময় সূর্যের তেজ এতোই বেশি যে আইজেনস্টাইনরা বাধ্য হলেন মাথায় টুপি পরতে। এই রোদের নীচে দাঁড়িয়ে একটা সেকেন্ড সময় নেই কোনো স্বপ্ন দেখার বা কল্পনা করার। রঙীন কল্পনা এখন নিতান্তই ব্রাত্য।

দৃশ্যগ্রহণের সময় অতীতের মুক্ত বিহঙ্গের মতো কল্পনাগুলো পরিণত হয়েছে বিশদ টেকনিক্যাল কাজকর্মে। এখন দরকার দৃশ্যগ্রহণ কতোখানি ঝকঝকে হবে, ক্যামেরার লেন্সের সবথেকে উপযুক্ত কোন্ ফিল্টার ব্যবহার করা হবে, কতো দীর্ঘ ফিল্ম খরচ হলো—এ সবের খুঁটিনাটি হিসাব।

অনেকগুলো তাঁবু পড়েছে, ছাতা রয়েছে, প্রতিফলক রয়েছে, আর তার দিকে নির্দয়ভাবে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার লেন্সের ঠাণ্ডা কাচ। চিত্রনাট্যের পাতায় লেখা নির্দেশগুলো ছাড়া আর কোনোদিকেই নজর দিচ্ছে না সে।

একসময় কাজানের রৌদ্রালোকিত সমতল ছাড়িয়ে শব্দগ্রহণের স্তরে এসে পৌঁছোয় ক্যামেরা। এখন আর সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শত শত ঘোড়ার খুরে ওড়ানো ধুলো নেই।

এখন জার ইভান তাঁর স্ত্রীর কফিনের পাশে। বিষপানে মৃত তাঁর স্ত্রী। তাঁর দেহের পাশে এখন জার ইভানকে মনে হয় চরম নিঃসঙ্গ, একাকী।

শব্দগ্রহণের ব্যবস্থার সমস্ত কোণ থেকে তাকিয়ে আছে সবাই। লক্ষ্য রাখছে দৃশ্য-পরিকল্পনা অনুযায়ী সব যেন ঠিক থাকে—ক্যামেরার চিত্রগ্রহণ থেকে শুরু করে পরিশ্রমসাধ্য দৃশ্য-সজ্জার আলো পর্যন্ত। সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াররা ব্যস্ত জার ইভানের কণ্ঠস্বরের মাত্রা নিয়ে।

ঠিক যে দৃশ্যসজ্জায় বয়স্ক জার কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন, সেই একই দৃশ্যসজ্জায় সেই একই মানুষ আরও পনেরো বছর কমবয়সী সেজে জার হিসাবে অভিষিক্ত হচ্ছেন। এই হলো চলচ্চিত্রের শুটিং—দৃশ্য তার কালানুক্রম মেনে চলে না।

জার ইভানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নিকোলাই চেরকাসভ্ (Nikolai Cherkasov)। একবার বয়স্ক জার হিসাবে অভিনয় করার পরেই তারুণ্যের যাবতীয় প্রকাশভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে নিঃসন্দেহে চেরকাসভ্‌কে অনেক সৃষ্টিশীল ইচ্ছা ও কল্পনা লালন করতে হয়েছিলো।

এই সময় আইজেনস্টাইনের মনে পড়ে যায় এইচ্. জি. ওয়েলসের 'টাইম মেশিন' রচনাটির কথা। সেই কাহিনীতে ছিলো একটি মেশিনেই কখনো অতীত, কখনো বর্তমান, কখনো ভবিষ্যৎ, কখনো অদূরে ভবিষ্যৎ, কখনো সুদূর ভবিষ্যৎ দেখা যায়। কল্পনার সেই অদ্ভুত মেশিনটার মতোই চলচ্চিত্রের ক্যামেরাও নির্মমভাবে একবার বয়স্ক বিষণ্ণ জারকে দৃশ্যত গ্রহণ করার পর সেই জারেরই তরুণ বয়সের অভিষেকের দৃশ্যগ্রহণ করছে।

'ইভান' চলচ্চিত্র নির্মাণের সময়েই আইজেনস্টাইন লিখে গেছেন—চলচ্চিত্রে অবিরাম বৈচিত্র্য ও নতুন বস্তুর উপস্থিতিতে সমস্ত কঠিন এবং বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। দৃশ্যগ্রহণের সময় আজ হয়তো দেখা গেল দারুণ ফসল তোলা হচ্ছে, আগামীকাল দেখা গেল ষাঁড়ের সাথে লড়াই

করছে কোনো মাতাদোর, পরের দিন এক পাদ্রী আশীর্বাদ করছেন নতুন জারকে।

প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য দরকার বিশেষ এবং নির্দিষ্ট টেক্‌নিক্‌। খামারে ফসল তোলার দৃশ্য আর ষাঁড়ের সাথে লড়াই করার দৃশ্য কখনোই একই টেকনিকে গ্রহণ করা যায় না। তাই 'ইভান' চলচ্চিত্রে যে-সব প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে, সেগুলোকে বাস্তবানুগ করার জন্য অনেক যত্নে পরিকল্পনা করতে হয়েছে, কারণ আজকের পর্দায় অতীতের দৃশ্যকে যথাযথ-ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে।

তাই মস্কোর ফাদার পাভেলৎজ্‌ভেৎকভ্‌ (Paveltzvetkov) এলেন অভিনেতা-দের নির্দেশ দিতে। যখন জার ইভানকে আশীর্বাদ করার আচার-অনুষ্ঠানের দৃশ্য দেখানো হবে, তখন কেমন করে তা করতে হবে ফাদার পাভেল ধৈর্য সহকারে শিখিয়ে দিলেন। আবার এই পবিত্র অনুষ্ঠানে তরুণ জার কেমন আচরণ করবেন, তা-ও শিখিয়ে দিলেন ফাদার পাভেল।

এই অনুষ্ঠানের দৃশ্যগ্রহণের সময় চিত্রনাট্যের পাতা থেকে পাঠ করা হলো তরুণ জারের স্বাস্থ্যকামনা করে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে। এই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর চিত্রনাট্য থেকে সাউণ্ড ট্র্যাকে চলে গেলো।

এই দৃশ্য গ্রহণের সময় গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরের জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছিলো দেশের শ্রেষ্ঠ গম্ভীরকণ্ঠী শিল্পীকে। এই পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ 'দীর্ঘ জীবন' প্রার্থনাটি নির্বাচন করা হয়েছিলো অত্যন্ত সযত্নে। এমনিভাবেই রাশিয়ার প্রথম স্বৈরতন্ত্রী জার ইভানের অভিষেকের দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছিলো।

'ইভান' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্ব

আইজেনস্টাইনের 'ইভান' চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয় অত্যন্ত বিশাল পরি-কল্পনায়। নির্মাণ শেষ হয় দুটি পর্বে। কিন্তু বাস্তবত প্রথম পর্বটি আইজেন-স্টাইন শেষ করতে পারেন এবং দ্বিতীয় পর্বটির মুক্তিলাভ দেখে যেতে পারেন নি।

পৃথিবীর অনেক ভাষায় 'ইভান' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনূদিত হয়েছে। আর একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশে এই চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা প্রকাশিত হয়েই চলেছে।

চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য ঠিক যেন কবিতার মতো করে লেখা। এই লেখার ঢংয়ে, আইজেনস্টাইনের বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা জানি নুস্কোভির রাজপুত্র ইভান সতের বছর বয়সে রাশিয়ার রাজ হয়েছিলেন। নভোগরদের আর্চবিশপ এই অভিষেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন। অনুষ্ঠান যতোই এগোতে থাকে, ততোই অভিজাতরা (Boyars) বিরোধী পক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।
ইভানের বাগদত্তা আনাস্তাশিয়া (Anastasia)। ইভানের খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকটি পরিবার আর আনাস্তাশিয়াই সব থেকে খুশি হয়েছিলো ইভানের অভিষেকে।
ইভানের খুড়ি তার অপদার্থ ছেলে ভ্লাদিমিরকে (Vladimir) নুস্কোভির সিংহাসনে বসাবে বলে ঠিক করে রেখেছিলো। ইভানের অভিষেকে তার সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাই বিদ্রোহী দলের নেতৃত্বে ছিলো ইভানের এই খুড়ি।
বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা খানিকটা সংশয়ে ছিলো। দিনের পর দিন এই নতুন জার ইভান সবাইকে অবাক করে দিয়ে নতুন নতুন আদেশ জারি করছিলেন। বিদ্রোহীদের দমন করা, গীর্জার ওপর মাশুল বসানো, বিদেশী শক্তির হাত থেকে অধিকৃত ভূখণ্ড উদ্ধার করা—এমন ধরণের আদেশ আসছিলো নতুন রাজার কাছ থেকে।
অভিষেকের কিছুদিন পরে, ইভানের বয়সে পরিপক্কতা এসেছে বলে মনে হলো। তাই ইভান ও আনাস্তাশিয়ার বিয়ে হয়ে গেলো। এই বিয়ের ভোজসভায় নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলো ইভানের সেই খুড়ি। কিন্তু ইভানের নিজের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আস্তে আস্তে বেঁকে বসলো।
একজন বন্ধু ফেদর (Fedor)। ফেদর চাইলো নিজের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে কোনো উপাসনালয়ে চলে যেতে, কারণ গীর্জা সম্পর্কে ইভানের নীতি মানতে পারেনি সে। আরেক বন্ধু আন্দ্রেই (Andrei)। সেও বেঁকে বসল। একসময় আনাস্তাশিয়াকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো সে।
হঠাৎই জনতার এক বাহিনী প্রাসাদ আক্রমণ করলো। এই দলে ছিলো একজন সাদামাটা মানুষ, নিকোলা (Nikola)। আর ছিলো মালাইউতা (Malyuta) নামে একটি ছেলে। মালাইউতা ইভানকে একটা মোমদানি দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলে ফেদর আর আন্দ্রেই ইভানকে বাঁচিয়ে দেয়।
জনতার দঙ্গলের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে জানালো যে, বিশাল একটা ঘণ্টা ভেঙে পড়েছে। এটা ঈশ্বরের রোষের লক্ষণ।
ইভান জনতার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করেন। কিন্তু তার সাথে সাথেই ইভান এ কথাও বলেন যে, উস্কানিদাতা বিদ্রোহীদের তিনি শায়েস্তা করবেন।
মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি শহর কাজান। কাজানের প্রতিনিধিরা ইভানকে চ্যালেঞ্জ জানায়। ইভান সমস্ত জনতাকে উত্তপ্ত করেন একথা বলে—"কাজানে চলো।"

ইভানের আহ্বানে জনগণ প্রতিধ্বনি করে ওঠে। সত্যিই ইভানের সৈন্যবাহিনী কাজানে যায় এবং অধিকার করে।

মস্কোয় ফিরে এসে ইভান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই সুযোগটা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলো অনেকেই। ইভানের খুড়ি আর আন্দ্রেই কিছু মতলব ভাঁজলো। ওই খুড়ি চেষ্টা করলো বিদ্রোহীদের দিয়ে তার ছেলে ভ্লাদিমিরকে জার হিসাবে নির্বাচিত করানোর। ইভান আবার বিদ্রোহীদের সাথে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলেন।

আন্দ্রেই ভাবলো ইভানের স্ত্রীকে সম্ভবত দলে আনা যাবে। তাই প্রস্তাব দিলো আনাস্তাশিয়াকে—'এসো আমরা একসাথে শাসন করি।'

ইভান খুব আশ্চর্যভাবে দ্রুত সেরে উঠলেন। আন্দ্রেই তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো। তার পুরস্কারস্বরূপ ইভান তাকে এইভাবেই সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব দিলেন। ঠিক এভাবেই কাজানের এক বীরকে পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব দিলেন ইভান।

এদিকে বৈঠক বসলো ইভানের খুড়ির অট্টালিকাতে। সিদ্ধান্ত হলো— আনাস্তাশিয়াকে হত্যা করা হবে। আর এই ঘৃণ্য কাজটি করার দায়িত্ব নিলো ইভানের খুড়ি স্বয়ং।

ইভান তখন খুব ব্যস্ত। সমুদ্রতীরবর্তী কয়েকটি শহরকে বাগে আনা যাচ্ছে না। তাই ইভান বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের কাছে দূত পাঠালেন তিনি, তাঁর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য।

ইভানের এই কর্মব্যস্ততার মধ্যে, আনাস্তাশিয়া অসুস্থ। তাঁর দেখাশোনা করার জন্য রয়েছে ইভানের খুড়ি।

ইভান যখন আনাস্তাশিয়ার শোয়ার ঘরে ঢুকলেন, ঠিক তখনই বিদ্রোহীদের সম্পর্কে কিছু খবর তাঁর কানে এসে পৌঁছলো। পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে চাইছে না বিদ্রোহীরা।

আনাস্তাশিয়া জার ইভানকে বলেছিলেন—'শক্ত থেকো!'

কিন্তু আন্দ্রেইয়ের বাহিনী পরাজিত হলো। এ খবর শুনে আনাস্তাশিয়া ভীষণ মর্মাহত হয়ে পড়লেন।

অসুস্থ মর্মাহত আনাস্তাশিয়াকে জল খাওয়াতে গেলেন স্বামী ইভান। তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে সেই জলে তাঁর খুড়ি বিষ মিশিয়ে রেখেছে।

নিজের অজান্তে ভালোবাসার পাত্রী স্ত্রী আনাস্তাশিয়াকে বিষ পান করালেন ইভান। বিদ্রোহীদের চক্রান্তে মৃত্যু হলো আনাস্তাশিয়ার।

আনাস্তাশিয়ার কফিন রেখে দেওয়া হলো ক্যাথিড্রালে। শোকাহত ইভান সেই কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে।

তাঁর কাছে খবরের পর খবর এসে পৌঁছতে লাগলো—বিশ্বাসঘাতকতা আর পরাজয়ের। পূর্ব সীমান্ত থেকে ভেসে এলো ব্যর্থতার খবর।
যখন এক যাজক ধর্মগ্রন্থ থেকে আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা পাঠ করছিলেন, তখন সৈন্যবাহিনীর ব্যর্থতার সংবাদ এসে পৌঁছলো ইভানের কাছে।
হঠাৎ ইভান হিংস্রভাবে চিৎকার করে উঠলেন—"না, নুস্কোভির জার এখনো ধ্বংস হয়ে যায়নি।"
কয়েকজন অনুগত সেনাধ্যক্ষকে নিয়ে ইভান এবার রওনা হবার উদ্যোগ নিলেন। মস্কো ছেড়ে এগিয়ে চললেন আলেকজান্দ্রা শহরের দিকে। বিশাল এক জনতা মিছিল করে, হাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে, তাঁকে ফিরে আসতে বললো। এভাবেই শেষ হয়েছে 'ইভান' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্ব। নিজের চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতার পরিপক্বতায়, আইজেনস্টাইন ইভানকে সামনে রেখে তাঁর বহু বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।
একেবারে প্রথমেই যখন ইভানের অভিষেক চলছে, তখন আমরা দেখতে পাই রাশিয়ার এক ভাবী শাসক উদ্ভূত হচ্ছে বিরাট ক্যাথিড্রালের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এখানেই বিদ্রোহীদের আত্মপ্রকাশ। আবার এখানেই বিদ্রোহ দমনের চ্যালেঞ্জ।
গর্বোদ্ধত ইভান ঘোষণা করেন—"দুটি রোমের পতন হয়েছে। কিন্তু তৃতীয়টি মস্কো, সে দাঁড়িয়েই থাকবে। চতুর্থ আর কোনোটা হবে না। এই তৃতীয় রোমে নুস্কোভির শাসক হিসাবে, একমাত্র প্রভু হিসাবে, আজ থেকে আমার একার রাজত্ব।"
এই গর্বোদ্ধত ইভানের পাশাপাশি ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এসেছে। ঈশ্বরের কাছে কখনো ইভান তাঁর বন্ধুদের পাঠিয়েছেন প্রার্থনা করতে, কখনো নিজেই বলেছেন—"ঈশ্বর দেখছেন, আমরা যুদ্ধ চাই না।"
সমস্ত চলচ্চিত্রের শেষ অংশের বেদনা যেন ভেঙে পড়ে আনাস্তাশিয়ার মৃত্যুতে। ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তরের অন্ধকারে রাত্রিবেলা শোকাহত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ইভান, দাঁড়িয়ে আছেন আনাস্তাশিয়ার কফিনের পাশে। চোখ নিবদ্ধ রয়েছে আনাস্তাশিয়ার ওপর। কেউ এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে। কোনো যাজক বাইবেল থেকে পাঠ করছেন। কিন্তু ইভানের কানে খবর বা প্রার্থনা কোনোটাই ঢুকছে না। বিশ্বাসঘাতকতায় ইভান হারিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে।
এই দৃশ্যত নিস্তব্ধতার মধ্যে, শোকের মধ্যে, ইভান নিজেই প্রশ্ন করেন—"আমি যা করছি সেটা কি ঠিক? আমি কি ঠিক করছি?" বার বার প্রশ্ন জাগে ইভানের—"আমার যে কঠিন লড়াই, তাতে কি আমি ঠিক করছি?"
আবার সেই ইভানই বলে ওঠেন—"মস্কোর জার এখনো ভেঙে পড়েনি।"
যখন আপাতভাবে অশরীরী ঈশ্বরকে ইভান প্রশ্ন করেন, তখন তাঁর প্রশ্নটি যেন

উচ্চারিত হয় আনাস্তাশিয়ার শবদেহের উদ্দেশেই। তাই আত্মঅনুসন্ধানের তীব্র এক প্রেরণা আসে, নিস্তব্ধ নির্বাক আনাস্তাশিয়ার কাছ থেকে।
চলচ্চিত্রের এই পর্বটি শেষ হয় আলেকজান্দ্রার দিকে রওনা হওয়া দিয়ে। জনতার একটা মিছিল, আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে মহাকাব্যের মতো দেখা দেয়। তাই অবশেষে এক বিশাল জনতার আকাঙ্ক্ষা, সৎ আকাঙ্ক্ষা, প্রতিফলিত হয় 'ইভান' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বে।

'ইভান' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্ব

'ইভান' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বের সাথেই দ্বিতীয় পর্বের দৃশ্যগ্রহণও প্রায় শেষ হয়েছিলো। কাজেই, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আর কলাকুশলীরা দ্বিতীয় পর্বেও একই ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের সম্পাদনা করা হয় প্রথম পর্বের পরে।
এই দ্বিতীয় পর্বটি সমাপ্ত হবার পর আইজেনস্টাইনকে সবথেকে বেশি আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়। দৃশ্য ও কাহিনীর বিন্যাসের দিক থেকে গুণগতভাবে দ্বিতীয় পর্বটি প্রথম পর্বের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু নয়। বরং বলা যেতে পারে, প্রথম পর্বের ধারাবাহিকতা হিসাবেই দ্বিতীয় পর্বের উপস্থাপনা।
ইভান মস্কোয় ফিরেছেন। তিনি ঘোষণা করলেন এক নতুন সভার জন্ম।
পুরনো বন্ধু ফেদর ইভানের নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানালো। ইভান তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে, আরো পদোন্নতি ঘটালেন তার। ফলে অসন্তুষ্ট হলো অনেকেই। ফেদরের মতো যাজকের কাছে কেন রাশিয়ার একজন জার মাথা নোয়াবেন ?
ইভানের কাছে প্রস্তাব এলো যে নতুন যাজক অর্থাৎ ইভানের পুরনো বন্ধু ফেদরের জনাতিনেক আত্মীয়কে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। নিজের গভীরে তখন তোলপাড় চলছে ইভানের। তবুও তিনি রাজি হলেন।
ঠিক এই সময়েই ইভান প্রথম জানতে পারলেন তাঁর খুড়ি আনাস্তাশিয়াকে বিষ দিয়েছিলো।
ধর্মযাজক পুরনো বন্ধু ফেদর আর তার বন্ধুরা, ইভানের নির্দেশে নিহত তিন আত্মীয় সম্বন্ধে তখন শোকাহত। ফেদর ইভানকে ছাড়বে না। ক্যাথিড্রালে এক অনুষ্ঠানে ইভান যখন ধর্মযাজকের আশীর্বাদ চাইলেন, তখন ফেদর পরিষ্কারভাবে ইভানকে নতুন সভা বাতিল করে গীর্জার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বললো।

সবাইকে চমকে দিয়ে সেই ক্যাথিড্রালের মধ্যে ইভান ঘোষণা করলেন—"আমাকে তোমরা ভয়ংকর বলতে পারো, আমি ভয়ংকরই হবো।"

শুরু হলো চক্রান্ত। কয়েকজন ঠিক করলো ইভানকে হত্যা করতে হবে। তার জন্যে পিটারকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। ইভানের খুড়ি তার অপদার্থ পুত্র ভ্লাদিমিরকে জার করতে চাইলো।

ইতিমধ্যে এক ভোজসভায় ভ্লাদিমিরকে আনিয়েছেন ইভান। তিনি তাঁর খুড়িকে উপহার পাঠালেন সেই পাত্রটা, যে পাত্রতে করে আনাস্তাশিয়াকে বিষ দেওয়া হয়েছিলো। এই ভোজসভাতেই ইভানকে তাঁর খুড়ির পরিকল্পনাটি জানিয়ে দিলো ভ্লাদিমির।

ইভান বললেন—"তোমাকে আমি রাজা করে দেবো।"

সত্যিই নিজের রাজপোশাক ভ্লাদিমিরকে পরিয়ে দিলেন তিনি। নির্বোধ ভ্লাদিমির এই রসিকতা বুঝতে পারলো না। তার চোখেমুখে আনন্দ দেখে, ইভান এবার ক্যাথিড্রালে যাওয়ার বাহিনীটির নেতৃত্ব দিতে বললেন তাকে।

ঘাতক পিটার অপেক্ষা করছিলো ইভানকে খুন করার জন্য। জারের পোশাক পরা ভ্লাদিমির যখন বেরিয়ে এলো, পিটার তাকে ইভান বলে ভুল করলো এবং হত্যা করলো ভ্লাদিমিরকে।

ইভানের খুড়ি তখনো ভাগ্যের এই মর্মান্তিক রসিকতাটি ধরতে পারেনি। তাই এই ঘটনায় প্রথমে সে মন্তব্য করে উঠেছিলো—"শয়তানটা মরেছে!" কিন্তু তারপরই সে চিনতে পারলো তার নিজের সন্তান ভ্লাদিমিরকে—ভ্লাদিমির নেই।

পিটারকে ক্ষমা করলেন ইভান। তারপর একটি বক্তৃতা দিলেন, যার শেষে তাঁর ঘোষণা রইলো—"আমরা রাশিয়ার পাশে দাঁড়াবো।"

দ্বিতীয় পর্বের শেষটুকু হয়েছে অনেকটা প্রথম পর্বের প্রথম অভিষেকের দৃশ্যের মতো। ইভান নিজেকে ভয়ংকর হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। আবার ভ্লাদিমিরকে রাজার পোশাকে সাজিয়ে ইভান নিজেই যখন তাকে অভিবাদন করছিলেন, তখনো যেন প্রথম পর্বেরই রসিকতা দ্বিতীয় পর্বটিতে প্রতিফলিত।

আক্রান্ত 'ইভান' দ্বিতীয় পর্ব

আজকে আর এটা খুব আশ্চর্য লাগে না যে, 'ইভান' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বের জন্য আইজেনস্টাইন সোভিয়েত রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হবেন। কিন্তু ঠিক সেইসময়ে এটা হয়তো অতোখানি অনুমান করা নাও যেতে পারতো।

আমরা যারা পরোক্ষভাবে রাশিয়ার সেই সময়কার আচরণকে জানার চেষ্টা করি, তাদের কাছে অনেক ঘটনাই খুব স্বচ্ছ লাগে না।

বিশেষত 'ইভান' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্ব সোভিয়েত রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে এতো বেশি প্রশংসা পেয়েছে, যার ফলে অনুমান করতে কষ্ট হয় দ্বিতীয় পর্বটি এমন কি অপরাধ করেছিলো। প্রথম পর্বের জন্যে সোভিয়েত রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ আইজেনস্টাইনকে সর্বোচ্চ পুরস্কারে সম্মানিত করেছিলেন। আবার সেই কর্তৃপক্ষই মাত্র নয় মাস পরে, 'ইভান' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বের প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

'ইভান' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বের মতো দ্বিতীয় পর্বের চিত্রনাট্যও কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছিলেন। এমনকি, দ্বিতীয় পর্বের চিত্রনাট্য প্রকাশিতও হয়েছিলো। এতোকিছুর পরেও দ্বিতীয় পর্ব নিষিদ্ধ হলো কেন?

রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারতেন না যে, এই চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বের থেকে দ্বিতীয় পর্বে আইজেনস্টাইন কম দক্ষতা দেখিয়েছেন।

এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা শুধু কয়েকটি প্রশ্ন তুলে, হতবাক হয়ে যাই। কিন্তু 'ইভান' চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ হওয়ার পিছনের ঘোষণাগুলিও আমাদের দেখতে হবে।

ইভানের চরিত্র যথাযথ ইতিহাস অনুগামী নয়, এ অভিযোগ এসেছিলো, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের পর। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলো—"চলচ্চিত্র 'ইভান দ্য টেরিবল্'-এর দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, ঐতিহাসিক উপকরণের অসাবধানী এবং খামখেয়ালী ব্যবহার, প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অবহেলাপূর্ণ আচরণ।"

১৯৪৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি প্রস্তাব লেখে—"এরকম মিথ্যা আর ত্রুটিপূর্ণ চলচ্চিত্র এতো ঘন ঘন নির্মাণ করার কারণ কি হতে পারে?...কারণটা এই হতে পারে যে, সিনেমাটোগ্রাফির প্রধান কর্মীরা, পরিচালকরা, নির্মাতারা, চিত্রনাট্য লেখকরা, তাঁদের কাজকর্মের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ দায়িত্বশীল নন। তাঁদের কাজের প্রধান ত্রুটি হলো এই যে, যে কাজটায় তাঁরা হাত দিয়েছেন সেটা অধ্যয়ন করেন না।..."

"সেগেই আইজেনস্টাইন নির্মাতা হিসাবে 'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বে ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এটা দেখিয়ে যে, ইভান দ্য টেরিবলের দেহরক্ষীরা ছিলো একটি অধঃপতিত বাহিনী, অনেকটা কু-ক্লুক্স-ক্ল্যান (Ku-Klux-Klan) গোষ্ঠীর মতো এবং যে ইভান দ্য টেরিবল্ শক্ত মন ও চরিত্রের মানুষ ছিলেন, তাঁকে দেখানো হয়েছে হ্যামলেটের মতো দুর্বল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হিসাবে।"

এই অভিযোগগুলিতে যে সত্যতা ছিল না তা নিয়ে অনেক লেখকই আলোচনা করেছেন। বস্তুত 'ইভান' চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তার প্রধান উৎস হলো স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আইজেনস্টাইনের বক্তব্য।
বিভিন্ন আলোচনায় বারবার করে এসেছে যে, যোসেফ স্তালিন (Joseph Stalin) শাসিত সোভিয়েত রাশিয়ার সমসাময়িক স্বৈরতান্ত্রিক চেহারা ধরা পড়েছে আইজেনস্টাইনের 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বে।
এই ইভান চরিত্রের সঙ্গে রাশিয়ার কোনো বিশেষ চরিত্রের মিল খুঁজতে যাওয়া কখনো কখনো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে মনে হতে পারে। বিশেষত আইজেনস্টাইনের নিজের স্বভাব ছিলো অনেক সময় কোনো একটি চরিত্রের আদলে অপর একটি চরিত্রকে আকৃতি দেওয়া। কিন্তু 'ইভান' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বে পারতপক্ষে আইজেনস্টাইন এমন কঠোর শ্রম করেছেন যার ফল হিসাবে এই চলচ্চিত্র তাঁর কাছে—একটি চলচ্চিত্রীয় আত্মহত্যা। নিছক পরিশ্রমের জন্যই নয়, যে পরিমাণ বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি, যতো বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, আর তার ফলে শরীর ও মনের যে পরিমাণ ক্ষয় স্বীকার করেছেন—সেদিক থেকে 'ইভান' চলচ্চিত্র একটি চলচ্চিত্রীয় আত্মহত্যাই।
অনেকে বলেন যে, ইভানের চরিত্রটি সোভিয়েত রাশিয়ার তৎকালীন শাসক যোসেফ স্তালিনের আদলে তৈরি করা হয়েছিলো। সোভিয়েতের একনায়ক স্তালিন আর ষোড়শ শতকের ইভানের মধ্যে অনেক জায়গায় মিল আছে। প্রথম পর্বে ইভানকে যতোখানি জনদরদী প্রভু হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিলো, সোভিয়েত রাশিয়ায় যোসেফ স্তালিনের চরিত্রকেও সেভাবেই চিত্রিত করা হতো। কিন্তু সেখানেই সবটুকু থেমে থাকেনি।
ইভান এবং স্তালিন দুই একনায়কের চরিত্রের অন্য দিকটিকে আবার অনেক গবেষক একই রকম দেখেছেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না করেও হয়তো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে ইভান ও স্তালিনের রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে। তাই দ্বিতীয় পর্ব দেখে খুব সহজেই স্তালিনের রাশিয়ার কথা মনে আসে।
কেউ কেউ বলেন 'ইভান' চলচ্চিত্র আত্মজীবনীমূলক। এর অনেক চরিত্র, বা একটি-দুটি চরিত্র, আইজেনস্টাইনের নিজের জীবনের সাথে মিলে যায়। যেমন আইজেনস্টাইনের শিষ্যা ও সহকর্মী মারি সিটন্ অনুমান করেন যে, 'ইভান' চলচ্চিত্রের ভ্লাদিমির চরিত্রটি অনেকটাই নিজের মতো করে গড়ে তুলেছেন আইজেনস্টাইন। ভ্লাদিমিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকটাই যেন আইজেন-স্টাইনের ভাবমূর্তিকে প্রকাশ করে। অনুমানটি সত্য হলেও হতে পারে।
নিজের জীবদ্দশায় আইজেনস্টাইন 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্ব

মুক্তি পেতে দেখেন নি। অথচ চলচ্চিত্রটির সম্পাদনা শেষ হয়ে গিয়েছিলো ১৯৪৬ সালে। তারপরে বাকি ছিলো আরও কিছু কাজ।

হয়তো শরীর ও মনের পরিশ্রমজনিত কারণে, মারাত্মক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতালে কাটাতে হয় আইজেনস্টাইনকে। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি যখন চলচ্চিত্রটির সম্পাদনার বাকি কাজ শেষ করবেন, তখন সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলো। নির্মম সমালোচনা।

১৯৪৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির রাতে আবার সেই হৃদ্‌রোগের মারাত্মক আক্রমণ।

'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্‌' অসম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের কিছু অংশে ছিলো রঙের ব্যবহার। এই রঙের ব্যবহার সম্পর্কে একটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ রেখে গেলেন আইজেনস্টাইন।

মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেল আইজেনস্টাইনকে—অসম্পূর্ণ যাত্রাপথে।

শূন্যস্থান আইজেনস্টাইন

১৯৪৮ সালের ২ মে আইজেনস্টাইনের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর কাজ-কর্মের স্মারক প্রকাশনার ব্যবস্থা হয়। বৃটিশ ফিল্ম অ্যাকাডেমি, লণ্ডনের ন্যাশানাল ফিল্ম লাইব্রেরির সঙ্গে যৌথভাবে লণ্ডনে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সমিতি এই প্রকাশনার ব্যবস্থা করে।

আইজেনস্টাইনের জীবদ্দশায় তাঁর অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে রাশিয়ায় ও বিদেশে। জীবনের শেষদিকে আইজেনস্টাইন অনেকটাই আত্মজীবনীমূলক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সব লেখাকে এক জায়গায় জড়ো করে সংকলন হিসাবে প্রকাশ করার চেষ্টা শুরু হয় তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে।

রাশিয়ায় যখন প্রথম আইজেনস্টাইনের রচনাবলী প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে, তখন তার পরিমাণ ছয়টি বিশাল খণ্ড, এবং আরো কয়েকটি খণ্ড তখন প্রকাশের পথে।

আইজেনস্টাইনের শিষ্য জে লেইডা (Jay Leyda) সযত্নে আইজেনস্টাইনের জীবদ্দশায় তাঁর কিছু রচনার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। আইজেনস্টাইনের মৃত্যুর পর জে লেইডা আরো একটি সংকলন 'ফিল্ম ফর্ম' সম্পাদনা করেন ১৯৪৯ সালে।

চলচ্চিত্রের যা উপকরণ ছিলো তাতে আইজেনস্টাইনের 'কিউ ভিভা মেক্সিকো'

এবং 'ইভান দ্য টেরিবল্' দ্বিতীয় পর্ব হয়তো সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র হিসাবে অভিহিত হতে পারে। যদিও বাস্তবত তা ধরা হয় না, আইজেনস্টাইনের কাজের মাত্রা অনুযায়ী।

সত্যিই হয়তো দীর্ঘায়ু হলে আইজেনস্টাইনের কাছ থেকে আরো কয়েকটি আশ্চর্য সৃষ্টি পেতে পারতাম আমরা। কিন্তু তা হলো না, একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়ে গেলো তাঁর মৃত্যুতে।

জীবন থেকে আইজেনস্টাইনের মহাপ্রস্থান নানা ভাষায় যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে বিচ্ছেদ-বেদনার সাথে মিশে আছে তাঁর জীবনের জীবিত বছরগুলোর ব্যথা।

১৯৪৮ সালের ১৩ মার্চ তারিখে বিখ্যাত চলচ্চিত্র-সমালোচক জেম্‌স্ অ্যাগি অপর একজন চলচ্চিত্রকারের প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে আইজেনস্টাইন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"এই চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু লেখা, যে চলচ্চিত্রের মহত্ত্ব আজও শেষ হয়ে যায়নি, আর সের্গেই আইজেনস্টাইনের মৃত্যু ও বেদনাভরা জীবন সম্পর্কে লেখা, যে ব্যক্তির কাছে মাধ্যমের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলি ছিলো দীর্ঘদিন বন্দী এবং নির্যাতিত, এবং যিনি এখন কবরে শয়ান—এই দুই লেখার মধ্যে বাছতে হবে আমাকে। আমি প্রথম ব্যক্তি সম্বন্ধেই লিখছি, তার কারণ এই নয় যে মৃত্যুর থেকে জীবন সম্পর্কে কোনো আবেগপূর্ণ পক্ষপাতে ভুগছি আমি। বরং তার এই কারণ যে, আইজেনস্টাইন আমার কাছে এক মহান বীর, এবং আমি দেখছি তাঁর সম্বন্ধে যা আমি বলতে চাই, সে কথা হাজার শব্দেও বলতে পারবো না। আমি ধন্যবাদ জানাই যে, তাঁর স্বার্থেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু শেষের এই বছরগুলিতে সুপ্রচুর উস্কানি সত্ত্বেও তিনি তাঁর আত্মহত্যা এবং শহীদ হওয়া ও পাগল হওয়াকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন নিজের প্রতিভাকে শ্রেষ্ঠ কাজে লাগানোর জন্য। তাঁকে অভিনন্দিত করা যায় না তাঁর এই পলায়নের জন্য, যা তিনি নিজে কখনো চাননি।"

যদি তাই সত্যি হয় যে সের্গেই আইজেনস্টাইন এক অসময়ে প্রস্থান করেছেন, তাহলে আরো একবার তাকিয়ে দেখা যেতে পারে রাশিয়া তথা বিশ্বের চলচ্চিত্রে তিনি কী রেখে গেলেন তার দিকে।

এগিয়ে চলা ও শেষের কথা

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, ১৯৪৭ সালে, আইজেনস্টাইন তাঁর রচনা-সংকলন 'নোটস অফ এ ফিল্ম ডিরেক্টর' গ্রন্থের শেষ রচনাটি লিখেছিলেন। যদিও এর শিরোনামে ছিল শেষ করার কথা ('বাই ওয়ে অফ অ্যান এপিলগ'), কিন্তু পুরো পর্বটির শিরোনাম ছিলো 'সবসময় এগিয়ে যাওয়া' (Always Forward)। এই কথা ক'টিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবার দরকার আছে। আইজেনস্টাইন তাঁর পাঠকদের কাছে যেন কয়েকটি আহ্বান রেখেছেন, বর্তমানের অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে। সেই আহ্বান যে কতোখানি আবেগে ভরা, সেটা তাঁর ভাষাতেই পরিষ্কার। কথাগুলো হুবহু অনুবাদে হয়তো ধরা পড়ে না। তাই পাঠকের অনুভূতি দিয়ে আমরা আইজেনস্টাইনের কথাগুলো পড়তে পারি।

অন্য লোকের চিঠি পড়া আমাদের উচিত নয়। ছোটবেলা থেকেই এটা শিখে এসেছি আমরা। কিন্তু এখন আইজেনস্টাইন অন্য লোকের চিঠি উল্টেপাল্টে দেখছেন, সেগুলো তিনি পড়েছেন এবং সাগ্রহে আত্মস্থ করেছেন।

সেই চিঠিগুলো হলো চিত্রকরদের। শেরভের চিঠি, মিকেলঅ্যাঞ্জেলোর চিঠি। শিল্পীদের এই চিঠির শব্দগুলো আবেগের সাথে জড়িয়ে, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে এমনভাবে আছে, যেন তাদের পাথরের ভাস্কর্যের অসম্পূর্ণ কাজের থেকে বেরিয়ে আসছে চরিত্রগুলো, যেন পাপীরা নরকে যাচ্ছে, যেন মেদিচি কবরস্থানের ওপর ঘুমন্ত চেহারাগুলো মৃতপ্রায় স্বপ্নে পীড়িত। বোঝাই যায়, এ কথাগুলো আইজেনস্টাইন বলছেন মিকেলঅ্যাঞ্জেলোর সম্বন্ধে।

চিঠিগুলো এই ভাস্কর ও চিত্রকর লিখেছিলেন সিস্টাইন গীর্জার অভ্যন্তরে কারুকার্য করার সময়। দেহকে অস্বাভাবিকভাবে বাঁকিয়ে মাসের পর মাস কেটেছে। হাতগুলো অবশ হয়ে গেছে। চোখে প্লাস্টারের টুকরো পড়ে কষ্ট পেয়েছেন। হাত থেকে যন্ত্রপাতি পড়ে গেছে। মাথা ঘুরেছে। একটা অনড় তলের ওপর নিজের সৃষ্টিশীল কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে ভয়ংকর কষ্ট পেয়েছেন। দড়িতে ঝুলে এপাশ-ওপাশ শিল্পসৃষ্টি করেছেন।

একসময় এই দুর্দশার দিন শেষ হয়েছে। ঝোলার দড়িটা খুলে ফেলা হয়েছে। অবশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টান করা গেছে। বেঁকে-যাওয়া পিঠটাকে সোজা করা গেছে। গর্বের সাথে মাথা উঁচু করা গেছে। স্রষ্টা তাই তাকিয়ে দেখেন। সমস্ত খিলানগুলো তাঁর সামনে, পাথরগুলো যেন স্বর্গপথে।
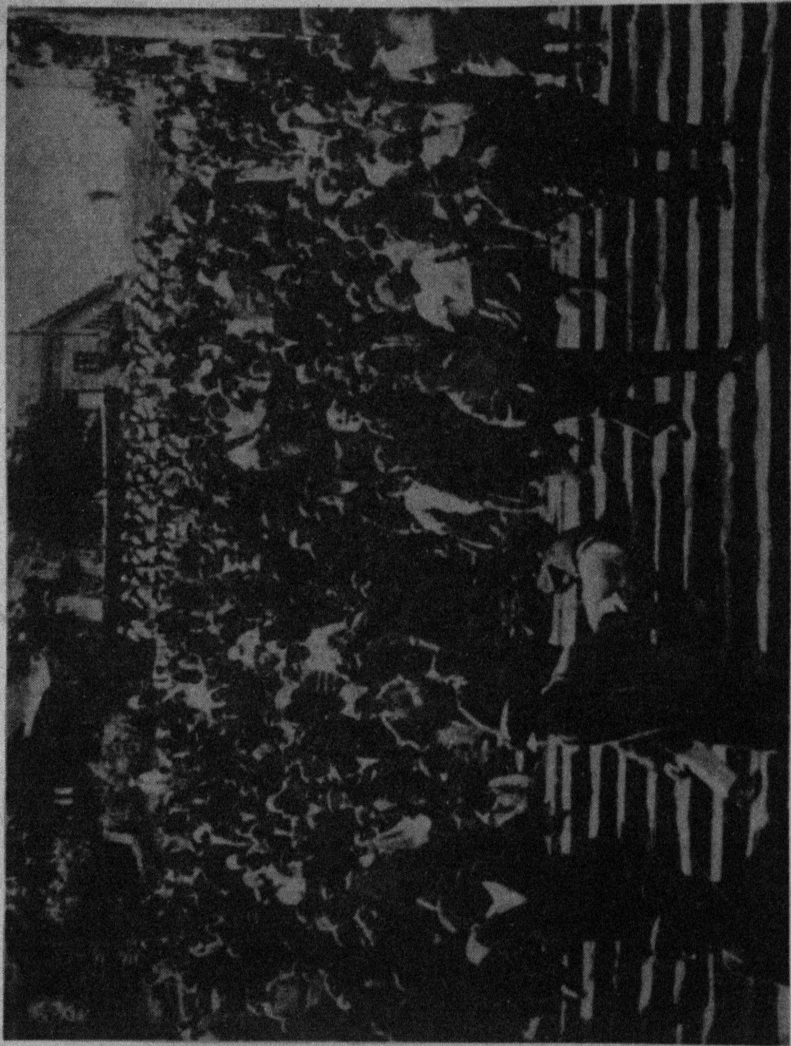
'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রে ওদেসা সিঁড়ির দৃশ্য
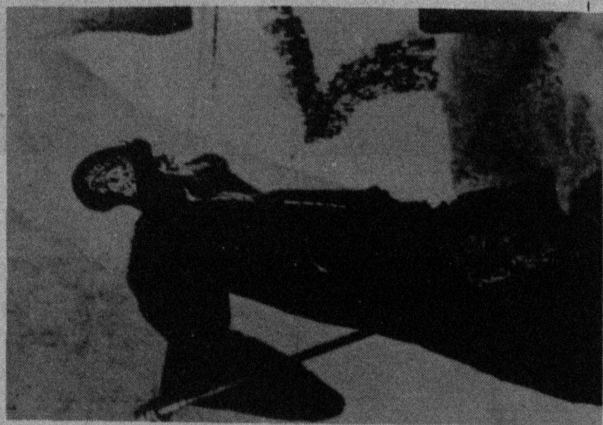
'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্'

'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বের দৃশ্য

সেই নতুন সময়ে, রেনেশাঁস শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে, মানুষের নতুন উদ্দীপনার বিজয়ের শিখরে পেঁছোয়। কিছু সংকীর্ণ মনের লোক বলে—"রেনেশাঁসের বিরাট শিল্পীদের সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায়, এমন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য কোথায় পাওয়া যাবে?"

আইজেনস্টাইনের মনে হয়, সেদিনের সেই দেয়ালচিত্র থেকে অনেক দূরে সরে আসা এক শিল্পকলায় তাঁর যুগ নিজের ব্যক্তিত্বকে সংরক্ষিত করবে, যেমন সে সময়কার গৃহ-প্রাসাদের সাথে আজকের গগনচুম্বী অট্টালিকার পার্থক্য! তখনকার জানালার রঙীন কাচের কাজের থেকে আজকের শিল্পকলার দূরত্ব, যেমন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির অসমসাহসিক পরিকল্পনার থেকে আজকের জেট প্লেন ভিন্ন। আজকের বিজ্ঞানীদের সূত্রের সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ যেমন তখনকার থেকে আলাদা। তখনকার বিষের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা থেকে আজকের পারমাণবিক বোমার তফাৎ। শিল্পকলার নতুন কাজগুলির সাথে অতীতের যুগের পার্থক্য রয়েছে।

শিল্পকলার অন্তর্বস্তুতেও অতীতের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। নতুনের সঙ্গে পুরনোর কোনো প্রতিযোগিতা এটা নয়।

একটা নতুন শিল্পকলা জন্ম নেবে চিত্রকলা ও নাটক, সঙ্গীত ও ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও নৃত্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানুষ, দৃশ্য অবয়ব এবং উচ্চারিত শব্দের মিশ্রণে। এই ধরণের মিশ্রণ অতীতে ছিলো না। সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাসে এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি।

সেই নতুন শিল্পকলা হলো চলচ্চিত্র। এর মিশ্রণের খুব প্রাথমিক চেহারা সংস্কৃতির প্রথম যুগে গ্রীকরা ভেবেছিলেন। তারপর অনেকেই সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন। একসময় এটা কল্পনা ছিলো, কিন্তু আজকে তা বাস্তব।

কখনো এমন সময় এসেছে যখন মানবসমাজের এক অংশ কর্তৃক অপর অংশকে শোষণ করার অবসানের দাবি উঠেছে, কোনো জাতিকে ঔপনিবেশিকদের দাসত্ব বন্ধনে বাঁধার বিরুদ্ধে দাবি উঠেছে, বিজয়ীদের হাতে মানুষের নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাবি উঠেছে।

এইসব দিনগুলোতে পৃথিবীর সব দেশেই এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব ছিলো। তত্ত্ব নয়, ব্যবহারিক কাজ ছিলো। মরীচিকা নয়, বাস্তব জীবন ছিলো।

কাজেই আইজেনস্টাইনের মনে হয়, তাঁর নিজের আশ্চর্য দেশ রাশিয়ার নেতারা খুব স্বাভাবিক কারণেই সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে চলচ্চিত্রকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। এটাই খুব স্বাভাবিক যে, সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলাটিকে তাঁরা সব থেকে প্রগতিশীল করে তুলতে চেয়েছেন। এমন একটি শিল্পকলা, যা বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের প্রকাশভঙ্গীর

উপযুক্ত, যে শিল্পকলা নতুন মানুষের ভাবমূর্তি বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত করতে সমর্থ।

এই নতুন শিল্পকলার যে উপায় ও উপকরণ, সেটাকে কখনো অতীতের কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এটা সেই শত সহস্র রাজমিস্ত্রী, ভাস্কর এবং স্থপতির শ্রমের ব্যাপার নয় যারা আশ্চর্য-সুন্দর ক্যাথিড্রাল বানিয়েছিলো, কিন্তু যাদের নাম হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। এই নতুন শিল্পকলা হলো সেই সব প্রতিভা ও একক ব্যক্তিদের সমমর্যাদা ও সমন্বয়, যেখানে শব্দের ক্ষেত্রে কাজ, নাটক, আলোকচিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, আলোকচিত্রের যান্ত্রিক কৌশল, ল্যাবরেটরি এবং পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটে।

চলচ্চিত্রের নিজের উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে রয়েছে লক্ষ মানুষের ধারণার প্রকাশ। তা না হলে, লক্ষ মানুষ দেখতে যাবে কেন? তাই এই নতুন শিল্পকলা একটা যূথবদ্ধতা এবং সহযোগিতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গণতন্ত্রের যুগে হাজির হয়। এমন যৌথভাবে কাজ করার ঘটনা নিঃসঙ্গ মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর মাসের পর মাস একক কাজের মধ্যে ছিলো না।

এই নতুন শিল্পকলাকে কি প্রকৃতির ওপর মানুষের বিজয়ের প্রক্রিয়ার মতো মনে হয় না? নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে নতুন চেতনার আকৃতির পথিকৃৎ হয়ে ওঠে এই শিল্পকলা।

আমাদের নতুন কাজকর্মের জন্য, বিকাশ ঘটাতে হবে আমাদের চেতনার। কাজকর্ম করার জন্য ধারালো করে তুলতে হবে নিজেদের।

এ বক্তব্যের শেষে আইজেনস্টাইন আহ্বান রাখছেন—"ভবিষ্যতের জন্য আমরা অতীতের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবো। আমরা নিশ্চয়ই নিরলসভাবে কাজ করবো। আমরা অবশ্যই অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবো। শিল্পকলার নতুন যুগকে আমরা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করব। আমরা নিশ্চয়ই কাজ, কাজ, এবং কাজ করবো—সেই শিল্পকলার নামে, যে জন্মেছে আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবনা-চিন্তাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে।"

আইজেনস্টাইনের মূল্যায়নের সূত্র

আইজেনস্টাইনের কাছে সরাসরি শিক্ষালাভ করেছেন কয়েকজন, যাঁদের মধ্যে জে. লেইডা অন্যতম। আইজেনস্টাইনের রচনা-সংকলন ইংরেজিতে অনুবাদ ও সম্পাদনা করার সব থেকে বড়ো কৃতিত্ব লেইডার।

আইজেনস্টাইনের রচনাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে জে. লেইডা প্রথমে 'ফিল্ম

সেন্স' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন, এটি প্রকাশিত হয়েছিলো আইজেনস্টাইনের জীবদ্দশায়। এর পরে জে. লেইডা, আইজেনস্টাইনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের নির্বাচিত সংকলন 'ফিল্ম ফর্ম' সম্পাদনা করেন। কিন্তু 'ফিল্ম ফর্ম' প্রকাশিত হয় আইজেনস্টাইনের মৃত্যুর পরের বছর। তাই জে. লেইডার এই মূল্যায়ন সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায়, আইজেনস্টাইনের মূল্যবান জীবন ও কর্মকে প্রকাশ করে।

আইজেনস্টাইন তাঁর কাজ ফেলে প্রস্থান করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ কাজগুলি দেখে, তাঁর মৃত্যুর আঘাতে খুব সামান্যই সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কারণ, তাঁর সমস্ত সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রগুলি দেখিয়ে দেয় যে, তাঁর চলচ্চিত্র মাধ্যমের বীরত্বপূর্ণ এবং নিরলস প্রসারের কাজ চলে যেতো সেই সীমানা ছাড়িয়ে, যে সীমানা অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিল্পীরা চলচ্চিত্রের চারপাশে তৈরি করেছে।

আইজেনস্টাইনের এক পদক্ষেপ এগোনো প্রতিশ্রুতি দেয়, পরবর্তী অজানা শত পদক্ষেপের। তাঁর ঊনপঞ্চাশ বছরে মৃত্যু, এমনই অনেক পদক্ষেপকে বঞ্চিত করেছে।

মহান শিক্ষক হিসাবে আইজেনস্টাইন আরো অধিকতর মূল্যবান ধারা তৈরি করেছেন। তাঁর ছাত্রদের এবং তাঁর তত্ত্বের বিপুল সংগ্রহ থেকে আমরা আরো ফল আশা করি, এমন কি আমাদের প্রজন্ম ছাড়িয়ে—লিখছেন জে. লেইডা। বাক্ নাকি বলেছিলেন—"সে-ই পারে সবচেয়ে বেশি শেখাতে, যে সবচেয়ে বেশি জানে।" তাই আইজেনস্টাইনেয় কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো যে, শুধুমাত্র তাঁর নিজের ছয়টি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রেই তিনি তাঁর অপরিমেয় জ্ঞানকে ব্যবহার করেননি, বরঞ্চ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অসংখ্য শিষ্য ও ছাত্রকে তাঁর অপরিমেয় জ্ঞান দিয়ে গেছেন।

আইজেনস্টাইনের কল্পনার নিয়ত উৎস ছিলো, শিল্পী হিসাবে এবং শিক্ষক হিসাবে, সমাজে শিল্পের বাস্তব প্রভাব সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা। যে প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় সমাজের প্রতি সমান শক্তিশালী দায়িত্বের চেতনার মধ্যে। এই দুটি জিনিস আইজেনস্টাইনের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তেরই নির্ধারক শক্তি। আর এই জন্যই তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বে তিনি প্রকৃতিবাদের উপরিতলের প্রতি ঝুঁকতে চাননি। প্রধান এবং কঠিন সমস্যাকে এড়াতে চাওয়ার মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন অনিচ্ছা, অলসতা, অশিক্ষা এবং প্রায়শই সুবিধাবাদ।

একজন চলচ্চিত্রশিল্পীর কাজ হলো সমস্ত শিল্পকলার গভীর অনুসন্ধানের সাহায্যে তার নিজের নীতিকে আয়ত্ত করা, জীবনের সমস্ত স্তর থেকে শিক্ষা নেওয়া। নিজের উপলব্ধির সাথে এই শিক্ষার পরিমাপ করতে শিখতে হবে তাকে।

চলচ্চিত্রে অন্য শিল্পকলার থেকেও বেশি সম্ভাবনা থাকে প্রাথমিক বিষয়কে এড়িয়ে যাবার। কিন্তু আইজেনস্টাইন যখন চলচ্চিত্রকে মহত্তম প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন, তিনি যেন এক যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে নামেন। এক অবিরাম যুদ্ধ—অসততা, সন্তোষ আর ভাসা-ভাসা কাজের বিরুদ্ধে। এ কাজ করতে গিয়ে এক প্রত্যয়ী শিল্পীর মতো উদ্ধতভাবে লড়াই করেছেন তিনি। তিনি জানতেন তাঁকে আমাদের কতোটুকু দরকার, সেটা আমরা স্বীকার করি বা না করি। তাঁর লক্ষ্য ছিলো এমন একটি কাব্য যেটা শুধু চলচ্চিত্রেই সম্ভব, এমন এক বাস্তবতা যা চলচ্চিত্রশিল্পীর শক্তির সমস্ত উপকরণ দিয়ে নিজস্ব উচ্চতায় পেঁছোয়।

আইজেনস্টাইনের ক্রিয়াশীল লক্ষ্য আর তার সার্থকতাকে, কোনো শ্রেণীবিভাগ বা ছাপ দিয়ে বোঝানো যায় না।

তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি খুব সরল বা প্রতিভাবান লেখক নন। তাঁর ধ্যান-ধারণার এবং প্রকাশের স্বচ্ছতা থেকে যে শক্তি আসতো, তার ওপরেই নির্ভর করতেন তিনি। তাঁর লেখার প্রথম পাঠক, প্রথম শ্রোতাদের মতোই তাঁর সহ-চলচ্চিত্রকার এবং ছাত্ররা। কখনো কখনো বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও এঁরা এমন এক উৎসাহ ও উদ্দীপনার যোগান দিতেন যা মস্কো-লেনিনগ্রাদ-কিয়েভের বাইরে ভাবাই যেতো না।

প্রকৃতিবাদ এবং অলসতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানোর অসুবিধা অনেক। যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে তাকে 'প্রকৃতি-বিরোধী' ছাপ মারা হয়। তাই তাকে তার কাজে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সত্যতা প্রমাণ করতে হয়। আইজেনস্টাইনের প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আর তাঁর তত্ত্বগুলি অসংখ্য রচনায় ছড়িয়ে আছে, যার শুধু পরিমাণই যে কোনো চলচ্চিত্রকারের কাজকে ছাপিয়ে যায়।

জে. লেইডার লেখা ভূমিকায় আইজেনস্টাইন সম্পর্কে মূল্যায়নের এইটুকুই সারাংশ।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র নতুন প্রজন্ম এবং নতুন যুগের সূচনা করেছিলো কিনা, ইতিহাসের দিকে তাকালে হয়তো বোঝা যাবে।

'পোটেমকিন' পরবর্তী রাশিয়ার চলচ্চিত্র প্রজন্ম

আইজেনস্টাইনের পরবর্তী প্রজন্মের চলচ্চিত্রকার কারা? এ প্রশ্নের সমাধান ঠিক বয়েস দিয়ে হবে না। অর্থাৎ আইজেনস্টাইনের যাঁরা বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁরাই পরবর্তী প্রজন্মের চলচ্চিত্রকার, এমন সরলীকরণ করা যায় না। তবুও আইজেনস্টাইন যখন খ্যাতির শিখরে, তখন সোভিয়েত রাশিয়ায় পুদভ্‌কিন,

কুলেশভ্, দভ্ঝেন্কো, ভের্তভ্ ইত্যাদিরা ছাড়াও অন্য চলচ্চিত্রকাররা তৈরি হচ্ছিলেন।

এই দ্বিতীয় প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারদের অন্যতম মিখাইল ইলাইচ রম্ (Mikhail Ilyitch Romm)। যিনি নিজেই একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন—'দ্বিতীয় প্রজন্ম'।

রমের কাছে আইজেনস্টাইন, কুলেশভ্, পুদভ্কিন ইত্যাদিরা বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই তিনের দশকে রম্ যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেছিলেন, তখন আগের প্রজন্মের খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকাররা তাঁদের শ্রেষ্ঠ বা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রগুলি তৈরি করে ফেলেছেন। রমের কাছে আইজেনস্টাইন, পুদভ্কিন, দভ্ঝেনকোর চলচ্চিত্র একটি যুগের প্রতীক। তাঁরা কাজ করেছেন চরম প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যে, লড়াই করেছেন বিপ্লবী এবং প্রগতিশীল শিল্পকলার জন্য।

রম্ এবং তাঁর সমসাময়িকদের কাছে, যাঁরা দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি ছিলেন, চলচ্চিত্র নিয়ে তেমন কিছু যেন করার ছিল না।

রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনের উত্থান পতনের সাথে সাথে, অন্যান্য দেশের মতোই রাশিয়ার চলচ্চিত্রেও উত্থান পতন ঘটতে থাকে। কোনো চলচ্চিত্রকার ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান, আবার কেউ কেউ নতুন করে শুরু করনে। তবে ১৯৩০ সাল নাগাদ রাশিয়ার চলচ্চিত্রে এক অদ্ভুত ভাটা দেখা যায়। খুব কম সংখ্যক চলচ্চিত্র তৈরি হয়। আবা সেই সময়েই নতুন কয়েকজন চলচ্চিত্রকারের আবির্ভাব ঘটে।

মিখাইল রম্ তাঁর জীবনের প্রথম চলচ্চিত্র মপ্যাঁসার (Maupassant) 'বুল্ দ্য সি' (Boule de Suif) পরিচালনা করতে শুরু করেন এই তিনের দশকেই এবং প্রচুর বিতর্কের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রটি প্রস্তুত হয় ১৯৩৪ সালে। এই চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের পর্ব যখন শুরু হয়, তার আগের দিন রম্ আইজেনস্টাইনের কাছে গিয়েছিলেন দু'একটি পরামর্শ নিতে। আইজেনস্টাইনের সাথে রমের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দুটি প্রজন্মের মধ্যেকার ব্যবধান ধরা পড়ে।

"তুমি প্রথমে কোন দৃশ্যটা দিয়ে শুরু করবে?"—আইজেনস্টাইন প্রশ্ন করেন।

"সবচেয়ে সহজটা। দরজার কাছে একজোড়া জুতোর ক্লোজ-আপ।"—উত্তর দেন রম্।

"তুমি কি আগামীকালই দৃশ্যগ্রহণ শুরু করছো? ধরো তুমি তার পরের দিন একটা ট্রাম দুর্ঘটনায় পড়লে। আমি তোমার চলচ্চিত্রের অংশ নিয়ে গেলাম ফিল্ম ইন্সটিটিউটে এবং ছাত্রদেরকে বললাম এক মহান চলচ্চিত্রকারকে মৃত্যু

ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এই চলচ্চিত্রকার মাত্র একটি দৃশ্য গ্রহণ করতে পেরেছেন, আর সেই দৃশ্যটি অমর। আমরা তাই জাদুঘরে এই অমর জুতোজোড়ার দৃশ্য প্রদর্শন করব।"

"বুঝলাম।" উত্তর দিলেন রম্।

"অবশ্য তোমাকে ট্রাম দুর্ঘটনায় পড়তে হবে না।"

"কিন্তু তারপর ? আমি কেমনভাবে দৃশ্যগ্রহণ করবো ?"

"সেই একইভাবে। প্রত্যেকটা ফ্রেম, প্রত্যেকটা দৃশ্য।"

আইজেনস্টাইন রম্‌কে বলেছিলেন যে, একটি দৃশ্যের আগে মপ্যাসাঁ ছ'পৃষ্ঠা ধরে সমস্ত পরিবেশটির বিবরণ দিয়েছেন, শহরে জার্মান সৈন্যের প্রবেশ, শত্রুর প্রবেশের ফলে পুঁজিবাদীদের প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ জার্মানদের প্রবেশের একটা সামগ্রিক বর্ণনা। রম্ কিন্তু এই সবই বাদ দিয়েছিলেন।

আইজেনস্টাইন তাঁকে বলেছিলেন—"আমি হলে এই সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি রাখতাম। আমি তোমাকে 'বুল্ দা সি' চলচ্চিত্র তৈরিতে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তুমি যা দেখাতে চাও তেমন করে দৃশ্যগ্রহণ করো, আর আমি যা দেখাতে চাই তেমন করে আমি দৃশ্যগ্রহণ করি। এমনকি আমাদের নায়ক-নায়িকারাও ভিন্ন হবে।"

আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র দৃশ্যাবলীর বিশালত্ব দিয়ে তৈরি অসংখ্য মানুষের প্রতিফলন। তাই একটা ছোটো বস্তুর খুঁটিনাটি তাঁর কাছে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আর রমের কাছে সেটাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।

রমের 'বুল্ দ্য সি' চলচ্চিত্র সোভিয়েত রাশিয়ায় শেষ নির্বাক চলচ্চিত্র। তিনি তারপরে অনেকগুলি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন, যেমন—'দ্য থার্টিন' (১৯৩৬), 'লেনিন ইন অক্টোবর' (১৯৩৭), 'লেনিন ইন ১৯১৮' (১৯৩৯), 'দ্য ড্রিম' (১৯৩৯) ইত্যাদি।

১৯০১ সালের ২৪ জানুয়ারি মিখাইল রম্ জন্মেছিলেন। মস্কোতে ভাস্কর্যের প্রথাগত শিক্ষার ছাত্র ছিলেন তিনি। জীবনের শেষ দিকে রম্ সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারি চলচ্চিত্র শিক্ষালয় 'ভি-জি-আই-কে' (V-G-I-K) প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় একটা সময় আসে যখন প্রায় সমস্ত তরুণ চিত্রনাট্যকার চলচ্চিত্র পরিচালনায় নেমে পড়েছিলো—কেউ আগে, কেউ পরে। আবার কেউ কেউ বয়সে আইজেনস্টাইনের কনিষ্ঠ না হলেও, চলচ্চিত্র শুরু করেছেন কিছুটা দেরিতে।

একটু পুরনোদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মার্ক দনস্কয় (Mark Donskoy)। জন্ম ১৯০১ সালে। সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছেন দনস্কয়। এমনকি ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের চলচ্চিত্রকারদের তালিকায়

শ্রেষ্ঠ উনত্রিশজনের মধ্যে মার্ক দনস্কয়ের নাম ছিল। আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন এবং দভঝেনকোর পাশাপাশি দনস্কয়ের নাম রাশিয়ার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত।

দনস্কয়ের চলচ্চিত্রের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য ছিলো—তাঁর চলচ্চিত্র যেমন একদিকে সমাজ ও জীবনের শোষণ ও সংগ্রামকে খোলাখুলি প্রতিফলিত করত, তেমনি রাশিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন ও সাহিত্যকে তুলে ধরত।

ম্যাক্সিম গোর্কির সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর আত্মজীবনী এবং 'মা'-কে চলচ্চিত্রে রূপ দেন দনস্কয়। গোর্কির ছেলেবেলার পর্ব থেকে শুরু করে পরপর তিনটি পর্বে আত্মজীবনীটি শেষ করেন। পুদোভকিনের বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র 'মা' মুক্তি পাওয়ার অনেক বছর পর, ১৯৫৫ সালে আরো একবার 'মা' চলচ্চিত্রটি তৈরি করেন দনস্কয়।

ব্যক্তিগতভাবে দনস্কয়ের কারাগারে বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নিজের জীবনে দনস্কয় বারবার করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের প্রতি তাঁর আনুগত্য দেখিয়েছেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছ থেকে সেইমতো সম্মান ও পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দনস্কয়ের পদ্ধতি ছিলো আইজেনস্টাইনের থেকে অনেকটাই আলাদা। কাজেই আইজেনস্টাইন যখন রাশিয়ার জনগণের চরিত্রকে ঐতিহাসিক ঘটনার পট-ভূমিতে চিত্রায়িত করতে চাইছেন, দনস্কয় তখন ম্যাক্সিম গোর্কির বা নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির উপন্যাসকে চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু করেছেন। কিন্তু দনস্কয়ের চলচ্চিত্রে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী এসে পড়েছে, তখন তিনি আইজেনস্টাইনের থেকে অন্য অর্থেও পৃথক। তাঁর অন্যতম চলচ্চিত্র 'দ্য রেইনবো' (The Rainbow) ১৯৪৩ সালে তৈরি হয়। এই চলচ্চিত্রের ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী চলচ্চিত্রের নয়া-বাস্তবতার প্রভাব এসে পড়ে।

আইজেনস্টাইনের সমসাময়িক, কিন্তু চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতায় কনিষ্ঠ আলেক-জান্দার পেত্রোভিচ দভঝেনকো-র (Alexander Petrovitch Dov-zhenko) জন্ম ১৮৯৪ সালে। সেদিক থেকে বয়সে আইজেনস্টাইনের জ্যেষ্ঠ তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন উক্রেইনের কৃষক সন্তান। একসময় তিনি সংবাদপত্রে পেশাগতভাবে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন।

কিন্তু ৩২ বছর বয়সে তাঁর মনে হলো—চিত্রকলার যুগ শেষ হয়ে গেছে, এবার চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবতে হবে। কমেডি চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসাবে শুরু করেন তিনি। কিন্তু ব্যঙ্গ, লোকসাহিত্য, নাটক ইত্যাদির মিশ্রণ আশ্চর্যভাবে বিস্তৃত হয় তাঁর পরবর্তী চলচ্চিত্রগুলিতে। দভঝেনকোর 'আর্থ' (১৯৩০) সম্ভবত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দভঝেনকো জায়গা

করে নিয়েছেন নিজের প্রতিভায়। আইজেনস্টাইনের নিজের ভাষাতেই শিল্পী হিসাবে দভ্‌ঝেন্‌কোর বর্ণনা পাওয়া যায়, ১৯৪০ সালের নিবন্ধে। আইজেন-স্টাইন লিখেছেন—

প্রত্যেক শিল্পীর জীবনের আশ্চর্য মুহূর্ত হলো, যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি শিল্পী হয়ে উঠেছেন, যখন তিনি শিল্পী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। এমনই এক অভিজ্ঞতা হয়েছিলো ভবিষ্যতের পৃথিবীর এক সৃষ্টিশীল প্রতিভার জন্মলগ্নে।

তখন আইজেনস্টাইনের 'পোতেমকিন্' এবং পুদভ্‌কিনের 'মা' চলচ্চিত্র দুটি বছর-খানেক হলো মুক্তি পেয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় খ্যাতি লাভ করছে। একদিন এক নতুন চলচ্চিত্র 'জ্‌ভেনিগোরা' (Zvenigora) দেখার জন্য আইজেনস্টাইন ও পুদভ্‌কিন মিরার অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হলেন। এই নতুন চলচ্চিত্রটির কোনো অর্থ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

অনুষ্ঠান শুরু হলো চলচ্চিত্রকার সম্পর্কে তাড়াহুড়ো করে খানিকটা পরিচয় দিয়ে। চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করা হলো একটি পর্দা ও দুটি আয়নায়। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনটি পর্দার মধ্যে।

আইজেনস্টাইন ও পুদভ্‌কিন সেদিনই পরিচিত হলেন আলেকজান্দার দভ্‌ঝেনকোর চলচ্চিত্র সৃষ্টির সাথে। এক আশ্চর্য কল্পনার জগতে দর্শকদের নিয়ে গেলো চলচিচত্রটি, যা দেখে আইজেনস্টাইন মুগ্ধ। যখন চলচ্চিত্র প্রদর্শন শেষ হলো তখন সমস্ত দর্শকরা উঠে দাঁড়ালো নির্বাক হয়ে। এ এমন একটা পরিবেশ যা চলচ্চিত্রশিল্পে নতুন এক প্রতিভার আবির্ভাবের অনুভূতি বয়ে আনে।

পরের দিন সকালেও আইজেনস্টাইন আচ্ছন্ন হয়ে আছেন দভ্‌ঝেন্‌কোর আশ্চর্য চলচ্চিত্রটি দেখার স্মৃতিতে। নিজের একটা নিবন্ধ লেখার কাজ শেষ হলো না, তাঁর মন তখন সেই তরুণ দভ্‌ঝেন্‌কোর শিল্পকলায় মুগ্ধ হয়ে আছে। আইজেনস্টাইন দভ্‌ঝেন্‌কো সম্পর্কে বলেছেন—মৌলিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক প্রতিভা। যখন প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলে উঠলো তখন আইজেনস্টাইন প্রত্যক্ষ করেছেন চলচ্চিত্র বিকাশের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। প্রেক্ষাগৃহের দর্শকরা তাকিয়েছিলো আইজেনস্টাইন ও পুদভ্‌কিনের মুখের দিকে। একটা কিছু তো তাঁদেরকে বলতেই হয়। তাঁদেরকে বলতেই হয় যে, এইমাত্র তাঁরা এক আশ্চর্য চলচ্চিত্র দেখলেন, যার পরিচালক ততোধিক আশ্চর্য এক মানুষ।

রোগা চেহারার দভ্‌ঝেন্‌কো টান হয়ে এগিয়ে এলেন স্মিত হাসি নিয়ে। পুদভ্‌কিন ও আইজেনস্টাইন তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালেন। শুরু হলো দভ্‌ঝেন্‌কোর চলচ্চিত্র যাত্রাপথ।

১৯৩০ সালের ৮ এপ্রিল দভ্‌ঝেন্‌কোর 'আর্থ' চলচ্চিত্রটি রাশিয়ায় প্রথম

প্রদর্শিত হয়। এই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে রয়েছে উক্রেইনের গ্রামে কৃষকদের জীবনে যৌথ খামারের প্রভাবে পরিবর্তন ও রূপান্তর। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দভ্‌ঝেন্‌কো 'আর্থ' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য বদল করেছিলেন, যার সাথে মূল চলচ্চিত্র মেলে না।

দভ্‌ঝেন্‌কোর চলচ্চিত্রে সেই সময়কার সমাজতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তাগুলি প্রতিফলিত। তাঁর চলচ্চিত্রে নিজের কৃষকজীবনের অভিজ্ঞতাও প্রতিফলিত। তাই 'আর্থ' চলচ্চিত্র অপূর্বভাবে কৃষকজীবনকে দেখাতে পেরেছে। দভ্‌ঝেন্‌কো নিজেই বলেছেন—একটা খড়ভর্তি টানা-গাড়ির ওপরে শুয়ে ঘুমোতে ভালোবাসতেন তিনি। আর ভালোবাসতেন তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় যদি গাড়িটা টেনে নিয়ে কেউ তাঁর কুটিরের সামনে হাজির করতো। ভালোবাসতেন ফসল-কাটার যন্ত্রের কিচ্‌মিচ্‌ আওয়াজ, ভালোবাসতেন বাগানে আর ক্ষেতের পাখিদের ডাক আর ঝোপের মধ্যে থেকে ভেসে আসা ব্যাঙের ডাক। সন্ধ্যেবেলায় যখন কয়েকটা আপেল ঝরে পড়তো গোধূলির আলোয়, ঘাসের ওপর সেটা যেন একটা গোপন বিস্ময়ের বস্তু। ফল ঝরে পড়াটা এক রহস্য। পৃথিবীতে ভালোবাসার মতো আর কিছু যদি থাকে তাহলে তা সঙ্গীত।

এই সব মিলিয়েই দভ্‌ঝেন্‌কোর বাস্তব ও কল্পনার জগৎ।

তিনের দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র অনেকটাই অসুবিধায় পড়েছিলো। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে অনেকেই বিতাড়িত। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাথে সাথে নিস্তেজ হয়ে পড়লো রাশিয়ার চলচ্চিত্র।

হাজার হাজার মানুষকে যখন সাইবেরিয়ার কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, তখন রাশিয়ার প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রকার পাইরিয়েভ্‌ (Pyriev) চলচ্চিত্রে দেখাচ্ছেন—পছন্দমতো অফুরন্ত খাদ্যদ্রব্য সাজিয়ে ভোজসভায় বর্ণাঢ্য জাতীয় পোশাক পরে নাচগান করছে গ্রামবাসীরা। এসময়ে স্তালিনের শাসনে চলচ্চিত্র প্রায়ই বাধ্য হয়েছে ছকবাঁধা ইতিহাসকে বিকৃত করতে। বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই সোভিয়েত চলচ্চিত্রের আরো সংকট দেখা দিলো।

আইজেনস্টাইনের 'ইভান' চলচ্চিত্রটির দ্বিতীয় পর্ব আটকে রইলো প্রায় বারো বছর। ভের্তভ্‌ ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত শুধুই সংবাদ-চলচ্চিত্র তৈরিতে ব্যস্ত থেকেছেন। মৃত্যুর সময় ভের্তভ্‌কে মানুষ ভুলে গিয়েছিলো, বাতিল করে দিয়েছিলো। দভ্‌ঝেন্‌কো 'লাইফ ইন্‌ ব্লুম্‌' (Life in Bloossom, ১৯৪৯) চলচ্চিত্রটি তৈরি করেছিলেন স্বদেশের সাদামাটা বাজারের জন্য। ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনো চলচ্চিত্র তৈরি করেননি দভ্‌ঝেন্‌কো। পুদভ্‌কিন্‌ প্রায় বাধ্যই হয়েছেন গোটা দুয়েক সাদামাটা জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র তৈরি করতে।

তাই দুয়ের দশকের স্বর্ণযুগকে আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিতে, সোভিয়েত রাশিয়ায় নতুন চলচ্চিত্রকারদের একটি তরঙ্গ এসেছে পাঁচের দশকে। এই পাঁচের দশক থেকে নতুন সংগ্রামও শুরু হয়েছে ছয়ের দশক ছাপিয়ে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকে আবার বিশ্বের দরবারে হাজির করার।

এই নতুন প্রজন্ম একই সাথে অসাধারণ বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রে। এইসব চলচ্চিত্রকারদের অনেকেরই জন্ম তিনের দশকে বা দুয়ের দশকে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গ্রিগোরি চুখ্রাই-এর (Grigori Chukhrai) 'দ্য ফর্টি ফার্স্ট' (The Forty First, ১৯৫৬), আলেকজান্দার রাজুম্নি-র (Alexander Razumny) 'ইগ্‌নোতাস কেম ব্যাক হোম' (Ignotas Came Back Home, ১৯৫৬), তেনগিজ আবুলাদ্‌জ (Tengiz Abuladze) এবং রেজো চ্‌খিদ্‌জে-র (Rezo Chkheidze) 'লুর্‌দ্‌ঝা ম্যাগদানি' (Lurdzha Magdany, ১৯৫৬), মারলেন খুট্‌সিয়েভ (Marlen Khutsiev) এবং ফেলিক্স মিরোনার-এর (Felix Mironer) 'স্প্রিং ইন্ জারেচানাইয়া স্ট্রিট্' (Spring in Zarechanaya Street, ১৯৫৬), ভ্লাদিমির ভেনগেরভ-এর (Vladimir Vengerov) 'টু ক্যাপটেনস্' (Two Captains, ১৯৫৬), মিখাইল কালাতোজোভ-এর (Mikhail Kalatozov) 'দ্য ক্রেনস্ আর ফ্লাইং' (The Cranes are Flying, ১৯৫৭), মিখাইল চিয়াউরেলি-র (Mikhail Chiaureli) 'অটারস্ উইডো' (Otar's Widow, ১৯৫৭), মিখাইল কালিক (Mikhail Kalik) এবং বোরিস রিটসারেভ-এর (Boris Rytsarev) 'চিফ্‌টেন্ কোদ্‌র্' (Chieftain Kodr, ১৯৫৮), আলেকজান্দার ফেয়নজিমার-এর (Alexander Fainzimmer) 'দ্য গার্ল উইথ দ্য গিটার (The Girl With the Guitar, ১৯৫৮), ভিটাউটাস ঝালাকাইয়াভিচস-এর (Vitautas Zhalakyavichos), 'অ্যাডাম ওয়ান্টস্ টু বি এ ম্যান' (Adam Wants to be a Man, ১৯৫৯), গ্রিগোরি চুখারি-র (Grigori Chukhari) 'ব্যালাড অফ এ শোলজার' (Ballad of a Soldier, ১৯৫৯), সের্গেই বোন্দারচুক-এর (Sergei Bondarchuk) 'ডেস্টিনি অফ এ ম্যান' (Destiny of a Man, ১৯৫৯), মিখাইল কালাতোঝোভ-এর (Mikhail Kalatozov) 'দ্য লেটার দ্যাট ওয়াজ নট সেন্ট' (The Letter that was not sent, ১৯৫৯), ভিটাউটাস ঝালাকাইয়াভিচুস্ (Vitautas Zhalakyavichus), বালিস ব্রাৎকাউস্কাস (Balis Bratkauskas), মারিওনাস গেদ্রিস (Mariones Gedris) এবং আরুনাস ঝেব্রুনাস-এর (Arunas Zhebrunas) 'লিভিং হিরোস' (Living Heroes, ১৯৫৯), মার্লেন কুৎসিয়েভের (Marlen Khutsiev) 'টু

ফায়োডোর্স' (Two Fyodors, ১৯৫৯), অতার অ্যাবেসত্দ্জে (Otar Abesadze) এবং মেরাব কোকোচাসভিলির (Merab Kokochasvili) 'ফ্রম হাউস টু হাউস্' (From House to House, ১৯৬০), জোসেফ হাইফিৎজ-এর (Joseph Heifitz) 'দ্য লেডি উইথ এ লিটল ডগ (The Lady with a Little Dog, ১৯৬০), মিখাইল কালিক-এর (Mikhail Kalik) 'লালাবাই' (Lullaby, ১৯৬০). গিওর্গি দ্যানেলিয়া (Georgi Danelia) এবং ইগর তালানকিন-এর (Igor Talankin) 'স্প্লেনডিড ডস্' (সেরিওঝা) [Splendid Das (Seriozha), ১৯৬০], আন্দ্রেই তার্কোভ্স্কি-র (Andrei Tarkovsky) 'দ্য স্টিম্ রোলার অ্যান্ড দ্য ভায়োলিন' (The Steam Roller and the Violin, ১৯৬০) এবং গিওর্গি দানেলিয়া (Georgi Danelia) ও ইগর তালানকিন-এর (Igar Talankin) 'দে আর অলসো পিপল' (They are also People, ১৯৬০)।

লক্ষণীয়, আইজেনস্টাইনের 'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পায় ১৯৫৮ সালে। তখন নতুন প্রজন্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রের পুনরুজ্জীবনের।

সের্গেই পারাদ্ঝানভ্ (Sergei Paradzhanov) এবং য়ুরি ইলাইএন্কো (Yuri Ilyenko) নির্মিত 'ম্যাডোস অফ আওয়ার ফরগটন্ অ্যানসেস্টরস্' চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৬৫ সালে এবং এই চলচ্চিত্রটি ১৬টির ওপর আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। আইজেনস্টাইনের খ্যাতির পরেই এই প্রথম রুশ একটি চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এতোখানি খ্যাতি লাভ করলো।

সরকারি চলচ্চিত্র শিক্ষালয়ে একসময় প্রচুর সময় দিয়েছেন আইজেনস্টাইন। সের্গেই ভাসিলিয়েভের (Sergei Vasiliev) মতো শিষ্যদের নিয়ে তিনি ১৯২৮ সালে পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র কর্মশালার প্রধান হিসাবে কাজ করেন।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সালের সময়কালে পেশাদার চলচ্চিত্র পরিচালনার প্রাথমিক কর্মসূচী ও পাঠক্রম তৈরি করেন আইজেনস্টাইন। এই কর্মসূচী ও পাঠক্রম ছিল বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র পাঠক্রম।

তবে একটা কথা ঠিক, সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রে যে নতুন ধারা জন্মগ্রহণ করছিলো, তার মধ্যে কিন্তু আইজেনস্টাইনদের মতো কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিলো না। বরঞ্চ তাদের মধ্যে ছিলো অনেক বেশি রোমান্টিক চলচ্চিত্র তৈরি করার ধারা এবং পশ্চিমের চলচ্চিত্রের প্রভাব।

অবশ্য দুয়ের দশক ও তিনের দশকের আইজেনস্টাইনের বা পুদভ্কিনের চলচ্চিত্রের ধারা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্রের ধারা বর্তমান ছিলো।

তাছাড়া, সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন রিপাব্লিকগুলিতে চলচ্চিত্রের কিছু পরিমাণ নিজস্ব ধারার জন্ম হয়েছিলো, যার সাথে আইজেনস্টাইনের ধারার হয়তো অনেক পার্থক্য।

জর্জিয়ার প্রাক্-বিপ্লব পল্লী জীবনযাত্রার ওপর লেখা উপন্যাসের ভিত্তিতে শিশুদের জন্য একটি অপূর্ব সুন্দর চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন আইজেনস্টাইনের শিষ্য কনস্তান্তিন পিপিনাশভিলি (Konstantin Pipinashvili)। এই চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় ১৯৩৬ সালে, কিন্তু মুক্তি প্রায় পাঁচ বছর পরে—১৯৪১ সালে। যথানিয়মে সোভিয়েত রাশিয়ার ছাড়পত্র পেতে এই চলচ্চিত্রের দেরি হয়।

সোভিয়েত আর্মেনিয়াতে নির্বাক যুগেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র তৈরি হয় এবং তিনের দশকে আর্মেনিয়ায় আইজেনস্টাইন ও পুদভ্কিনের শৈল্পিক দৃষ্টিকোণে প্রভাবিত অনেক তরুণ চলচ্চিত্রকার দেখা যায়।

আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার মতো সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের অতীত না থাকলেও আজারবাইজান সোভিয়েতে চলচ্চিত্র তৈরি শুরু হয় অক্টোবর বিপ্লবের কিছু আগেই। উল্লেখযোগ্য, দুয়ের দশকেই এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র তৈরি হতে শুরু করে।

সোভিয়েত রাশিয়ার অনেক অঞ্চলে চলচ্চিত্রের স্টুডিও ছিলো না। কয়েকটি অঞ্চলে স্টুডিও স্থাপিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। যেমন কাঝাখ্ফিল্ম স্টুডিও তৈরি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আল্মা-আতা তথ্যচিত্রের ফিল্ম স্টুডিও থেকে। উজ্বেক ফিল্ম এবং কিরগিজ্ ফিল্ম স্টুডিওগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪১ সালে।

সেদিক থেকে বলতে গেলে, আইজেনস্টাইন বা মস্কো-কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রকাররা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই চলচ্চিত্র নির্মাণের যে কলাকৌশলগত সুযোগ পেয়েছেন, বিস্তীর্ণ সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বত্র কয়েক দশক ধরে তা পাওয়া যেতো না। তাই তাজা তরুণ চলচ্চিত্রকাররা, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সোভিয়েতগুলি থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে সার্বিক সুবিধে পেতো না।

তার ওপর আঞ্চলিকভাবে কোনো কোনো ধারা ছিলো অতিরিক্ত শক্তিশালী, যার ফলে চলচ্চিত্রে নতুন ভাবনা ও নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও কঠিন ছিলো। যেমন পাঁচের দশকে রাশিয়ার চলচ্চিত্রে সবথেকে আবেগময় এবং শক্তিশালী বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো স্তালিনের জীবনী বা তাঁর ভাবমূর্তি।

তবুও নতুন প্রজন্মের কাছে আইজেনস্টাইন বা তাঁর সমসাময়িক চলচ্চিত্রকারদের প্রতিভাময় ও সৃষ্টিশীল শিল্পকলার গৌরব ও ধারা ইতিহাসে রয়েই গেলো। আইজেনস্টাইন নিজে কেমনভাবে চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রকারদের সম্পর্কে ভাবতেন, তা দেখলেই আমরা অনুমান করতে পারি বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে

আইজেনস্টাইনের মূল্যায়ন কেমনভাবে হবে। আইজেনস্টাইন নিজেও কখনো তাঁর তত্ত্বকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করা যায় বলেননি। নিজেও প্রয়োগ করেননি এমন তত্ত্বের পরিমাণ বিপুল। তাই ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করবে, সেইসব তত্ত্বকে অনুধাবন ও প্রয়োগ করার জন্য।

চলচ্চিত্রের বিশ্বে আইজেনস্টাইনের মূল্যায়ন

এ শতকের বিশ্ব চলচ্চিত্রে, শুধু রাশিয়ায় নয়, আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের অবদান নানা বিচিত্র রূপে প্রকাশিত। আরো পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, আইজেনস্টাইনের অবদানের কথা এখন বিশ্ব চলচ্চিত্রের যে কোনো ইতিহাসে অপরিহার্যভাবেই এসে পড়ে।
বিশ্বের চলচ্চিত্র সমালোচনার অতি সুপরিচিত নাম জেমস্ অ্যাগি (James Agee)। আইজেনস্টাইনকে নিয়ে যখন সোভিয়েত রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরাট সমালোচনা, কার্যত যখন 'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রটির দ্বিতীয় পর্ব নিষিদ্ধ হয়েছে, সেই সময়ে 'দ্য নেশান' পত্রিকায় ১৯৪৭ সালের ২৫ জানুয়ারি জেমস্ অ্যাগি সেই বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে কয়েকটি ছত্রে লিখেছিলেন—'ইভান্ দ্য টেরিবল' চলচ্চিত্রটির দ্বিতীয় পর্ব 'কখনোই মুক্তি পাবে না, এর তৃতীয় পর্ব কখনো তৈরি হবে না।' আইজেনস্টাইনকে বলা হলো প্রথাবাদী ও বুর্জোয়া, এবং অন্যান্য নোংরা শব্দও ব্যবহার করা হলো। অ্যাগি আরো বলেছেন—'পশ্চিমী সঙ্গীতের পীঠস্থান ভিয়েনার সেই দিনগুলির কথা, যখন মোটসার্ট এবং শুবার্ট তরুণ বয়সে মারা গিয়েছেন প্রধানত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে। সেদিন থেকে সময় অনেকটা গড়িয়ে এসেছে। এখন আমরা প্রতিভার বিচার করি।'
১৯৪৭ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখে 'দ্য নেশান' পত্রিকায় আইজেনস্টাইনের প্রধানত 'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রের দীর্ঘ সমালোচনা করেন অ্যাগি। সেখানে তিনি লেখেন—'বহু বছর ধরে আইজেনস্টাইন যেন এক কারাগারে বন্দীর মতো কাজ করে চলেছেন, এটা সবাই জানে। এটা যেন কারাগারে এমন কর্তৃপক্ষের তদারকে কাজ করা, যারা শুধু বিপজ্জনক আর নির্মমই নয়, বরং আকস্মিকভাবে নিজেদের মতও পরিবর্তন করে। আইজেনস্টাইনের কাজে এটা যে মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করে, তা বলাই বাহুল্য।'
জেমস অ্যাগির পক্ষে তখন কোনোভাবেই অনুমান করা সম্ভব হয় নি, তিনি অনুমান করতেও চাননি যে, এই কারাগারের কর্তৃপক্ষের সাথে আইজেনস্টাইন কতোটা একমত, এরা তাঁর প্রতি যে আচরণ করে তার সাথে তিনি কতোটা

একমত। এই পরিস্থিতিটি আইজেনস্টাইনের কাজ ও মননকে কতোটুকু আকার দিয়েছে, অ্যাগি সে অনুমান করতে চাননি।

অ্যাগির মতে—'এক মহান শিল্পীর মন এবং প্রাণশক্তি কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। বাইরের চাপটুকুকে বাদ দিলেও আইজেনস্টাইনের ক্ষেত্রে আলোর দিকে বিকশিত হবার কোনো গ্যারাণ্টি নেই।'

অ্যাগি বলেছেন—'একজন সৃষ্টিশীল প্রতিভা এবং তাঁর কাজকর্মের প্রতিটি বস্তু, এবং সাধারণভাবে স্বাধীনতা ও প্রাণশক্তিকে বোঝায় যে বস্তু, তা সবই আইজেনস্টাইনের মধ্যে কুশবিদ্ধ হয়েছে। হয়েছে অধিকতর অর্থ নিয়ে। অ্যাগির জানা যে কোন মানুষের থেকে বেশি।'

তাঁর মনে হয়েছে—'অধিকতর দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আইজেনস্টাইন তখনো প্রধানত একজন মুক্ত মানুষ, নিজেই নিজের প্রভু, সমস্ত অসুবিধাকে ভেঙে দিয়ে সব থেকে ভালো কাজ করে চলেছেন। বা হয়তো', অ্যাগির মনে হয়—'নিজেকে কুশবিদ্ধ করাটাই মেনে নিয়েছেন আইজেনস্টাইন এবং যতোটুকু সম্ভব তিনি নিজেই নিজেকে কুশবিদ্ধ করার পেরেক ঠুকতে সাহায্য করেছেন।'

জীবনের শেষ প্রান্তে, পশ্চিমের বিদেশে এতোখানিই আইজেনস্টাইন ছিলেন উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রকার।

১৯৫০ সালে ব্যাসিল রাইট (Basil Wright) চলচ্চিত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন, 'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্রের ওদেসা সিঁড়ির দৃশ্য দেখিয়ে দেয় এক প্রকাশভঙ্গী এবং টেকনিক্যাল পদ্ধতির সম্পূর্ণ নতুন দিক।

আইজেনস্টাইনের জীবিতকালে চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে সব গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছিলো, তাতেও আইজেনস্টাইনের স্থান ছিলো প্রায় বিতর্কাতীত। এমন কি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত (পরিমার্জিত সংস্করণ) 'ফিল্ম' গ্রন্থের লেখক রজার ম্যানভেল (Roger Manvell) প্রসঙ্গত লিখেছেন—'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্রের ওদেসা সিঁড়ির দৃশ্য সম্ভবত চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সবথেকে প্রভাবশালী ছয়টি মিনিট।

ম্যানভেলের কথায়—গ্রিয়ারসন্ (Grierson) এবং অন্যান্য বৃটিশ তথ্য-চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্রের টেকনিক প্রথম শেখার মডেল হিসাবে 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলী, বিশেষত ওদেসা সিঁড়ির দৃশ্য একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। এই অসাধারণ ছয় মিনিটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ম্যানভেল দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় সে সময়কার চলচ্চিত্র নির্মাণের উৎসাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ম্যানভেল আইজেনস্টাইনের 'কালচার অ্যান্ড লেজার' নিবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই ইউরোপে এবং আমেরিকায়

চলচ্চিত্র সমালোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ছিল সোভিয়েত রাশিয়া ও তার চলচ্চিত্র, বিশেষত আইজেনস্টাইন এবং পুদভ্কিনের চলচ্চিত্র। ১৯৪৫ সালের সময়কালে বিশ্বের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রকাশ করলেন জে. ই. মেয়ার (J. E. Mayer) তাঁর 'সোশিওলজি অফ ফিল্ম' গ্রন্থে। আলাদা করে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেননি তিনি। সামান্য একটু উল্লেখ করেছেন আইজেনস্টাইনের আত্মিক নেতৃত্বের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কথা, বিশেষত চলচ্চিত্রের বর্ণ বিষয়ে আইজেনস্টাইনের বিশ্লেষণের কথা। কিন্তু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মেয়ার বলেছেন—আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না, মহান শিল্পকলার ভাবমূর্তির কাছাকাছি পেঁছে গেছে সেগুলো।

বিশ্বের তথ্য-চলচ্চিত্রের সুপরিচিত সংগ্রামী চলচ্চিত্রকার জরিস ইভেন্স (Joris Ivens) তাঁর সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখেছেন 'ক্যামেরা অ্যাণ্ড আই' গ্রন্থে। ইভেন্স রাশিয়ায় গিয়েছিলেন সে দেশের সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার উৎসাহ নিয়ে। মস্কোয় পেঁছে তিনি প্রথম আইজেনস্টাইনের বাসাতেই গিয়ে উঠেছিলেন, যদিও আইজেনস্টাইন তখন ছিলেন না। আইজেনস্টাইনের বাসা দেখে আশ্চর্য হয়েছেন ইভেন্স—ছয়টি ভাষার স্তূপীকৃত গ্রন্থে একেবারে ভর্তি একটা বড়ো ঘর।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে নিজের চলচ্চিত্রের কিছু কপি ইত্যাদি নিয়ে জরিস ইভেন্স প্রস্তুতি নিয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ায় যাওয়ার। সেখানে নানান জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পাওয়ার মধ্যে একদিন কিয়েভ উক্রেইনিয়ান স্টুডিওর ওদেসা শাখাতেও আমন্ত্রিত হলেন ইভেন্স।

ইভেন্স নিজেই লিখেছেন—চলচ্চিত্রকার হিসাবে তাঁর প্রথম কর্তব্য ছিলো ওদেসার সিঁড়ি দেখতে যাওয়া, যে সিঁড়ি আইজেনস্টাইনের 'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত করেছে।

'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার ও পরিচিত হওয়ার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ওদেসার সিঁড়ি যেন এক তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু তখনকার সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র খুব সহজে রাশিয়ার বাইরে প্রদর্শিত হয়নি। কারণটি অবশ্যই অন্যান্য দেশের সাথে রাশিয়ার রাজনীতিক পার্থক্য এবং কূটনীতিক দ্বন্দ্ব। তাই আইজেনস্টাইন ও তাঁর চলচ্চিত্র রাশিয়ার বাইরে ঠিক বাণিজ্যিক সূত্রে পরিচিত হয়নি।

১৯২৫ সালের সময়কালে ইউরোপে আইনগতভাবে ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ এলো। এই ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের অন্যতম উৎসাহ ছিলো রাশিয়ার চলচ্চিত্র দেখা। লণ্ডনে যখন ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন

প্রায় নিশ্চিতভাবে বৃটেনের চলচ্চিত্রের বাইরের দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলো ইংরেজ দর্শকরা।

১৯২৯ সালের ২৯ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের সিনেমা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হলো, যার সদস্যদের মধ্যে আইজেনস্টাইন এবং পুদভ্‌কিনও ছিলেন। কিন্তু একসময় সেই আইজেনস্টাইনকেই রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো।

আইজেনস্টাইন যখন 'অক্টোবর' এবং 'জেনারেল লাইন' তৈরি করেছিলেন, তখনো সোভিয়েত রাশিয়ায় তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা জোটেনি। বরং ইতিমধ্যেই বিশ্ববিখ্যাত নতুন চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ আইজেনস্টাইন সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ায় সরকারি সমালোচনা ছিলো অদ্ভুত চরিত্রের। ১৯৩২ সালের সংস্করণে 'সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া' লিখেছিলো—'তাঁর কাজের বিরাট যোগ্যতা থাকলেও 'অক্টোবর' এবং 'জেনারেল লাইন' চলচ্চিত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নির্ধারক স্তরের কোনো গভীর বিশ্লেষণ রাখেননি আইজেনস্টাইন।' এই বিশ্বকোষের মতে—'আইজেনস্টাইন পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের মতাদর্শের প্রতিনিধি, যারা সর্বহারার পথ গ্রহণ করেছে।' ("In his works October and The General Line Eisenstein, despite his great ability, yet gave no deep analysis of the decisive stage of the Socialist Revolution and made a diversion to formal experiments. Eisentein is a representative of the ideology of the revolutionary section of the petty bourgeois intelligentia which is following in the path of the proletariat.")

কিন্তু যাঁরা নিজেদের দেশে বিপ্লবী সংগ্রামে সক্রিয়, তাঁদের কাছে আইজেনস্টাইনের পরিচয় এমনকি রাজনীতিকভাবেও পৌঁছেছে অন্য রূপ নিয়ে। যেমন আইজেনস্টাইনের সুযোগ্য শিষ্য এবং অনুবাদক জে. লেইডা তাঁর 'দিয়ানয়িং' গ্রন্থে চীনের চলচ্চিত্রের ইতিহাস প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে চীনের ক্যান্টন শহরের প্রেক্ষাগৃহে 'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্র দেখার জন্য সমবেত হন বিপ্লবী সরকারের নেতা ও সদস্যরা। চীনের প্রয়াত নেতা সুন-ইয়াৎ-সেনের স্ত্রী-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হোয়াম্‌পোয়া মিলিটারি অ্যাকাডেমির প্রচারকর্মীরা অপেক্ষা করছিলেন। হয়তো তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালের বিশ্ববিখ্যাত চৌ-এন-লাই-ও ছিলেন।

'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্র দেখে দর্শকরা অভিভূত। সফল বিদ্রোহের লাল পতাকা দেখে দর্শকরা উল্লসিত। পোতেমকিন্ জাহাজের নাবিক, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চলচ্চিত্রটির ক্ষমতা এবং আইজেনস্টাইনের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান প্রদর্শন করলো তারা।

সাংহাইয়ের সোভিয়েত কনস্যুলেট থেকে ব্যবস্থা হলো, চীনা লেখক ও শিল্পীদের জন্যে 'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্রের প্রদর্শনের।

এসময় পিকিং ইউনিভারসিটির শিক্ষক সের্গেই ত্রেতাইয়াকভ্ (Sergei Tretyakov) সংকল্প করেছিলেন, সোভিয়েতের চলচ্চিত্রকারদের দলকে চীনে নিয়ে আসার।

অনেক বছর পরে, জে. লেইডা চীনে গিয়ে আইজেনস্টাইনের গ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদ দেখেছিলেন।

চলচ্চিত্রকার হিসেবে আইজেনস্টাইন সমালোচকদের যতোখানি আক্রমণের শিকার হয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা পেয়েছেন চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও ব্যাকরণের অবিস্মরণীয় স্তম্ভ হিসাবে। তাঁর চলচ্চিত্রকে যখন আলোচনার বিষয়বস্তু করে তোলা হয় তখন তাতে থাকে এক অপরিসীম শ্রদ্ধা মেশানো বিশ্লেষণ। তাই আর্নেস্ট লিন্ডগ্রেন (Ernest Lindgren) তাঁর 'দ্য আর্ট অফ দ্য ফিল্ম' গ্রন্থে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে, আইজেনস্টাইনের মৃত্যুর বছরে।

লিন্ডগ্রেনের মতে, সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রে যে তত্ত্ব বলা হয়, তা সবথেকে সফলতার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে আইজেনস্টাইন, পুদভ্‌কিন ও দভ্‌ঝেনকোর মতো চলচ্চিকারদের কাজে। আইজেনস্টাইনের প্রায় প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র এবং প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক রচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন লিন্ডগ্রেন।

আধুনিক চলচ্চিত্রের সম্পাদনার বিষয়ে 'দ্য টেকনিক অফ ফিল্ম এডিটিং' গ্রন্থটির অন্যতম লেখকদ্বয় ক্যারেল রাইস্‌জ্ (Karel Reisz) এবং গ্যাভিন মিলার (Gavin Millar)। এই গ্রন্থে, সম্পাদনার ক্ষেত্রে সের্গেই আইজেন-স্টাইনের তত্ত্ব ও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রন্থটিতে সম্পাদনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রকার গ্রিফিথ, পুদভ্‌কিন এবং আইজেন্সটাইনের টেক্‌নিক আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

চলচ্চিত্রের পুরনো অংশবিশেষ একত্রিত করে সম্পাদনার যে ধারা এস্থার শুব্ (Esthar Schub) দেখিয়েছিলেন, সেরকম সংগৃহীত, সম্পাদিত চলচ্চিত্রের আলোচনা করেছেন জে. লেইডা তাঁর 'ফিল্মস্ বিগেট ফিল্মস্' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে প্রসঙ্গত বারবার এসে পড়েছে আইজেনস্টাইনের প্রভাব, বিশেষত একেবারে শুরুর সময়।

এস্থার শুব্ ছিলেন মাইয়াকোভ্‌স্কির এবং আইজেনস্টাইনের বন্ধু। শুবু নিজেই লিখেছেন, ১৯২৬ সালের প্রথমের দিকে, 'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্র দেখে তাঁর উৎসাহ জাগে পুরনো চলচ্চিত্রের টুকরো জুড়ে সম্পাদনা করার ধারা গড়ে তোলার। প্রসঙ্গত মনে থাকতে পারে যে, আইজেনস্টাইনের

'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্রে বিগত যুদ্ধের সময়ের নৌবাহিনীর সংরক্ষিত দৃশ্যকে ব্যবহার করা হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার নৌবাহিনী হিসাবে দেখাতে।
লক্ষ্যণীয়, এস্থার শুব্ কিন্তু এনেছেন তথ্য-চলচ্চিত্রের ধারা। তাই আরও একবার এ কথা ভাবা যেতে পারে যে, উৎসাহ ও প্রেরণার ক্ষেত্রে আইজেন-স্টাইনের কাহিনী-চলচ্চিত্র কতোখানি তথ্য-চলচ্চিত্রকে এগিয়ে দিয়েছে।
রিচার্ড মেরান বার্সাম (Richard Meran Barsam) তাঁর 'নন্‌ফিক্‌শান ফিল্ম' গ্রন্থে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলেছেন—যদিও তাঁর চলচ্চিত্রগুলি ছিল ঐতিহাসিক চরিতাবলীর পুনরাভিনয়, তবুও তাঁর চলচ্চিত্রে একটি তথ্য-চলচ্চিত্র এবং ইতিহাসের ভিত্তি ছিল।
তাই বার বার করে আইজেনস্টাইনের নাম এসে পড়ে অ-কাহিনী চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে।
বিশ্বের অ-কাহিনী চলচ্চিত্র বা তথ্য-চলচ্চিত্রের ইতিহাস লিখেছেন এরিক বার্নাও (Erik Barnow) তাঁর 'ডকুমেন্টারি' গ্রন্থে। এখানেও আইজেনস্টাইনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। একথাও এসে পড়ে যে, আইজেনস্টাইন একসময় স্বয়ং তাঁর নিজের 'পোতেমকিন্' চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বলেছিলেন—এটা কোনো ঘটনার সংবাদ-চলচ্চিত্রের মতো দেখতে। তাই বোধ হয় এই চলচ্চিত্রকে কখনো কখনো তথ্য-চলচ্চিত্রের সাথে জড়ানো হয়।
বিশ্ববিখ্যাত তথ্য-চলচ্চিত্রকার এবং চলচ্চিত্রের ইতিহাসবিদ্ পল রোথা (Paul Rotha) তাঁর 'ডকুমেন্টারি ডায়েরি' গ্রন্থে তাঁর চলচ্চিত্রকার বন্ধু কার্ল মেয়ারের (Carl Mayer) জীবনের একটি ঘটনার কথা বলেছেন।
মেয়ার প্রথম যখন 'পোতেম্‌কিন' চলচ্চিত্রটি দেখেন, তখন তাঁর চোখ থেকে প্রকাশবাদী এবং নাটকীয়তাবাদীর আচ্ছন্নতা কেটে যায়। তিনি জার্মানির এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে লক্ষ্য করেন যানবাহনের ছন্দোবদ্ধ যাতায়াত। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই গড়ে ওঠে মেয়ারের বিশ্ববিখ্যাত 'বার্লিন ঃ সিম্ফনি অফ এ সিটি' চলচ্চিত্রটি।
বিশ্বের সব দেশে, সব ধরনের চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রকাররা আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রভাবিত। যাঁরা পরীক্ষামূলক বা বিমূর্ত চলচ্চিত্রের স্রষ্টা, তাঁরাও তাই আইজেনস্টাইনের কাছে তাঁদের প্রেরণার উৎস খুঁজে পেয়েছেন।
পরীক্ষামূলক বা বিমূর্ত চলচ্চিত্রের অন্যতম সমালোচক পার্কার টাইলার (Parker Tyler) তাঁর 'সেক্স সাইকি এট্‌সেট্রা ইন দ্য ফিল্ম' সংকলন গ্রন্থে বার বার আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মতে আইজেন-স্টাইন—চলচ্চিত্রের সুসংহত এবং সম্পূর্ণ শিল্পকলাসম্পন্ন পরিচালক (বিশেষত 'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসাবে)।

টাইলারের মতে, চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আইজেনস্টাইন শিল্পকলার দিক থেকে সব চেয়ে সফল পরিচালক। 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্‌' চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে যেমন টাইলার বলছেন—হলিউডের মতো আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিছক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়নি। বরঞ্চ, অভিনয়ের প্রত্যেকটি অংশের সাথে, প্রত্যেকটি কথোপকথনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ প্যাটার্ন দর্শকদের আকৃষ্ট করে, যা অন্য পরিচালকদের কাজে দেখা যায় না।

পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছরের বিবর্তনের ইতিহাস লিখেছেন ডেভিড কার্টিস (David Curtis) তাঁর 'এক্সপেরিমেণ্টাল সিনেমা' গ্রন্থে। পরীক্ষামূলক বা বিমূর্ত চলচ্চিত্রের জন্মলগ্ন থেকে সাতের দশক পর্যন্ত, অর্ধ-শতাব্দীর বিবর্তনের সময়কাল বলে মনে করা হয়েছে এই ইতিহাসে।

কার্টিস্‌ কয়েকজন চলচ্চিত্রকারের সম্পর্কে আলোচনায় আইজেনস্টাইনের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র বলতেই দর্শকরা যেন ক্যামেরা বা চলচ্চিত্রের হরেকরকম কৌশল বা ট্রিকস্‌ বা স্পেশাল এফেক্ট বোঝে, ক্যামেরার নানান গতিবিধি বোঝে। আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে স্পেশাল এফেক্ট ব্যবহারের সময় ছিলো না। বস্তুত তিনি ক্যামেরার নড়াচড়া এড়িয়ে গেছেন। তাই যা কিছু প্রতিক্রিয়া বা এফেক্ট, তা আইজেনস্টাইন সম্পাদনার মধ্যে দিয়েই গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই সম্পাদনার পদ্ধতি, পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র-কারদের কাজে কখনো কখনো চিরায়ত মানদণ্ডের ভূমিকা নিয়েছে।

চলচ্চিত্রকারদের পরীক্ষামূলক কাজে সেটা একটা সমস্যাও। যেমন, স্লাভ্‌কো ভোর্কাপিচ্‌ (Slavko Vorkapich) লিখেছেন, প্রচলিত মন্তাজের সাথে রাশিয়ার মন্তাজের ধারার পার্থক্যের কথা। দর্শকরা বলে—হলিউড ধরনের মন্তাজ। আইজেনস্টাইনের ধরনের নয়। পাঁচের দশকে মানুষের মনে আইজেনস্টাইনের সম্পাদনার পদ্ধতি গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত।

বাস্তবত, চারের দশকে আমেরিকায় পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের নতুন তরঙ্গ আসার যে দৃষ্টিকোণ ও পরিকল্পনা ছিলো, তার প্রায় বিশ বছর আগে থেকে বিভিন্ন চলচ্চিত্রকাররা তাত্ত্বিকভাবে তারই ভিত্তিভূমি রচনা করেছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আইজেনস্টাইন।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও রচনার উপকরণ

চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্‌গাতা কুলেশভের প্রধান রচনাগুলি যুদ্ধের পরবর্তীকালের নতুন কোনো বিকশিত পরিস্থিতিতে রচিত নয়—যদিও কুলেশভের নিজের প্রভাব ছিলো দীর্ঘদিন।

আইজেনস্টাইনের পূর্বসূরিদের অপর একজন ভের্তভ্—পারতপক্ষে জীবনের শেষ প্রায় দু'দশক কোনো গুরুত্বপূর্ণ রচনায় হাত দেননি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি ১৯৩৪ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

চলচ্চিত্রকার পুদভ্কিন্ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লেখেন জীবনের প্রথম ভাগে। শেষের দিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ রচনায় প্রায় হাতই দেননি।

সেই দিক থেকে আইজেনস্টাইন আশ্চর্য মানুষ। জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর লেখার কাজ চলেছে। সেই সব রচনার বিষয়বস্তু বিচিত্র, গুরুত্ব তার অপরিসীম। এক একটি রচনায় তিনি বিচিত্র ও বিস্তৃত উপকরণ ব্যবহার করেছেন।

আইজেনস্টাইন নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর বিজ্ঞানের, বিশেষত গণিতের শিক্ষা কাজে লেগেছিলো চলচ্চিত্রের ব্যাকরণে এবং বিশ্লেষণে। যার ফলে তাঁর বহু লেখাতেই একেবারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবের সাথে রয়েছে কিছু গাণিতিক শব্দাবলী ও সূত্রাবলী। ফলে কোনো কোনো সময় আইজেনস্টাইনের রচনার মধ্যে এমন দুরূহ বিশ্লেষণ ও জটিল উপস্থাপন দেখা যায় যে, সাধারণ পাঠকের কাছে সেটা সহজবোধ্য লাগে না। কিন্তু, এইভাবে নিজের রচনা লিখে গেছেন বলেই আবার তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন।

আইজেনস্টাইন কখনো কখনও ব্যবহার করেছেন তাঁর জাপানী ভাষা শিক্ষার অতীতকে। কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। তাঁর রচনার অনেক ক্ষেত্রেই অনেক রকম ভাষার সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গত এসেছে। এর মধ্যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে পুরনো দিনের জাপানী ভাষার কবিতা বা চীনা ভাষার কোনো প্রচলিত লেখচিত্র।

অজস্র রচনায় আইজেনস্টাইন ব্যবহার করেছেন সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। রাশিয়ার বা বিদেশের হরেকরকম সাহিত্যের কাঠামো এবং কাহিনী তিনি ব্যবহার করেছেন চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করতে। এটা দেখে আইজেনস্টাইনের সাহিত্য অধ্যয়নের বিশালত্ব খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

একটা আবশ্যিক উপকরণ আইজেনস্টাইনের তাত্ত্বিক রচনায় দেখা যায়, সেটা হলো চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। প্রধানত নিজের চলচ্চিত্রের দৃষ্টান্ত টেনে, এমনভাবে তাত্ত্বিক রচনা লেখার নমুনা অত্যন্ত বিরল। যখনই তিনি নতুন কোনো সম্পাদনা, মন্তাজ বা অন্য কোনো তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা করেন, তখনই তিনি তাঁর নিজের তৈরি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অংশের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেন।

ফলে, তাঁর নিজের চলচ্চিত্রের ব্যাকরণগত বা তাত্ত্বিক আলোচনা বহুক্ষেত্রে তিনি নিজেই করে গেছেন। অন্য কোনো সমালোচকের সেটা খুব নতুন

করে করতে হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে একটা সুবিধার দিক, আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে।

আইজেনস্টাইনের রচনার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা—চলচ্চিত্র নির্মাণের সময়কালে বা তার আগে ও পরে। তাই আমরা তাঁর রচনায় শুধু তাত্ত্বিক নয়, এমন অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা জানতে পারি যা থেকে বোঝা যায় কেমনভাবে চলচ্চিত্রটি তৈরি হয়েছিলো। আমরা জানতে পারি চলচ্চিত্রটি তৈরি করার সময় কি কি পদ্ধতি বা কৌশল নেওয়া হয়েছিলো। তাই কোনো কিছুই গোপন থাকে না, অজ্ঞাত থাকে না।

এতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় তাই এক অদ্ভুত সরলতা এক নিষ্পাপ প্রজ্ঞা। আমরা তাই প্রতারিত হই না, কোনো চলচ্চিত্রের গোপন কৌশল দ্বারা। কোন চলচ্চিত্রের কোন অংশে নকল জাহাজ ব্যবহার করেছেন, কোন চলচ্চিত্রে নকল তুষার বা বরফ ব্যবহার করেছেন, কিছুই গোপন করেননি আইজেনস্টাইন। সেগুলো এমনভাবে বলে গেছেন যে, জানার পরেও সেই সব চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য বা গুরুত্ব এতোটুকু কমে না। এক্ষেত্রে আইজেনস্টাইন বিরল মানুষ।

তাঁর কয়েকটি বা কম রচনায়, অন্য চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্রের সমালোচনা বা আলোচনা আছে। কিন্তু এই অভাববোধটা অনেকটাই পুষিয়ে যায় তাঁর সাহিত্যের দৃষ্টান্ত ব্যবহারে। তাই কখনো আইজেনস্টাইনের রচনা পড়তে পড়তে মনে হতে পারে এর লেখক সম্ভবত কোনো চলচ্চিত্রকার নন, বা সম্ভবত চলচ্চিত্র থেকেও সাহিত্য সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহী।

আইজেনস্টাইন অবশ্য একক চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। একটি শুধু নয়, একাধিক রচনায়। চার্লির বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'গ্রেট ডিক্‌টেটর' সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের রচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌নির্দেশ।

আইজেনস্টাইনের রচনায় রাজনীতিক শব্দাবলী প্রধানত গুরুত্ব পায়নি। ভাবতে অবাক লাগে যে, তাঁর মতো সমাজতন্ত্রে গোঁড়া বিশ্বাসী মানুষ রচনার ক্ষেত্রে নিছক বাঁধাধরা রাজনীতিক বা দার্শনিক শব্দাবলীর ব্যবহার কেন এতো কম করলেন। আর বোধ হয় তার জন্যই, আইজেনস্টাইনের রচনাবলী চিরায়ত এবং সর্বজনগ্রাহ্য। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিভিন্ন শিবিরের যে কোনো মানুষই আইজেনস্টাইনের লেখার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। কখনোই বিশেষ একটি রাজনীতিক মতামত সেখানে শাসন করে না, প্রাধান্য পায় না।

যদিও আইজেনস্টাইন নিঃসন্দেহে বিশেষ রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগের দিকনির্দেশ করেছেন, তবুও সেটা মার্কসবাদ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, সমাজতন্ত্র না কমিউনিজম্‌, এ সব প্রশ্ন নিঃসন্দেহে অবান্তর। তাঁর রচনা এতোখানি টেক্‌নিক্যাল যে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিশুদ্ধ গণিতের মতো সেগুলি প্রায়শই

পাঠকের চিন্তার কাঠামোকে নাড়া দেয়, আবেগ বা রোমান্টিকতাকে উদ্দীপিত করার পরিবর্তে।

এ গুণটি অবশ্য পুদভকিন এবং কুলেশভের তাত্ত্বিক রচনার মধ্যেও ছিলো। বরঞ্চ ভের্তভের রচনায় রাজনীতিক মতাদর্শ অনেক সময় বক্তব্যের বড়ো অংশ দখল করেছে। সেটা ভের্তভের তত্ত্ব ও প্রয়োগের শ্রেণী অনুযায়ীও ঘটে থাকতে পারে। কারণ ভের্তভ্ কাহিনীর পরিবর্তে বাস্তবের সুস্পষ্ট সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে, সূক্ষ্ম দর্শনের চর্চা করার প্রেরণা দিতে পারেননি। যার ফলে ভের্তভের চলচ্চিত্রের শ্রেণীটি আলাদা হয়ে গেছে কুলেশভ্, পুদভকিন্ এবং আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র থেকে।

কখনো কখনো তত্ত্ব সম্পর্কে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেও, আইজেনস্টাইন খুব কম ক্ষেত্রেই অপরের তাত্ত্বিক আলোচনার সমালোচনা করেছেন বা সে সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন।

এটা ব্যক্তি সম্পর্কেও সত্য। আইজেনস্টাইনের রচনায় কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি বা কড়া সমালোচনা প্রায় অনুপস্থিত। বিস্ময়কর লাগে, তাঁর স্বদেশের পরিবেশে আইজেনস্টাইন কেমন করে এতোখানি সামাজিক ও রাজনীতিক সহিষ্ণুতা অর্জন করলেন। রাশিয়ার প্রচারধর্মী অন্যান্য প্রকাশনায় যেমনটি দেখা যায়, আইজেনস্টাইনের রচনা তেমনটি নয়। পশ্চিমের অন্যান্য দেশ ও তার শাসন সম্পর্কে কটূক্তি করে আইজেনস্টাইন নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাকে একটি বিশেষ পাঠকগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় করে তোলেননি। হয়তো সে কারণেই তাঁর রচনা কোনো অর্থেই প্রচারধর্মী নয়। অবশ্যই আইজেনস্টাইন সমালোচক ছিলেন বিদেশের ভোগবাদী জীবনযাত্রার ও সমাজব্যবস্থার। যার অনিবার্য পরিণতি হলো আমেরিকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে রূঢ় সমালোচনামূলক চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা, যেটা পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি।

অবশ্যই আইজেনস্টাইন উচ্চকণ্ঠে জার্মানির নাট্‌সীবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। সেটা ঠিক একটি দেশের সম্পর্কে বিশেষ কোনো রাজনীতিক মতামত নয়। সারা বিশ্বের জনগণের বিরাট একটা অংশ—জার্মানির নাট্‌সীবাদের আর ইতালির ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এগিয়ে এসেছে। আর আইজেনস্টাইন এই মানুষদের থেকে ভিন্ন কিছু নন।

পুদভকিনের মতো বন্ধুদের সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি আইজেন-স্টাইন। কিন্তু পুদভকিনের নিজের গুণে বা আইজেনস্টাইনের গুণেই হোক, উভয়ের মধ্যেকার বন্ধুত্ব কখনো ভেঙে গেছে, এমন তথ্য নেই। বরঞ্চ, আইজেনস্টাইনের জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর চলচ্চিত্রে তখনও বন্ধু চলচ্চিত্রকার পুদভকিন অভিনয় করেছেন পরিচালক আইজেনস্টাইনের নির্দেশে। এ ঘটনাও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে খুব সহজলভ্য নয়।

আধুনিক পরীক্ষামূলক বা বিমূর্ত চলচ্চিত্রের নির্মাতারা আইজেনস্টাইনের রচনা থেকে একটি নিটোল ব্যাকরণ বা তত্ত্ব পেতে পারেন, যা তাঁদের নিজেদের চিন্তাভাবনাকে বিকশিত করার পথের নির্দেশ দেয়। আইজেনস্টাইন নিজেও বোধ হয় জানতেন যে, তাঁর নিজের তাত্ত্বিক রচনাবলী সময়ের থেকে এগিয়ে আছে। তাই অতি আধুনিক চলচ্চিত্রে যখন আইজেনস্টাইনের তত্ত্বের প্রসঙ্গ আসে, তখন বোঝা যায় তিনি আগেই ভেবেছেন অনেক ভবিষ্যৎমুখী চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ।

আইজেনস্টাইনের অনেক লেখাই খুব সরস ও কাব্যিক। নিজের মতামত ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেবার সময়, তাঁকে মনে হয় অনেক বেশি রোমাণ্টিক এবং আবেগপ্রবণ। তাই শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনের দিক থেকে তিনি নিজেই এক আশ্চর্য সাহিত্যের জন্ম দিয়ে গেছেন, যার প্রধান প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র।

সুদীর্ঘ সময় ধরে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের সুযোগ্য শিক্ষক। তাই তাঁর অনেক রচনাই হয়তো শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা। অন্তত পক্ষে পাঠকের কাছে মনে হতে পারে লেখাগুলি শিক্ষামূলক, ঠিক পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য নয়। কিন্তু কোনো কোনো রচনা আছে, যেখানে আইজেনস্টাইন তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যকে ব্যবহার করেছেন যথেচ্ছভাবে, পাঠকের মুখ চেয়ে আপোস করেননি।

আইজেনস্টাইন অবশ্যই স্বদেশে এবং বিদেশে চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতে আপোস করেননি। কিন্তু প্রকাশিত রচনার আলোকে আজও বোঝা যায় না, সোভিয়েত রাশিয়ার একনায়কতন্ত্রী আচরণ আইজেনস্টাইন কতোটা মেনে নিতেন। আজও পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট রচনা প্রকাশিত হয়নি। অথচ তিনিই তো 'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন।

এই আপাত পরস্পরবিরোধী চরিত্র তাঁর রচনায় এবং চলচ্চিত্রের সৃষ্টিতে। বরঞ্চ দেখা যায়, আইজেনস্টাইন যখন রাজনীতিকভাবে অনেক সমালোচনার মুখোমুখি পড়েছেন, তখন তাঁর বিশ্লেষণধর্মী তাত্ত্বিক লেখার গভীরতা বেড়েছে। যেন তিনি টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের মধ্যে নিজের চারপাশের জটিল পরিস্থিতিকে এড়িয়ে থাকতে চাইছেন। তাই দেখি, তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে বিক্ষুব্ধ বা হতাশাগ্রস্ত রচনার পরিবর্তে, আশ্চর্য সুসংহত গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা।

এটা দেখলে মনে হয়, রচনার দিক থেকে আইজেনস্টাইন বিস্ময়করভাবে ইতিবাচক। প্রায় তিক্ততাশূন্য, বিরক্তিশূন্য ইতিবাচক বিশ্লেষণ ও তত্ত্বের সমারোহ তাঁর রচনায়, সেই প্রথম যুগ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। পরিপক্কতা বোঝা যায় তাঁর আবেগময় এবং কাব্যিক স্টাইলে।

একটা চিত্রনাট্য পর্যন্ত আইজেনস্টাইনের হাতে কাব্যের চেহারা নিতো। দৃশ্যের খুঁটিনাটিতে, বাক্যগঠনের কারুকার্যে সমৃদ্ধ। তাই তাঁর লেখার হুবহু অবয়বটিকে যদি তুলে ধরতে হয়, তাহলে তা দেখাতে হবে আইজেনস্টাইনের নিজের উপস্থাপনার ঢংয়েই। কখনো একটিমাত্র শব্দ, কখনো অসম্পূর্ণ বাক্য, কখনো একটা সম্পূর্ণ পংক্তি। আইজেনস্টাইনের প্রকাশভঙ্গির এই স্বাতন্ত্র্য অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর রচনাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তবে অবশ্যই, তাঁর তাত্ত্বিক রচনার বিশ্লেষণের অন্তর্বস্তুকে সংক্ষেপে হলেও একান্তভাবে জানার প্রয়োজন আছে। না হলে আইজেনস্টাইনকেও বোঝা যাবে না, তাঁর যুগান্তকারী অবদানকেও বোঝা যাবে না।

যখন সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার সংঘর্ষ চলছে, তখনও কিন্তু আইজেনস্টাইনের রচনা পরিত্যক্ত হয়নি আমেরিকায়। নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়েও তাঁর রচনা সম্মান পেয়েছে, স্বীকৃতি পেয়েছে, এমনকি রাজনীতিকভাবে বিরোধী গোষ্ঠীর কাছেও। আর সেটাই আইজেনস্টাইনের রচনার আন্তর্জাতিক উপকরণ।

অভাবনীয় কাবুকি

১৯২৮ সালে আইজেনস্টাইন 'দ্য আনএক্সপেক্টেড্' (The Unexpected) রচনা করেন। এই রচনার সময়কালে আইজেনস্টাইনের প্রথম বিখ্যাত চলচ্চিত্র শেষ হয়েছে, অর্থাৎ 'স্ট্রাইক' এবং 'পোতেমকিন' মুক্তি পেয়েছে। এই রচনার প্রথম উৎস হলো জাপানী কাবুকি (Kabuki) থিয়েটার। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে এক জাপানী কাবুকি থিয়েটারের দল এসেছিলো ১৯২৮ সালে। সেই থিয়েটারের প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইন একটি পত্রিকায় লিখেছিলেন 'অভাবনীয়'।

আইজেনস্টাইনের কাছে কাবুকি থিয়েটার, নাট্যসংস্কৃতির এক আশ্চর্য প্রকাশ। সমস্ত মানুষই এর আশ্চর্য দক্ষতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু কেন এই কাবুকি থিয়েটার এতো আশ্চর্যের, সেটা মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়নি। এর যে সব মূল্যবান উপাদানগুলি ছিলো তার মূল্যায়ন করতে বসে আইজেনস্টাইনের মনে হয়েছে যে, এই আশ্চর্য কাবুকি থিয়েটারের চরিত্র বিশ্লেষণযোগ্য।

কাবুকি নিতান্ত চিরাচরিত প্রথার থিয়েটার। এর দক্ষতা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। কিন্তু তবুও কেন ইউরোপীয়ানদেরকে এই চিরাচরিত থিয়েটার নাড়া দিলো ?

এই চিরাচরিত প্রথাবদ্ধতা আইজেনস্টাইনদের নিজেদের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে, কাবুকি থেকে ভিন্ন। তাই কাবুকি থেকে কিছু গ্রহণ করতেও নিজেদের প্রথাবদ্ধতা

বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কাব্‌কির প্রথাবন্ধতা নিছক আচরণসর্বস্ব নয়। এটা কৃত্রিমভাবে বাইরে থেকে নিয়ে এসে বসানো নয়। কাব্‌কি থিয়েটারের প্রথাবন্ধতা অত্যন্ত যৌক্তিক, প্রাচ্যের অন্যান্য নাট্য-আঙ্গিকের মতোই।
যেমন ধরা যাক চীনা থিয়েটারের ক্ষেত্রে। এই থিয়েটারের যে সাজসজ্জা সেটি এতো সুস্পষ্ট যে, অভিনেতা কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন সেটা বোঝা যায়। যেমন কেউ যদি শামুক, ঝিনুক বা ব্যাঙের আত্মাকে উপস্থাপন করে, তবে তার সাজসজ্জাতেও সেটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশিত হয়।
আমরা যদি প্রথাবদ্ধতার প্রসঙ্গে জাপানীদের এই সংস্কৃতির পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখবো এক অভাবনীয় ঘটনা—কাব্‌কি থিয়েটারের সাথে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত থিয়েটারের যোগাযোগ।
১৯২৮ সালের সময়কালে আইজেনস্টাইনের সুস্পষ্ট বিশ্বাস ছিলো যে, থিয়েটারের তখনকার স্তর হলো চলচ্চিত্র। তাই বলা যেতে পারে, পুরনো আকারের থিয়েটার বা নাটকের মৃত্যু হয়েছে, সেটা এখন নতুন একটা আকৃতিতে বেঁচে আছে। এর সাথে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের তৎকালীন সাম্প্রতিকতম বিকাশ দেখেছেন সবাক চলচ্চিত্রে।
নিজেদের প্রথাবদ্ধ থিয়েটারের সাথে কাব্‌কি থিয়েটারের প্রধান পার্থক্যরেখা টেনেছেন আইজেনস্টাইন, একটি যৌথক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য দিয়ে। যেমন মস্কো আর্ট থিয়েটারে কোনো যৌথ ক্রিয়ার অর্থ হলো, সমান্তরালভাবে গায়ক, সমবেত গায়ক এবং বাদ্যযন্ত্রীরা তাঁদের কাজ করে যান। এমন কি দৃশ্যসজ্জার ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই সমান্তরাল যৌথ ক্রিয়া।
কিন্তু জাপানী কাব্‌কি থিয়েটারে শব্দ, কণ্ঠস্বর, চালচলন ইত্যাদি কোনোকিছুই একটি আরেকটির সাথে কখনো তাল দেয় না বা এমনকি সমান্তরালভাবেও চলে না। বরঞ্চ প্রত্যেকে সমান তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া-কলাপ চালায়। কাজেই প্রত্যেকটি উপাদানের স্বাধীনতার ফলে গোটা প্রদর্শনীরই এক স্বতন্ত্র আকৃতি থাকে।
আইজেনস্টাইন ১৯২৩ সালে লিখেছিলেন থিয়েটারের মৌলিক ঐক্যের তত্ত্ব প্রসঙ্গে। থিয়েটারের প্রত্যেকটি উপাদানের মধ্যে সমানত্বের বা সমকক্ষতার যে চিহ্ন, তার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'আকর্ষণ'। কিন্তু জাপানী কাব্‌কি থিয়েটারে সহজাত প্রয়োগের মাধ্যমে, সেদিনের আইজেনস্টাইনের চিন্তার ষোলো আনা আবেদন দেখা গেল। এই টুকরো টুকরো উপাদানগুলি মানুষের মস্তিষ্কে এমন যুক্তভাবে নাড়া দেয় যে মানুষটি নিজেও বোঝে না কোন পথ দিয়ে সে নাড়া খাচ্ছে।
এই জাপানী কাব্‌কি থিয়েটারের প্রত্যেকটি উপাদানকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো এর মধ্যে নিহিত রয়েছে চলচ্চিত্রের মৌলিক উপকরণ।

আইজেনস্টাইন সরাসরিভাবে বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের পদ্ধতি লক্ষ্য করেছেন কাবুকি থিয়েটারে। একটি লড়াইয়ের দৃশ্য। পরমুহূর্তে সমস্ত মঞ্চ শূন্য, শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য। আবার লড়াই। ঠিক যেন একটি চলচ্চিত্রকে কাটছাঁট করে সম্পাদনা করা হচ্ছে। লড়াইয়ের দৃশ্য। তারপরেই চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতি। আবার লড়াই। আইজেনস্টাইন এর সাথে তুলনা করছেন 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের সেই দৃশ্যটির, যেখানে ত্রিপলে ঢাকা বিদ্রোহী সৈন্যদেরকে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হলো—'ফায়ার'! এই শব্দটির সাথে নানাভাবে দেখা গিয়েছিলো, পোতেমকিন জাহাজের আপাত উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় অংশাবলী। অর্থাৎ বিরাট রক্তাক্ত সংঘর্ষের পরিবেশটা বোঝা যাচ্ছিলো। এই শূন্যতা ও প্রকৃতি যেন ত্রিপলে ঢাকা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সৈন্যদের অবস্থাকে আরও উচ্চকিত করে তুলছিল।

জাপানী কাবুকি থিয়েটারে ঠিক এই কাজটিই যেন ষোলো আনা সফলতার সাথে মঞ্চে করা হলো। তার সাথে আইজেনস্টাইনের মনে হয়েছে, নাটকের এক অভিনেতার আত্মহত্যা করার মুহূর্তে, ছোরার গতির সাথে সাথে মঞ্চের আড়ালে কান্নার আওয়াজ যেন রেখাচিত্রের মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মন্তাজের বিশুদ্ধতা দেখে দর্শকেরা যেন হতবাক হয়ে গেছে।

আইজেনস্টাইনের মতে, কাবুকি থিয়েটারে রয়েছে দক্ষতা আর বিশুদ্ধতা। আইজেনস্টাইনদের সবাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিবৃতিটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেখানে দৃশ্য ও শ্রাব্য উপকরণের সংযোগের সমস্যার কথা বলা হয়েছিলো। কাবুকি থিয়েটার সেখানেই সফল। থিয়েটার থেকে চলচ্চিত্র, আর চলচ্চিত্র থেকে সবাক চলচ্চিত্র, সবের মধ্যেই এই বিশুদ্ধতা থাকা প্রয়োজন।

কাবুকি থিয়েটারের সাজসজ্জা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন আইজেনস্টাইন। এমনভাবে এই সাজসজ্জাগুলি তৈরি করা হয় যে, নতুন একটা তৃতীয় মাত্রা যুক্ত হয় অভিনয়ের সাথে সাথে।

জাপানের যে চিত্রলেখ, সেটি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বস্তুর প্রথাগত বৈশিষ্ট্য থেকে। তৈরি হয়েছে কখনো কখনো ধারণাকে প্রকাশ করতে ইডিওগ্রাম হিসাবে। কখনো ইউরোপের প্রভাবে বর্ণমালা বা ধ্বনিমালা তৈরি হয়েছে। কখনো এটা অবাক করার মতো যে, জাপানীরা একইসাথে এই সমস্ত অক্ষরকে ব্যবহার করে। একটা বাক্য গঠন করতে গেলে চিত্রলেখমালার সাথে বর্ণমালার মিশ্রণ, এটা জাপানীদের কাছে খুব আশ্চর্যের নয়।

জাপানী পদ্য বা প্রথাবদ্ধ কবিতা, স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। একটি পঙক্তিতে কতোগুলি ছন্দভাগ থাকবে, তার নিয়ম প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রথাবদ্ধ। আর তাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যখন পদ্যটি লেখা হয়ে যাবে, তখন পদ্য হিসাবে এবং চিত্র হিসাবে উভয়ভাবেই এটিকে দেখা যেতে পারে।

আইজেনস্টাইনের মতে—জাপানের ইতিহাস ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ সামন্তবাদের বোঝা, যেটা রাজনীতিকভাবে সদ্য অতিক্রম করা গেলেও, এখনো জাপানের চিরাচরিত সংস্কৃতির মধ্যে প্রবহমান। তাই জাপান যদিও পুঁজিবাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তার আর্থনীতিক শ্রেণীবিভাগের ফলাফল অনেক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তাই জাপানীদের মধ্যে এই বিভিন্ন উপকরণের পৃথকীকরণটি অনুপস্থিত।

কাবুকি থিয়েটারের সাথে রয়েছে একই সাথে পৃথকীকরণ না করার চেতনার সাথে মন্তাজ চিন্তাভাবনার মিশ্রণ। মন্তাজ চিন্তাভাবনা কিন্তু এই জাগতিক উপাদানের পৃথকীকরণের শীর্ষে রয়েছে। তাই এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত চেতনার অভাবনীয় মিশ্রণ ঘটেছে কাবুকি থিয়েটারে। কারণ কাবুকি থিয়েটারের মধ্যে একই সাথে পৃথকীকরণের উপাদানগুলিও দেখেছেন আইজেনস্টাইন। তাই তিনি কাবুকি এবং সবাক চলচ্চিত্রের যোগসূত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

চলচ্চিত্র প্রযুক্তির নীতি সম্পর্কে

১৯২৯ সালে আইজেনস্টাইন 'দ্য সিনেমাটোগ্রাফিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যান্ড দ্য ইডিওগ্রাম' প্রবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশ জাপানী চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটি পুস্তিকার পরিশিষ্ট হিসাবে। কাজেই শুধু চিন্তাভাবনা নয়, বিশেষত জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে চলচ্চিত্রের আকার প্রকার উপাদানের যোগসূত্র, এই রচনার বিষয়বস্তু।

আপাত সরস অথচ তিক্ত ভঙ্গীতে আইজেনস্টাইন প্রথমেই শুরু করেছেন পুস্তিকাটিরই সমালোচনা করে—এই পুস্তিকা এমন একটি দেশের চলচ্চিত্র নিয়ে যেখানে চলচ্চিত্রপ্রযুক্তি নেই। অর্থাৎ সিনেমাটোগ্রাফি নেই। তাই আইজেনস্টাইনের প্রবন্ধটি মূলত সিনেমাটোগ্রাফির নীতি সম্পর্কে।

চলচ্চিত্র বলতে আইজেনস্টাইন বোঝেন—বিভিন্ন বিভাগ ও কর্তৃপক্ষ, পুঁজির নানা বিনিয়োগ, নানা ধরণের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং নানা ধরণের নাটকীয়তা।

চলচ্চিত্রপ্রযুক্তি বলতে আইজেনস্টাইন বোঝেন—প্রথমত ও প্রধানত মন্তাজ।

জাপানী চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আইজেনস্টাইন দেখেছেন নানান চমৎকার বিভাগ, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কাহিনীর আয়োজন। কিন্তু জাপানী চলচ্চিত্র মন্তাজের সম্পর্কে কিছুই জানে না। যদিও মন্তাজের নীতি দেখা যায় জাপানী সংস্কৃতির মৌল উপাদানের মধ্যে, জাপানী সংস্কৃতির প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে।

জাপানী ভাষায় লেখা, লেখচিত্র হিয়েরোগ্লাইফ্। আজ থেকে ২৬৫০ বছর আগে চীনাদের দক্ষ হাতে কোনো বস্তুর বাস্তবানুগ ছবি, ঈষৎ প্রথাবদ্ধ হয়ে, লেখচিত্রের প্রথম গুচ্ছ তৈরি করে ৫৩৯টি আকৃতির। বাঁশের ওপর একটা কাঁটার আঁচড় দিয়ে মূল বস্তুটির প্রতিকৃতি আঁকা হতো। তৃতীয় শতাব্দীর সময় তুলি আবিষ্কার হলো। ইতিমধ্যে কাগজ আবিষ্কার হলো। অবশেষে কালি আবিষ্কার হলো।

এক সম্পূর্ণ অভ্যুত্থান। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব। কালি ও তুলির ব্যবহারে আকৃতির নির্দিষ্ট রূপ দেখা গেলো। তাই, ধীরে ধীরে বস্তুর প্রতিকৃতির জায়গা করে নিতে লাগলো ভাবনা (concept)। তাই দুটি বস্তুকে আলাদা আলাদা করে পাশাপাশি আঁকলে, তার যৌথ অর্থ প্রকাশিত হয়।

কুকুর + মুখ = কুকুরের ডাক।

মুখ + শিশু = কান্না।

মুখ + পাখি = গান গাওয়া।

ছুরি + হৃৎপিণ্ড = দুঃখ।

আইজেনস্টাইন দেখেছেন—চলচ্চিত্রে ঠিক এটাই করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য, যার একটিমাত্র অর্থ, সেগুলোকে যুক্ত করা হয় মননশীল পটভূমিতে ও ধারায়। এটাই চলচ্চিত্রপ্রযুক্তির অপরিহার্য উপকরণ ও পদ্ধতি।

আইজেনস্টাইন জাপানী পদ্য 'হাইকু'-র উল্লেখ করেছেন এ প্রসঙ্গে। ত্রয়োদশ শতকে একে বলা হতো 'হাইকাই'। এই খুদে পদ্য বা কবিতায় ঠিক যেন চিত্র-লেখকে কয়েক পঙক্তিতে কবিতার আকার দেওয়া হয়েছে। 'হাইকু'-র আকৃতির মধ্যেও যেন তার ভাব নিহিত রয়েছে। এটাই তো ভাবলেখ (ideogram) তৈরি হওয়ার পদ্ধতি।

হাইকুর আগে ছিলো 'তাঙ্কা', পুরাকাহিনী অনুসারে যার জন্ম স্বর্গ আর পৃথিবীর সাথে একই সময়ে। এই তাঙ্কা ছিলো হাইকুর থেকে দু'লাইন বেশি বড়ো অর্থাৎ পাঁচ লাইনের।

কাইয়োরোকুর হাইকু—

অনেক ভোর

দুর্গটা ঘিরে আছে

বুনো হাঁসের চিৎকারে।

আইজেনস্টাইনের মতে—এগুলো মস্তাজ পংক্তি। এগুলো যেন শটের তালিকা। দু'তিনটে পংক্তি মিলেমিশে একটা নতুন অর্থ তৈরি করছে। এ জিনিসটি জাপানী চিত্র-শিল্পকলায় দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতকে অপূর্ব ছাপা-ছবির স্রষ্টা সারাকু-র শিল্পকর্মের প্রসঙ্গ এনেছেন আইজেনস্টাইন। একটি ছাপা-ছবির মধ্যে যেমন মানুষের মুখের কোনো

কোনো অংশ আপাত বিকৃত—বাড়িয়ে দেখানো হয় নাক বা অন্য অংশ। তার সাথে তুলনা করা যায় প্রচলিত মুখোসের। সেখানেও মুখের কোনো কোনো অংশকে বাড়িয়ে দেখানো হয়। তাতে মুখের বৈশিষ্ট্য বেশি করে প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্রেও তাই হয়। কোনো চেহারা বা দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য, ব্যবহার করা হয় ক্লোজ-আপ শট। এটা দেখানো, যেন চেহারাকে এক ধরণের বিকৃত করা। আর ঠিক এই জিনিসই দেখা যায় জাপানী মুখোসে।

চরম বাস্তববাদ, পর্যবেক্ষণের সঠিক আকৃতি নয়। এটা নিছক সামাজিক কাঠামোয় কোনো নির্দিষ্ট আকৃতির কাজ। রাষ্ট্রের রাজতন্ত্র অনুযায়ী, চিন্তা-ভাবনার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সমস্ত শিল্পকলার ভিত্তি হলো সংঘর্ষ (conflict)। প্রত্যেক শট হলো মন্তাজের কোষ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে—মন্তাজ হলো সংঘর্ষ।

একটা শটের মধ্যে সংঘর্ষ হলো বাস্তবিক মন্তাজ। একটা ফ্রেমের মধ্যে সংঘর্ষকে এভাবে দেখানো যেতে পারে—

বৈখিক দিকের মধ্যে সংঘর্ষ (রেখা—স্থির বা গতিশীল)।

পরিমাপের মধ্যে সংঘর্ষ।

আয়তনের মধ্যে সংঘর্ষ।

ভরের মধ্যে সংঘর্ষ (আলোর বিভিন্ন তীব্রতা আয়তন ভরে রাখে)।

গভীরতার সংঘর্ষ।

চলচ্চিত্র প্রযুক্তির যাবতীয় উপাদান ও প্রকৃতিকে সংঘর্ষের একটিমাত্র দ্বান্দ্বিক সূত্রে সংক্ষেপিত করাটা নিছক বুদ্ধিবৃত্তির খেলা নয়। আমরা চাইছি, চলচ্চিত্রপ্রযুক্তির প্রকাশের পদ্ধতির একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা, যেটা এর সমস্ত উপাদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। আইজেনস্টাইন সারা জীবন ধরে সংঘর্ষের একটিমাত্র দ্বান্দ্বিক সূত্র অনুসন্ধান করেছেন।

রচনাবলীর বিষয় ও বিবর্তন

আইজেনস্টাইনের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে, 'লেফ্' (Lef) পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায়। বিষয়—আকর্ষণের মন্তাজ। তখনো আইজেনস্টাইন কোনো পূর্ণ দৈর্ঘের চলচ্চিত্র তৈরি করেননি। সবেমাত্র প্রলেৎকুল্ত্ থিয়েটারে 'এনাফ্ সিম্প্লিসিটি' নাটকের মধ্যে সামান্য অংশ চলচ্চিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন।

এই নিবন্ধটির বিষয়বস্তুর মধ্যে আইজেনস্টাইনের ভাবনা-চিন্তায় নাটক থেকে চলচ্চিত্রে উত্তরণ প্রস্ফুটিত। তাঁর মতে, নাটকের মূল উপাদান আসে দর্শকের

কাছ থেকে. এবং নাটকের কলাকুশলীরা দর্শককে যে বাঞ্ছিত দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে বাঞ্ছিত মেজাজের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্য থেকে। দর্শককে একটি নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যাওয়া সমস্ত সক্রিয় নাটকেরই প্রধান কাজ—তা সে প্রচার-ধর্মী'ই হোক বা শিক্ষামূলকই হোক। এই সব কিছুই করার জন্য বিভিন্ন নাটক বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের একটি মাত্র আদর্শ থাকে, যেটা আকর্ষণের সাধারণ গুণের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। এই আকর্ষণের মধ্যে কিন্তু কোনো বিশেষ চাতুরী নেই। নাটক এখন এক সমস্যার মধ্যে পড়েছে, যেখানে কোনো কাল্পনিক ছবিকে বাস্তব উপাদানের মন্তাজে রূপান্তরিত করতে হবে। পরিচালকের হাতে সমস্ত বিশদ একজোট হবার পর দেখা যায়, প্রযোজনার সত্যিকারের শক্তপোক্ত ভিত্তি হলো আকর্ষণ এবং আকর্ষণের ব্যবস্থা। তাই পরিচালক সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে সেই উপাদানগুলিকে ব্যবহার করেন। আইজেনস্টাইন এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে—চলচ্চিত্রের মধ্যে মন্তাজকারী শিক্ষা নিতে পারে। এ ধরণের শিক্ষাদান নাটকের মতো মাধ্যমে করা প্রয়োজন।

১৯২৫ সালে 'সিনেমা টুডে' প্রকাশনায় পাওয়া যায় আইজেনস্টাইনের 'স্ট্রাইক' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যের অংশবিশেষ।

১৯২৮ সালের অক্টোবরে লণ্ডনের 'ক্লোজ-আপ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আইজেনস্টাইন, পুদভ্কিন এবং আলেকজাণ্ডারের যৌথ বিবৃতি—'দ্য সাউণ্ড ফ্লিম্ম'। এই যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা সবাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন।

১৯২৮ সালে, রাশিয়ায় জাপানের কাবুকি থিয়েটার দেখার পর আইজেনস্টাইন রচনা করেন 'দ্য আনএক্সপেক্টেড' নিবন্ধ।

১৯২৯ সালে জাপানী সিনেমার প্রসঙ্গে তিনি রচনা করেন 'দ্য সিনেমাটোগ্রাফিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড দ্য ইডিওগ্রাম' নিবন্ধটি।

১৯২৯ সালেই তাঁর 'দ্য ফিল্মিক ফোর্থ ডাইমেন্শান্' নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই রচনায় আইজেনস্টাইন গোঁড়া মন্তাজের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি, মন্তাজ সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা প্রকাশ করেন। এই রচনাটিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় তাঁর নিজের তৈরি 'ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' চলচ্চিত্রটির প্রসঙ্গ। এই নিবন্ধেই তিনি চলচ্চিত্রে মন্তাজের ক্ষেত্রে মাত্রা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। একটি স্থানের যে তিনটি মাত্রা থাকে, তার সাথে আধুনিক বিজ্ঞান, আইজেনস্টাইনের মতে, সময়ের চতুর্থ মাত্রা যুক্ত করে। এটা কোনো দৈনিক ব্যাপার নয় বা রসিকতা নয়। সঙ্গীতের ওভারটোনের মতো, অর্থাৎ উচ্চতর সূক্ষ্ম পর্দার মতো, দৃশ্যেরও এক ধরণের ওভারটোন থাকে। এই ওভারটোন মন্তাজ একটা নতুন সংযোজন। তাই এর পর হয়তো আমরা আমাদের প্রচলিত মাত্রার সাথে পঞ্চম মাত্রার সংযোজনের প্রসঙ্গও এনে ফেলবো।

১৯২৯ সালের শরতে আইজেনস্টাইনের 'মেথডস্ অফ মন্তাজ' প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন তোলেন যে, ওভারটোনাল মন্তাজ কি চলচ্চিত্র-প্রযুক্তিতে কৃত্রিমভাবে আরোপিত? এটাকে মন্তাজের সমস্ত পদ্ধতির বিকাশের মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিক স্তর হিসাবে কি দেখা যায়? সেই বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তিনি একের পর এক মেট্রিক মন্তাজ, রিদ্‌মিক্ মন্তাজ, টোনাল মন্তাজ এবং অবশেষে ওভারটোনাল মন্তাজ আর ইনটেলেকচুয়াল মন্তাজের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর নিজের চলচ্চিত্র থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে আইজেনস্টাইন বোঝাতে চেয়েছেন মন্তাজের এই প্রত্যেকটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য, এবং অবশেষে তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতের চলচ্চিত্রে ওভারটোনের প্রশ্নটির বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। এই মন্তাজের পদ্ধতিকে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত আমাদের।

এ সময়ে আইজেনস্টাইনের প্রস্তাবিত 'অ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি' চলচ্চিত্রের প্রথম সারাংশ প্রস্তুত হয়। এর খসড়ায় স্বাক্ষর ছিলো আইজেনস্টাইন এবং তাঁর সহযোগী ইভার মণ্টাগুর। এই চিত্রনাট্যটি বস্তুত সংগ্রহের সামগ্রী হিসাবে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট ফিল্ম লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। চলচ্চিটি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

ওই একই সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে আইজেনস্টাইনের ১৯৩৯ সালে প্রস্তাবিত 'শাটারস্ গোল্ড' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের প্রথম সারাংশ। এই চলচ্চিত্রটিও বাস্তবায়িত হয়নি।

ওই সংগ্রহে রয়েছে প্রায় একই সময়ে তাঁর অসম্পূর্ণ 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের খসড়া রূপরেখা।

১৯২৯ সালে আইজেনস্টাইনের 'এ ডায়ালেক্টিক অ্যাপ্রোচ টু ফিল্ম ফর্ম' নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধের মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের মুখবন্ধে, তিনি শিল্পকলা প্রসঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। এখানে আইজেনস্টাইন সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—শিল্পকলা হলো অবিরাম সংঘর্ষ। সেটা শিল্পকলার সামাজিক উদ্দেশ্য, এর প্রকৃতি এবং এর পদ্ধতি অনুযায়ী ঘটে থাকে। চলচ্চিত্রের মৌল উপাদান হলো শট এবং মন্তাজ। এই মন্তাজকে বোঝাতে গিয়ে, আইজেনস্টাইন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শব্দের কম্পনের সাথে তুলনা করেছেন দৃশ্যের কম্পনের। আর এখানেই তিনি বলেছেন—শট হলো মন্তাজের কোষ বা অণু। নিজেই বলেছেন, 'আমাদের এখনো একটা শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সংশ্লেষণ বা সমন্বয় পেতে হবে। আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে নতুন যুগের যথাযথ নাম হতে পারে এই সংশ্লেষণ।

১৯৩২ সালে তাঁর 'এ কোর্স ইন ট্রিটমেণ্ট' নিবন্ধটি লেখা হয়। এই নিবন্ধে আইজেনস্টাইন আমোদ-প্রমোদের সাথে উপভোগের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রসঙ্গটি আনেন। এই বিষয়ে সত্যিকারের কোনো তর্ক তিনি করতে চাননি। কিন্তু

তাঁর দীর্ঘ নিবন্ধে তখনকার বিখ্যাত সাহিত্য ও চিত্রকলার প্রসঙ্গ তিনি আলোচনা করেছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। এখানেও আমরা দেখতে পাই মন্তাজের গভীর আলোচনা।
১৯৩৪ সালে তিনি রচনা করেন 'ফিল্ম ল্যাংগুয়েজ' নিবন্ধটি। এর পূর্ববর্তী নিবন্ধে যেমন প্রধানত সাহিত্যের প্রসঙ্গে গভীর আলোচনা ছিল, এখানে তিনি অনেক বেশি তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রপ্রযুক্তি সম্পর্কে। ম্যাক্সিম গোর্কি সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে যেমন বক্তব্য রেখেছেন, আইজেনস্টাইনও তেমনি চেষ্টা করেছেন চলচ্চিত্রের ভাষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বলার। ফ্যাশন চলে যায়—সংস্কৃতি রয়ে যায়। এই ফ্যাশনের অন্তরালে যে সংস্কৃতি, সেটাকে লক্ষ্য করা হয় না। আইজেনস্টাইনের কাছে চলচ্চিত্রের নির্মাণে যে সামগ্রিক অশিক্ষা, অবহেলা ছিলো, সোভিয়েতের সময়কালে, তাঁদের হাতে, তাঁদের নীতিতে পরে সেটি পরিণত হয়েছে চলচ্চিত্র-সংস্কৃতিতে। অনেকে মনে করেন মন্তাজ আর প্রথাবদ্ধতার বামপন্থী বাড়াবাড়ি সমার্থক। কিন্তু মন্তাজ সেরকম কিছু নয়। অবশ্যই দর্শকরা কিছুটা পরিমাণে, মন্তাজে পর পর শটগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে কিনা তা পরিমাপ করতে পারে। চলচ্চিত্রের ভাষার যে সংস্কৃতি, তার সমস্যাগুলোকে ধারালোভাবে তুলে ধরার এটাই তো সময়। চলচ্চিত্রকারদের সবথেকে প্রথমে তাঁদের নিজেদের চলচ্চিত্রের মন্তাজ এবং শটের ভাষা সম্পর্কে কথা বলতে হবে।
১৯৩৪ সালে তিনি রচনা করেন 'থ্রু থিয়েটার টু সিনেমা' নিবন্ধটি। এই নিবন্ধটি কিছুটা ইতিহাসের পর্যালোচনার ঢঙে শুরু হয়েছে। তাঁর মতে, আজকের চলচ্চিত্রকাররা তাঁদের সৃষ্টিশীল শুরুর বিভিন্ন পথকে জানতে আগ্রহী হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে কেমন করে নাটক থেকে চলচ্চিত্রে এলেন, তা বর্ণনা করেছেন। তাঁর সেই কথা, ১৯২৪ সালে—'গল্প এবং কাহিনী নিপাত যাক', নিজেই নতুন পটভূমিতে বিচার করতে বসেছেন আইজেনস্টাইন। চলচ্চিত্রের ভাষার ক্ষেত্রে তিনি যেমন সুস্পষ্ট মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী, এই সময়কালের রচনায় সেটি স্পষ্টভাষায় ঘোষিত। তাই সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবী চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে গল্পের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে, আইজেনস্টাইন এখন সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।
১৯৩৫ সালে তিনি লেখেন 'ফিল্ম ফর্ম: নিউ প্রবলেমস্' নিবন্ধটি। আইজেনস্টাইন একথাটা দিয়েই শুরু করেছেন যে, হেরাক্লেটাস দেখেছেন কোনো মানুষ একই নদীতে দুবার স্নান করতে পারে না। সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র এগিয়েই চলেছে। তাই কোনো সৌন্দর্যের একই মাপকাঠি, শিল্পকলা বিকাশের দুটি স্তরে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। শৈল্পিক প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে পুরনো চিন্তাভাবনার যে নিয়মাবলী আছে, সেগুলির মধ্যে একটিকে তিনি

উপযুক্ত স্তরে প্রয়োগ করার কথা লিখেছেন। এ ব্যাপারে তিনি সতর্ক আছেন, চলচ্চিত্রের কাহিনীতে ঠিক যেমন পরিস্থিতি ও পরিবেশের বর্ণনা আছে, শৈল্পিকভাবে যেন সেটি উপস্থাপিত হয়। এর আগের কয়েকটি নিবন্ধের মতোই এখানেও তিনি মার্কস এবং এঙ্গেলসের দার্শনিক বিশ্লেষণ টেনে এনেছেন। এ সময়কালটাকেই তিনি তাঁদের চলচ্চিত্রের চিরায়তবাদী সময়কালের শিখর আছেন বলে মনে করছেন।

ওপরের ঐ নিবন্ধের সময়ে দীর্ঘ তিন বছর ধরে আইজেনস্টাইন পারতপক্ষে চলচ্চিত্র তৈরির কোনো কাজই প্রায় করেন নি। এবার তিনি নতুন করে 'বেঝিন মিডো' চলচ্চিত্রের কাজে হাত দিলেন, কিন্তু এটি অসম্পূর্ণ থেকে গেলো। নানা কারণে এই সময়কালটি সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটায় বহু শিল্পী সাহিত্যিকের উত্থান-পতন ঘটেছে। এমনই এক সময়ে সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি'র মৃত্যু হয়। গোর্কি'র মৃত্যুতে শোকাহত আইজেনস্টাইন ১৯৩৬ সালে লেখেন 'দ্য গ্রেটেস্ট ক্রিয়েটিভ অনেস্টি' নিবন্ধটি।

১৯৩৯ সালে তিনি লেখেন দীর্ঘ নিবন্ধ 'মন্তাজ ইন ১৯৩৮', যেখানে সমসাময়িক সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যতত্ত্বের চুলচেরা বিচার করেন তিনি। এই নিবন্ধে লক্ষ্য করা যায়, চলচ্চিত্রে মন্তাজের ব্যবহারে 'বামপন্থীদের' বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন। মন্তাজের মধ্যে দিয়ে দুটি ভিন্ন শটের সমন্বয়ে একটি তৃতীয় অর্থ বেরিয়ে আসে বলে অনেকেই অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠে এই নতুন সমন্বয়ে। নিজে যেহেতু শিক্ষাদানে অধিকতর ব্যস্ত, তাই এ নিবন্ধে অ্যাকাডেমিক স্টাইলটি বজায় রেখেছেন আইজেনস্টাইন।

বিশ্বে তখন ফ্যাসিবাদের আক্রমণের রক্তাক্ত অধ্যায় শুরু হয়েছে। আমেরিকায় চলচ্চিত্র অভিনেতা ও পরিচালক চার্লি চ্যাপলিন ইতিমধ্যেই আইজেনস্টাইনকে তাঁর গুণমুগ্ধ হিসাবে পেয়েছেন। চার্লিকে অভিনন্দন জানাতে আইজেনস্টাইন লিখেছিলেন 'হ্যালো, চার্লি' নিবন্ধটি। চার্লি সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের অপর যে দুটি নিবন্ধ আছে, সেগুলি এই নিবন্ধটির পরে লেখা। চার্লিকে তিনি অসাধারণ এবং মানবিক শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন। ফ্যাসিস্ত আক্রমণ এবং নৃশংসতার বিরুদ্ধে চার্লি'র যে শৈল্পিক সক্রিয়তা, আইজেনস্টাইন তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

১৯৩৯ সালেই আইজেনস্টাইন অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর চিরসঙ্গী আলোকচিত্রী এডোয়ার্ড টিসেকে, তাঁর কর্মজীবনের রজতজয়ন্তী বর্ষে 'টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড ফিফটিন' নিবন্ধে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করতে চলেছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে আইজেনস্টাইন তাঁর চলচ্চিত্র তৈরির কাজে খুব

বেশি এগোতে পারছিলেন না। ঠিক এমনি সময়ে ১৯৩৯ সালে তিনি লেখেন 'দ্য স্ট্রাক্‌চার অফ দ্য ফিল্ম' নিবন্ধটি। এই নিবন্ধে তিনি তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'আলেকজান্দার নেভস্কি' চলচ্চিত্রের কিছুটা বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই নিবন্ধের বিরাট অংশ জুড়ে 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের আঙ্গিক ঐক্য ও করুণ রস বিষয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। নিবন্ধের শেষে পরিশিষ্ট এবং টীকা যোগ করেছেন। এই টীকায় আইজেনস্টাইন জানিয়েছেন সঙ্গীতকার এডমান্ড মাইজেল (Edmund Meisel) 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত সৃষ্টি করেন। মাইজেল এটি প্রধানত করেন বিদেশের দর্শকদের জন্য। খুব তাড়াহুড়ো করে করলেও এর সঙ্গীত-সৃষ্টিতে 'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রটি প্রায় যথাযথ সবাক চলচ্চিত্রের স্তরে উন্নীত হয়।

১৯৩৯ সালে আইজেনস্টাইন 'আলেকজান্দার নেভস্কি' নিবন্ধটি লেখেন। মূল বিষয় ছিলো 'আলেকজান্দার নেভস্কি' চলচ্চিত্রের পটভূমি ও পর্যালোচনা।

১৯৪০ সালে লেখেন 'দ্য বার্থ অফ অ্যান আর্টিস্ট' নিবন্ধটি। বিষয়বস্তু—নতুন শিল্পী হিসাবে চলচ্চিত্রকার দভ্‌ঝেঙ্কোর আবির্ভাব। দভ্‌ঝেঙ্কোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সাথে, নতুন চলচ্চিত্রকারদের আইজেনস্টাইন এ নিবন্ধে স্বাগত জানাতেন, কেমন করে বোঝা যায়।

১৯৫০ সালে আইজেনস্টাইন লেখেন 'নট্‌ কালার্ড, বাট্‌ ইন কালার' নিবন্ধ। এই নিবন্ধে তিনি দেখান, কেমন করে রঙীন চলচ্চিত্র না হয়েও, সাদা-কালো নির্বাক চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর মতে, নির্বাক চলচ্চিত্রে ইতিমধ্যেই শব্দের উপস্থিতি ছবির দৃশ্যে যেমন বোঝানো হয়েছে, তেমনই রঙের বিভিন্ন অস্তিত্ব শুধু সাদা ও কালো, কিছুটা ধূসর, ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে। তাই রঙীন না হলেও, নির্বাক চলচ্চিত্রের সাদা-কালো দৃশ্য কিন্তু রঙেই প্রকাশিত।

১৯৪৩ সালে তাঁর প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ 'ফিল্ম সেন্‌স' সংকলন গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে ১৯৪৩ সালের পূর্ববর্তী বিভিন্ন নিবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন জে. লেইডা। এটিই ছিলো আইজেন-স্টাইনের প্রথম ইংরেজি গ্রন্থ।

এই সংকলনে চলচ্চিত্রের তত্ত্ব সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ নিবন্ধ—'সিনক্রোনাইজেশান্‌ অফ সেন্সেস্‌', 'কলার অ্যান্ড মিনিঙ' এবং 'ফর্ম অ্যান্ড কন্টেন্ট' যুক্ত হয়। গ্রন্থটির প্রথম নিবন্ধ 'ওয়ার্ড অ্যান্ড ইমেজ' আসলে 'মন্তাজ ইন ১৯৩৮' নিবন্ধটিরই নাম পরিবর্তন করে প্রকাশিত।

'সিনক্রোনাইজেশন অফ সেন্সেস্‌' নিবন্ধে আইজেনস্টাইন সবাক চলচ্চিত্রের দৃশ্য ও শব্দের সংমিশ্রণের থেকেও, গভীর অনুভূতি প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন।

'চলচ্চিত্রের প্রত্যেকটি দৃশ্যের সাথে তার অর্থের একটি অভ্যন্তরীণ সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে আমরা বুনিয়াদি ও প্রাথমিক বস্তুতে পৌঁছতে পারি। মন্তাজের 'বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে ইন্দ্রিয়ের এই অভ্যন্তরীণ সংমিশ্রণ ঘটে। চিত্রকলা ও সঙ্গীতের মধ্যে এই সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গ এসেছে সঙ্গীতের সাথে রঙের সম্পর্কের।

'কলার অ্যান্ড মিনিঙ' নিবন্ধে শব্দের সাথে রঙের সম্পর্ককে আরও সম্প্রসারিত করে, অনুভূতির সাথে রঙের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। কোনো শব্দের নিজের যেমন একটা বর্ণ থাকে, তেমনি অভ্যন্তরীণ অনুভূতিরও একটি প্রতীক বর্ণ থাকে। মানুষের ও প্রকৃতির বিভিন্ন অনুভূতিকে রঙ দিয়ে বোঝানো যায়। এটা উচ্চমার্গের তর্কের পরিবর্তে শত শত বৎসর ধরে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও শিল্পীর সৃষ্টিতে পরিস্ফুট। কোনো একটি বিশেষ আবেগ বা প্রতিক্রিয়াকে রঙ দিয়ে বোঝানোর কথা সেক্সপীয়ারের সাহিত্যেও আছে। কাজেই, অনুভূতির একটি বর্ণময় চরিত্র থাকে।

'ফর্ম অ্যান্ড কনটেন্ট' নিবন্ধে আইজেনস্টাইন বিশ্লেষণ করেছেন সঙ্গীতের সাথে দৃশ্যের সংমিশ্রণকে। কোনো সঙ্গীত নিজেই একটি দৃশ্য-কল্পনার জন্ম দিতে পারে। আবার একটি দৃশ্যের নিজেরও সাঙ্গীতিক চরিত্র থাকে। এই দুটিকেই মিশ্রিত করার যথাযথ প্রয়োগ-কলার মধ্যেই কোনো শিল্পকর্মের সার্থকতা। এই প্রসঙ্গে প্রত্যেকটি দৃশ্যের অন্তর্বস্তু কথা এসে পড়ে, তার আকৃতির সাথে সাথে। দৃশ্যগুলির সার্থক সম্পাদনা করা যায়, প্রত্যেকটি ছন্দ ও লয়কে সঙ্গীতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। যদিও আইজেনস্টাইন পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পী সাহিত্যিকের সৃষ্টির বিশ্লেষণ করেছেন, তবুও তাঁর মনে আছে সঙ্গীতস্রষ্টা ভাগনারের কথা—যে সৃষ্টি করে সে কখনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

'ডিকেন্স, গ্রিফিথ অ্যান্ড দ্য ফিল্ম টুডে' নিবন্ধটি লেখেন ১৯৪৪ সালে। এই নিবন্ধে আইজেনস্টাইন প্রধানত ডিকেন্সের সাহিত্য এবং গ্রিফিথের চলচ্চিত্রের তত্ত্ব তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রের ব্যাকরণের সাথে তুলনা করে আলোচনা করেছেন। ডিকেন্সের সাহিত্যে তিনি দেখেছেন 'চলচ্চিত্রের গুণাবলী। এত বিশদ করে কোনো দৃশ্যের বর্ণনা করতেন ডিকেন্স যে তার প্রতিচ্ছবি অনুভূত হতো পাঠকের মনে। আইজেনস্টাইনের মতে, গ্রিফিথের চলচ্চিত্রের চিন্তাভাবনা রূপ পেয়েছে ডিকেন্সের সাহিত্য থেকে। আর সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রের তত্ত্ব রূপ পেয়েছে গ্রিফিথের ব্যাকরণ থেকে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া অকৃতজ্ঞ না হয়েও একথা বলতে বাধ্য যে, রাশিয়ার মন্তাজের তত্ত্ব গ্রিফিথের তত্ত্বের থেকে অনেক এগিয়ে। তার কারণ, সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শগত অবস্থান। তবুও গ্রিফিথের অবদান অপরিসীম।

১৯৪৫ সালে আইজেনস্টাইন লেখেন 'নোটস ফ্রম এ ডিরেক্টরস্ ল্যাবরেটরি।' তাঁর জীবনের শেষ এবং সর্বাধিক বিতর্কমূলক চলচ্চিত্র 'ইভান দ্য টেরিবল' যখন তৈরি করছিলেন, তখন কিছু নোট রেখে দিয়েছিলেন। এই নোটগুলির মধ্যে চলচ্চিত্রটির নির্মাণে আইজেনস্টাইনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে পাওয়া যায়।

'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রের কাজ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে দীর্ঘদিন স্থগিত ছিলো, তখন আইজেনস্টাইন যুক্ত হয়েছিলেন সেগেই ইয়ুৎকেভিচের 'লিবারেটেড ফ্রান্স' তথ্যচিত্রের পর্যালোচনায়। নিঃসন্দেহে এই তথ্যচিত্রটি তখনকার সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রে মূল্যবান সংযোজন। সংরক্ষিত বিভিন্ন দৃশ্যের সুষম সম্পাদনায় ইয়ুৎকেভিচ সফলভাবে গড়ে তোলেন এই চলচ্চিত্রটি, এবং তাঁর সব থেকে শ্রদ্ধেয় সহকর্মী আইজেনস্টাইন এর পর্যালোচনা করেন। এই পর্যালোচনায় আইজেনস্টাইন অভিনন্দিত করেন এই নতুন স্তরকে, যেখানে কাহিনীর চলচ্চিত্রকাররা আবার তথ্যচিত্রের দিকে ফিরে এসেছেন। একসময় সোভিয়েত রাশিয়ার কাহিনীর চলচ্চিত্রকাররা, তথ্যচিত্র থেকে অনেক কিছু শিখেছেন।

১৯৪৩-৪৪ সালের সময়কালে চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'চার্লি দ্য কিড' নিবন্ধটি লেখেন আইজেনস্টাইন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, চার্লি সম্পর্কে তিনি ১৯৩৭ সাল থেকে নোট রাখতে আরম্ভ করেন। পশ্চিমী বিদেশের বন্ধু চার্লি সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের অনুরাগ অনেক বছর ধরে, যখন 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়নি। এই নিবন্ধে চার্লির বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। অবশেষে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চার্লির যে অসাধারণ ভূমিকা, তার উল্লেখ করেছেন।

১৯৪৫ সালে আইজেনস্টাইন 'হাউ আই বিকেমএ ফিল্ম ডিরেক্টর' নিবন্ধটি লেখেন। প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনাবলী দিয়ে তাঁর বর্ণনা শুরু এবং কিভাবে তিনি চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় প্রবেশ করলেন তারই বিশদ ইতিহাস এই নিবন্ধ।

১৯৪৬ সালে আরও একজন স্রষ্টা প্রকোফিয়েভ সম্পর্কে আইজেনস্টাইন 'পি. আর. কে. এফ. ভি.' নিবন্ধটি লেখেন। এই নিবন্ধে সঙ্গীতস্রষ্টা প্রকোফিয়েভের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন তিনি।

১৯৪৭-৪৮ সালের সময়কালে তিনি 'স্টিরিওস্কোপিক ফিল্মস' নিবন্ধটি লেখেন। এই নিবন্ধে তিনি স্টিরিওস্কোপিক ফিল্মে গভীরতার যে তৃতীয় মাত্রাটি যুক্ত হবে, তারই টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বি-মাত্রিক চলচ্চিত্রের পরে একটি নতুন স্তর ত্রি-মাত্রিক চলচ্চিত্রকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন উদাত্ত কণ্ঠে। আইজেনস্টাইন বলেছেন, তাঁর দেশ নতুন নতুন সফলতা, নতুন

টেকনিক আর উজ্জ্বল আগামী দিনকে স্বাগত জানাতে পারে। এই ত্রি-মাত্রিক চলচ্চিত্র তাই তাঁর কাছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।

১৯৪৮ সালে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রকার কুলেশভকে একটি দীর্ঘ চিঠিতে 'কালার ফিল্ম' সম্পর্কে লেখেন। এই চিঠিটি তাঁর জীবনের শেষ রচনা। চিঠিটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। এখানে আইজেনস্টাইন রঙিন চলচ্চিত্রের আবির্ভাবকে অন্যান্য বহু নতুন আবিষ্কারের মতোই স্বাগত জানিয়েছেন। এই অসম্পূর্ণ চিঠির শেষ লাইনে তিনি সবে শুরু করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ চলচ্চিত্র 'ইভান দ্য টেরিবল' সম্পর্কে আলোচনা, যে চলচ্চিত্রে তিনি নিজেই রঙের ব্যবহার করেন।

'ইভান দ্য টেরিবল' চলচ্চিত্রের যে অংশটি রঙিন সেটা সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, আর চলচ্চিত্রটির পরিকল্পনাটিও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

আইজেনস্টাইনের জীবিতকালে তাঁর রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদের প্রথম সংকলন 'ফিল্ম সেন্স' প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। তার কিছু বছর পরে রাশিয়াতে প্রকাশিত হয় 'নোটস অফ এ ফিল্ম ডিরেক্টর' সংকলন গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে যদিও লেখা আছে ১৯৪৬ সালের অগাস্ট মাস, কিন্তু সংকলনটিতে রয়েছে আইজেনস্টাইনের লেখা ১৯৪৬ সালের পরের কয়েকটি নিবন্ধ। এই গ্রন্থটিতে প্রকাশের কোনো তারিখ নেই, তবুও ধরে নেওয়া যায় ১৯৪৮ সালে বা ঠিক তার পরে এটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই সংকলন গ্রন্থের প্রস্তুতির সময় আইজেনস্টাইন অবশ্যই জীবিত ছিলেন।

তাঁর নিবন্ধের ইংরেজি অনুবাদের দ্বিতীয় সংকলন 'ফিল্ম ফর্ম' প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে, তাঁর মৃত্যুর পর। তারও পরে 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে।

'স্ক্রিন প্লে ইভান দ্য টেরিবল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। ইতিমধ্যে তাঁর ড্রয়িংয়ের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৬১-তে।

১৯৬৮ সালে আরও কিছু নিবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ সংকলিত হয় 'ফিল্ম এসেস' গ্রন্থে।

রাশিয়ার সরকারি চলচ্চিত্র শিক্ষায়তনে আইজেনস্টাইন যখন শিক্ষকতা করতেন তখন তাঁর বক্তৃতার যে নোট রাখা হতো, সেই নোটের সংকলন ১৯৬২ সালে 'লেসনস উইথ আইজেনস্টাইন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আইজেনস্টাইনের রচনাবলী বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষত রুশ ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত। এবং সম্ভবত আজও তাঁর সমস্ত রচনার ইংরেজি অনুবাদ সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না।

১৯২৩ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আইজেনস্টাইনের

রচনার বিবর্তন চোখে পড়ে। সেটা ঠিক একটি ভাবনা থেকে আরেকটি ভাবনায় সরলভাবে রূপান্তর নয়। বরং জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি যতোটা পরিপক্ব, তার থেকেও বেশি সরস লেখক হয়ে উঠেছেন।

আইজেনস্টাইন তাঁর প্রথম রচনা থেকে শুরু করে মস্তাজ তত্ত্বের শিখরে পেঁছেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে, চলচ্চিত্র তৈরির প্রথম কয়েক বছরে। এ সময়ে তাঁর লেখা খুব স্পষ্ট হলেও সহজবোধ্য নয়। কিন্তু এই লেখাগুলিতে ছড়িয়ে আছে তাঁর চলচ্চিত্রের মূল তত্ত্ব। পরবর্তীকালে তিনি শুধু সেই তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করেছেন, আরও বিস্তৃত করেছেন।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট আনুগত্য রয়েছে এই দুরূহ তাত্ত্বিক নিবন্ধগুলিতে। তিনের দশকের মাঝামাঝি কয়েকজন ব্যক্তির সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন আইজেনস্টাইন। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে তাঁর নিজের চলচ্চিত্রের এবং কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হতে থাকে। যার ফলে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী থেকে পুনর্গঠিত করে নেওয়া যায় তাঁর তাত্ত্বিক নিবন্ধের ভিত্তিকে। হয়তো খানিকটা স্মৃতিকে মন্থন করতে গিয়ে গিয়ে আইজেনস্টাইন অনেক বেশি ব্যক্তিমানুষে পরিণত, তাই অনেক বেশি সরল ও সরস।

জীবনের শেষ প্রান্তেও তাঁর আশাবাদ এবং সংগ্রামী মনোভাবে কোথাও ফাটল দেখা যায় না। কিন্তু সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি এখন অনেক বেশি আন্তর্জাতিক। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে কথা বলেন, সে ভাবেই তিনি তাঁর জীবনের শেষ চলচ্চিত্রকে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আইজেনস্টাইনের কোনো লেখার ইংরেজি অনুবাদ আমাদের হাতে নেই। এখনও তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের যথেষ্ট যথাযথ সংকলন প্রকাশিত হয়নি। যার ফলে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে।

জীবনের যাত্রাপথে আইজেনস্টাইন হঠাৎ মৃত্যুতে হারিয়ে গেছেন। তাই তাঁর জীবনের শেষ এবং অসম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের রাজনীতিক বক্তব্য, নিবন্ধ রচনার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়নি।

সেগেই মিখাইলোভিচ্ আইজেনস্টাইনের পিতা মিখাইল অসিপোভিচ্ আইজেনস্টাইন (Mikhail Osipovich Eisenstein) এক জার্মান ইহুদি পরিবারের সন্তান। এ'রা রাশিয়ায় এসে, সেখানকার মতো খাপ খাইয়ে নেন। অসিপোভিচ্ প্রথমে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন, পরে রিগাতে চলে আসেন। সেখানেই তিনি সড়ক নির্মাণ বিভাগে চাকরি শুরু করে, পরে শহরের প্রধান স্থপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রিগা শহরে আজও আইজেনস্টাইনের পিতার তত্ত্বাবধানে তৈরি অনেক অট্টালিকা বেঁচে আছে।

আইজেনস্টাইনের মা জুলিয়া ইভানোভ্না মধ্যবিত্ত রুশ পরিবারের মেয়ে—তবে পরে তাঁর পিতা সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ব্যবসা করে অর্থবান হয়ে ওঠেন। জুলিয়া সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। আইজেনস্টাইনের মাত্র ১১ বছর বয়সে তাঁর পিতা-মাতার মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। মা জুলিয়া এই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেননি।

মস্কোর সংগ্রহশালায় আইজেনস্টাইন ও তাঁর পিতা-মাতার মধ্যে আদান-প্রদান করা ৪৬৪-টি চিঠিপত্র সংরক্ষিত আছে বলে শোনা যায়—যার মধ্যে ৩৬২-টি চিঠিই আইজেনস্টাইনের লেখা। আজও এই ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বাইরের দুনিয়ার কাছে অজানা।

আইজেনস্টাইনের পিতা রুশ আমলা শ্রেণীর প্রতিনিধি ও প্রবক্তা ছিলেন। তাই তাঁর আচার-আচরণ ছিলো এই শ্রেণীর মতোই। কিন্তু জুলিয়া এটা পছন্দ করতেন না। তাই তিনি ছোট্টো মিখাইলোভিচ্‌কে অন্যরকম শিক্ষা দিতেন। সেটাই আইজেনস্টাইনের জীবনে সাংস্কৃতিক বড়ো শিক্ষা হয়ে উঠলো।

মাত্র দশ বছর বয়সে, মায়ের শিক্ষায় আইজেনস্টাইন সাবলীলভাবে ইংরেজি, ফরাসি এবং জার্মান ভাষা লিখতে-পড়তে পারতেন। সেই বয়সেই এই সব ভাষার চিরায়ত গ্রন্থাবলী মূল ভাষায় পড়তে শুরু করেন।

১৯০৬ সালে ৮ বছর বয়সে, আইজেনস্টাইন প্যারিসে বেড়াতে গিয়ে, মেলিয়ের (Melies) প্রথম চলচ্চিত্রের স্বাদ পান। সেই স্মৃতি দীর্ঘ দিন তাঁর মনে রয়ে গেছে।

আইজেনস্টাইনের পিতা-মাতার মধ্যে সংঘর্ষ চরমে ওঠে এবং ১৯০৫ সালে জুলিয়া বাড়ি ছেড়ে চলে যান, পিতার হেফাজতে আইজেনস্টাইনকে রেখে। অবশেষে তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আইজেনস্টাইনের জীবনে এটা মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

রাতের পর রাত, আইজেনস্টাইন শুনতেন তাঁর ঘর থেকে—পিতা-মাতার খরে চিৎকার করে ঝগড়ার আওয়াজ। ছোট্টো আইজেনস্টাইন ছুটে চলে যেতেন তাঁর নার্সের ঘরে। সেখানে বালিশে মুখ গুঁজে রাখতেন, যতোক্ষণ না পিতা-মাতা ঝগড়া থামিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আসতেন।

পিতা-মাতার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর, আইজেনস্টাইন পিতার সঙ্গেই রয়ে যান। বোর্ডিং হাউসগুলোতে তিনি গ্রীষ্মকালের ছুটি কাটাতেন। খ্রীস্টমাসের দিন কাটাতেন মায়ের সাথে।

বন্ধুদের সাথে সব রকম খেলাই খেলতে ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনে বড়ো সঙ্গী হয়ে উঠেছেন—অশিক্ষিত মহিলা নার্স। পরবর্তীকালেও এই নার্স তাঁর গৃহকর্ত্রী হিসাবে রয়ে গেছেন।

আইজেনস্টাইনের পিতা-মাতার সম্মানে লাগতো, তাঁকে নিয়ে স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখাতে। এই নার্সই তাঁকে নিয়ে সিনেমা দেখাতে যেতেন।

আইজেনস্টাইনকে রূপকথা ও লোককাহিনীর আশ্চর্য জগতের স্বাদও দিয়েছিলেন এই নার্স। তাঁকে কতো গল্প শুনিয়েছেন।

ছেলেবেলায় তাঁর অন্যতম আগ্রহ ছিলো স্কেচ করায়। তাঁরা সেন্ট পিটার্সবুর্গে চলে এসেছেন অবশেষে এবং তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের নিজের স্কেচ দেখিয়ে আনন্দ দিতেন আইজেনস্টাইন।

ছোট্টো ছেলেটি গ্রীষ্মের ছুটিতে বাগানে বসে, একমনে স্কেচ করে করে ভরিয়ে তুলতো তার খাতা। আজও সেই ছেলেবেলার স্কেচ সংরক্ষিত আছে—প্রকাশিত হয়নি।

তাঁর ছেলেবেলার বেশির ভাগ স্কেচের বিষয় এসেছে তাঁর মায়ের কুশানের ওপরের ছবি বা পত্রিকা ও পোস্টকার্ডের ছবি থেকে। হয়তো এগুলোই পরে তাঁকে চলচ্চিত্রের বিষয় সম্পর্কে ভাবিয়েছে।

ছেলেবেলায় তাঁর শোয়ার ঘরের জানলার কাছে ঝুলতো সাদা লিলিয়াক গাছের ক'টি ছড়ানো শাখা। বিছানা থেকে দেখা যেতো। আইজেনস্টাইনের মনে আছে সেই ছেলেবেলায় দেখা 'ক্লোজ-আপ' দৃশ্য। পরবর্তী জীবনে সেই স্মৃতি তাঁকে ক্লোজ-আপ নিয়ে ভাবিয়েছে।

যেমন ছেলেবেলায় দেখা মায়ের ক্রুদ্ধ মূর্তি। হঠাৎই একদিন তাঁর মা নিজেকে 'আইজেনস্টাইনের মা' বলতে অস্বীকার করে বসলেন। মায়ের সেই মুখের চেহারা আইজেনস্টাইনের মনে পড়ে—জীবনহীন ফ্যাকাশে মুখ। পরবর্তীকালে তিনি চলচ্চিত্রে এই মুখাবয়বের ব্যবহার করেছেন।

খুন বা ভয়ের চলচ্চিত্র দেখলে, রাত্রে দুঃস্বপ্নের মতো লাগতো আইজেনস্টাইনের। কিন্তু শৈশবের প্রত্যক্ষ দেখা সাংসারিক সংঘর্ষ, নির্মমতা—পরে তাঁর চলচ্চিত্রকে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছে।

ছেলেবেলায় নিজের বই ছাড়াও, পিতা-মাতার বই বা হাতের কাছে যা পেতেন পড়তেন। এভাবেই তাঁকে নাড়া দিলো দুমার সাহিত্য, আগ্রহী করে তুললো ফরাসি বিপ্লবকে জানতে। মাত্র ১২ বছরের ছেলে খ্রীস্টমাসের আনন্দমুখর দিনে খুলে বসলো—ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসের দু'টি খণ্ড।

ফরাসি বিপ্লবকে জানার আগ্রহ থেকে, আইজেনস্টাইন আগ্রহী হলেন রাশিয়ার বিপ্লবের প্রতি। ভিক্তর্ উগোর 'লে মিজেরাব্লে' গ্রন্থে তিনি পেলেন বিপ্লবের রোমান্টিক দিকের আভাস।

তাঁর বইপড়া ছিলো বিস্তৃত ও বিচিত্র এবং বয়সের তুলনায় অনেক বেশি। এই পড়ার অভ্যাস তাঁর পরবর্তী জীবনে কাজের এবং চিন্তার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে।

ছেলেবেলায় সার্কাস দেখার আকর্ষণও তাঁর পরবর্তী জীবনে গুরুতর প্রভাব ফেলেছে—নাটকীয় কসরতের ব্যাপারে। এমনকি নিজেও বন্ধুদের নিয়ে বাগানে সার্কাসের কসরতের মহড়া দিতেন। দোলনায় শুয়ে শিশুবয়সে তিনি 'লালমুখো' ক্লাউনদের ভালোবাসতেন। আইজেনস্টাইন সংগ্রহশালায় এমন তথ্যও আছে যে, তিনি 'মস্কোর হাত' নামে এক সার্কাস প্রদর্শনের পরিকল্পনা করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে 'এনাফ্ সিম্প্লিসিটি' নাটকে তিনি সার্কাসকে নাটকের সঙ্গে মেশান।

তাঁর আরো একটি আকর্ষণ ছিলো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। যুদ্ধের প্রত্যেকটি গতিবিধি, সাজ-পোশাক তিনিই ঠিক করতেন। এমন কি আশ্চর্য দৃশ্যসজ্জাও করতেন সেসব যুদ্ধের।

১৯১৫ সালে তিনি পেত্রোগ্রাদ ইনস্টিটিউট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙে ভর্তি হলেন। শিল্পকলার প্রতি অপরিসীম অনুরাগের কারণে তিনি প্রযুক্তিবিদ্যায় এমন বিষয় নির্বাচন করলেন, যার সাথে শিল্পকলার ঘনিষ্ঠতা আছে, অর্থাৎ, স্থাপত্যকলা। এই ইন্স্টিটিউটেই তাঁর পিতা পড়েছেন। যতো দিন না বিপ্লবের সময় এলো, আইজেনস্টাইন এখানে পড়াশোনা করেছেন।

তাঁর ছাত্রজীবনে প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। তবে পরবর্তী সময়ে, এ শিক্ষা তাঁর কাজে লেগেছিলো। গণিতের শিক্ষা যেমন কাজে লেগেছিলো, তেমনি ব্রিজ তৈরির শিক্ষাও তাঁর দৃশ্যসজ্জার চিন্তায় প্রভাব ফেলেছিলো। ছাত্রজীবনে তাঁর অন্যতম আকর্ষণ ছিলো নাটকের প্রতি। রাত জেগে লাইন দিয়েছেন নাটকের টিকিট কাটার জন্য। অবসর সময়ে নাটকের দৃশ্যসজ্জা নিয়ে ভেবেছেন।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় ইন্স্টিটিউটটি সৈনিকদের কেন্দ্র হয়ে উঠলো। আইজেনস্টাইনও সৈনিকদের মণিবন্ধ লাগালেন। মার্চ মাসে তাঁকে সার্ভিস কার্ড দেয়া হলো।

এই ফাঁকে, সামাজিক ঘটনাবলী নিয়ে তিনি কিছু ব্যঙ্গচিত্র আঁকার ও স্কেচ করার পরিকল্পনা করলেন। 'পিতার্সবুর্গস্কাইয়া গাজেতা' পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিলো তাঁর ব্যঙ্গচিত্র। শিল্পকলার জন্য জীবনে প্রথম পারিশ্রমিক পেয়েছেন—দশ রুবল্।

১৯১৭ সালের জুলাইয়ে আকস্মিকভাবে বিক্ষোভ ও গুলিচালনা প্রত্যক্ষ করেন তিনি। এই স্মৃতিরই প্রতিচ্ছবি তাঁর 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রে। এই গুলিচালনার স্কেচ তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করেন 'স্যার গে' (Sir Gay) ছদ্মনামে।

নাটকের প্রতি আকর্ষণ তখনো তাঁর অদম্য। এরই মধ্যে শুরু হলো রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব। আইজেনস্টাইনের জীবনে মোড় ঘুরে গেলো।

১৯১৮ সালে যখন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা শেষ হয়ে এসেছে—আইজেনস্টাইন ইনস্টিটিউট ছেড়ে লাল ফৌজে যোগ দিলেন।

গৃহযুদ্ধের সময়ে কাজের ফাঁকে পরম উৎসাহে নাটক ও শিল্পকলা সম্পর্কে অধ্যয়ন করতেন আইজেনস্টাইন। জাপানী উড্‌কাট শিল্পী, গইয়া, ডুরার ইত্যাদির শিল্পকলা সম্পর্কে, কাজের শিবিরে বসে অধ্যয়ন করেছেন তিনি।

১৯১৯ সালের শেষে তিনি পঞ্চদশ সেনাবাহিনীর ১৮ নম্বর মিলিটারি কন্‌স্ট্রাক্‌শান্ ইউনিটে নাটকের দল শুরু করেন। এই নাটকের দলের পেশাদার শিক্ষক ছিলেন এলিসেইয়েভ্ (Eliseyev)। আইজেনস্টাইন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নাটকের শিক্ষা গ্রহণ ও প্রস্তুতিতে।

১৯২০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এই নতুন দল অনেকগুলি ছোটো নাটক মঞ্চস্থ করলো। এই প্রথম আইজেনস্টাইন নাটক পরিচালনায় হাত দিলেন। একটি পথিকের চরিত্রে সামান্য অভিনয়ও করেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর এতো খারাপ যে, সংলাপ শোনা যেতো না। পারতপক্ষে বাজে কণ্ঠস্বরের জন্য, অভিনয় করার চিন্তা পরিত্যাগ করেন তিনি।

এর পর তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন মস্কোয় যাওয়ার জন্যে। তাই জেনারেল স্টাফ অ্যাকাডেমির ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস ডিপার্টমেণ্টে ভর্তি হন। প্রথমেই জাপানী ভাষা শিখতে শুরু করেন। মস্কোতে তাঁর দেখা হয় ছেলেবেলার বন্ধু ম্যাক্সিম স্ট্রউচের (Maxim Strauch) সাথে। ম্যাক্সিম নিজে নাটকের অনুরাগী ছিলেন।

অ্যাকাডেমি ছেড়ে দিয়ে, ১৯২০ সালের নভেম্বরে স্ট্রউচের সাথে আইজেনস্টাইন রওনা হলেন নিউ ওয়ার্কার্স থিয়েটারে যোগ দিতে।

সমস্ত থিয়েটার ছিলো শুধু শ্রমিকশ্রেণীর। তাই দু'জনে কোথাও ঢুকতে পারছিলেন না। কিন্তু দু'জনেই এতো জেদ ধরে রইলেন যে, অবশেষে প্রলেৎকুল্ত্ থিয়েটারে উভয়েই ঢোকার সুযোগ পেলেন। আইজেনস্টাইন কাজ পেলেন সেট্ ডিজাইনারের।

ক্রমশই তিনি পরিচিত হতে থাকেন সোভিয়েত রাশিয়ার সুবিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে। সাহিত্যে মায়াকোভ্স্কি এবং নাট্যপ্রয়োগে মেয়েইর্হোল্দ তখন সুপরিচিত নাম।

প্রথমদিকে থিয়েটার সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের খুব পরিষ্কার ধারণা ছিলো না। মাত্র ২২ বছরের তরুণ, অদম্য প্রাণশক্তি দিয়ে কাজ শিখছেন। ঠিক এ সময়ে জ্যাক লন্ডনের গল্প অবলম্বনে 'দ্য মেক্সিকান' নাটকের দৃশ্যসজ্জা ও সাজপোশাকের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করলেন তিনি। নাটকটি সাড়া জাগালো।

শিল্পকলার বিভিন্ন রূপ নিয়ে অধ্যয়ন করতে লাগলেন তিনি। প্রলেৎকুল্ত থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষ জমা হচ্ছিলো। তাই ১৯২১ সালের শরতে তিনি মেয়েইর্হোল্দ পরিচালিত স্টেট স্কুল অফ্ স্টেজ ডিরেক্শনে ভর্তি হতে গেলেন। সেখানে আর এক প্রার্থী ছিলেন সের্গেই ইয়ুৎকোভিচ্, যিনি পরে সুবিখ্যাত চলচ্চিত্রকার হয়েছিলেন।

মেয়েইর্হোল্দের স্কুলে রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হলেন আইজেনস্টাইন। সেখানে দু'বছর ছিলেন, কিন্তু এই দু'বছর তাঁর জীবনের গতিপথকে দারুণ প্রভাবিত করেছে। প্রথম থেকেই মেয়েইর্হোল্দ সম্পর্কে তাঁর মনে হতো—তিনি এক সোনার খনি খুঁজে পেয়েছেন, যাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি বলেছেন যে, মেয়েইর্হোল্দের মতো আর কাউকে তিনি অতোখানি ভালোবাসেননি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেননি।

১৯২১ সালের ডিসেম্বরে তিনি 'ফেক্স' (FEX, CC Factory of Eentric Actors) গ্রুপের সংস্পর্শে আসেন। এঁরা অপ্রচলিত পদ্ধতিতে নাটকের ভাবনা ও উপস্থাপনা করতেন। পরবর্তী জীবনে এঁদের প্রভাবও খানিকটা তাঁর নাট্যচিন্তার ওপর পড়ে।

আইজেনস্টাইন এতো ভালোবাসতেন তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মেয়েইর্হোল্দকে যে, মেয়েইর্হোল্দের ব্যক্তিগত কাগজপত্র তিনি সরিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন, যখন মেয়েইর্হোল্দকে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ বন্দী করে। এটা আইজেনস্টাইনের পক্ষে খুব ঝুঁকির ব্যাপার। মৃত্যুর পর, তাঁর ব্যাগ থেকে প্রথম এই কাগজপত্রের হদিশ পাওয়া যায়।

১৯২২ সালের শুরুতে আইজেনস্টাইন 'পেরে ত্রু' (Pere Tru, Peredvizhaniya Trupa) নাটকদলের প্রধান ম্যানেজার এবং শিল্প-নির্দেশক হন। এতোদিনে তিনি একান্ত নিজস্ব স্বাধীন একটি নাটকের দল নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেলেন। এখানেই তাঁর চলচ্চিত্রের প্রথম পরীক্ষা 'এনাফ সিম্প্লিসিটি' নাটকের প্রযোজনায়।

ব্যক্তিজীবনের কিছু ভালোবাসা

আইজেনস্টাইন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। তবু কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে তাঁর আত্মিক ঘনিষ্ঠতা এতো বেশি ছিলো যে, তিনি নিবন্ধ বা চিঠিপত্র লিখতেন উজ্জ্বল লাল রঙ দিয়ে।

'পোতেমকিন' চলচ্চিত্রের সফলতার পর শিল্পী হিসেবে আইজেনস্টাইন আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তাঁর চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিদেশের সমালোচনা ও মন্তব্য শুনতে অত্যন্ত উৎসুক হলেও—স্বদেশে কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ রয়ে যায়।

অবশ্য এ সময়ে এই আত্মবিশ্বাসের পূর্ণতায়, তাঁর সাথে অনেকেই সাক্ষাৎ করে ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেছেন। এমনিভাবেই নিরাশ হয়েছেন আইজেনস্টাইনের ভবিষ্যৎ স্ত্রী পেরা আত্তাশেভা (Pera Attasheva), যাঁর আসল নাম ফোগেলম্যান (Fogelman)।

প্রথম সাক্ষাতে, আইজেনস্টাইনকে কখনো ভালো লাগতো না। কিন্তু কারো যদি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ধৈর্য থাকত তা হলে সে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়তো। সাধারণত, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্তি অধিকতর মননশীল ব্যক্তিদেরই আকর্ষণ করতো।

আইজেনস্টাইনের বিবাহ সম্পর্কে, আশ্চর্যভাবে বেশির ভাগ জীবনীকাররা কোনো সুস্পষ্ট তথ্য দিতে পারেননি। এমন কি বিভিন্ন বিশ্বকোষে তাঁর বিবাহের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

আইজেনস্টাইন সম্ভবত পেরা আত্তাশেভাকে বিয়ে করেছিলেন। আইজেন-স্টাইনের মৃত্যুর পর পেরা-ই তাঁর বৈধ স্ত্রী হিসেবে উত্তরাধিকারিনী হয়েছেন। কিন্তু পেরা ও আইজেনস্টাইন সারা জীবন আলাদা বাড়িতে থেকেছেন। কোনোদিন তাঁরা একসাথে থাকেননি।

আইজেনস্টাইনের 'দ্বিতীয়া স্ত্রী' হিসাবে এলিসাবেতা তেলেশভার (Elisabeta Teleshova) নাম উল্লেখ করা হয়। আইজেনস্টাইনের অপ্রকাশিত চিঠিতে এ কথা পরিষ্কার যে, এলিসাবেতা তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ছিলেন। একটি চিঠিতে আইজেনস্টাইন তাঁকে 'আমার স্ত্রী' বলে উল্লেখ করেছেন।

এলিসাবেতা, আইজেনস্টাইনকে শেষের দিকের কয়েকটি চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী বাছাই করতে প্রচুর সাহায্য করেছেন। তার ফলে, আইজেনস্টাইনের গুরুতর সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। বস্তুত, এলিসাবেতাই 'নেভ্স্কি'

চলচ্চিত্রে আলেকজান্দার নেভ্স্কির ভূমিকায় চের্কাসভকে দিয়ে অভিনয় করানোর পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ আইজেনস্টাইন প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও, বাস্তবে শেষ পর্যন্ত চের্কাসভই অভিনয় করেন। এবং আইজেনস্টাইন 'অর্ডার অফ লেনিন' পুরস্কার পান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে এলিসাবেতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি আইজেনস্টাইনকে তাঁর উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন।

চারের দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিবাহ-সংক্রান্ত আইন ছিলো উদার। তাই, আইজেনস্টাইনের এই আপাত 'দ্বিতীয়া স্ত্রী'-র অস্তিত্ব আইনের চোখে মোটেই অবৈধ ছিলো না।

একসময় মস্‌ফিল্ম স্টুডিওর কাছাকাছি, মস্কো শহরের প্রান্তে পতাইলিকাতে (Potylika) বাসা বেঁধেছিলেন আইজেনস্টাইন। শোয়ার ঘরের মাঝখানে থাকতো বিছানা, তার পাশেই থাকতো কাগজ ও পেন্সিল। যদি কখনো কোনো চিন্তার ঝিলিক খেলে যায়, তখনই লিখতে পারবেন তিনি। সারা ঘর বহু দেশের বহু টুকটাক জিনিসে ভর্তি। চরম অগোছালো, আর তাতেই ঘরটাকে খুব মানবিক মনে হতো।

বাসার আরেকটা ঘর ছিলো শুধু বইয়ে ঠাসা। সাদামাটা কাঠের সাদা রঙের তাক ঠাসা ছিলো কয়েক হাজার বইয়ে। তবু এ ঘরে সব বই ধরতো না। সারা বাড়িটাই ছিলো বইয়ে ভর্তি। বিছানার তলা, মেঝের ওপর, পিয়ানোর ওপর, বাক্সের মধ্যে—বই শুধু বই। সারা বাসা ভর্তি বই আইজেনস্টাইনকে ঘিরে রেখেছিলো, তাঁর নিজেরই ভাষায়—'যাদুচক্রে'।

আইজেনস্টাইন তাঁর বন্ধু এস্‌থার শুবকে বলেছিলেন যে—তাঁর জীবনের সব থেকে মূল্যবান বস্তু হলো বই। তিনি এমন কি ঘনিষ্ঠ মানুষদের মধ্যেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারেন, কিন্তু বইয়ের সাথে এমনটি হয় না।

পঁচিশ বছর বয়সেই তাঁর বইয়ের সংগ্রহ বিশাল। বহু বইয়ের দোকানের কর্মচারি তাঁকে চিনতো। নতুন কোনো বই এলে অনেকে তাঁকে ফোন করে খবর দিতো।

গোর্কি স্ট্রীটে একটি পুরোনো বইয়ের দোকান সবে শুরু হবে জেনে সাত-সকালেই আইজেনস্টাইন ছুটেছেন, যাতে প্রথমেই কিনতে পারেন।

নতুন বই কিনে ঘরে ফেরার পরই তিনি প্রচুর পরিমাণে চা তৈরি করে বসতেন বইগুলো পড়তে। খুঁটিয়ে বা মোটামুটি পড়ে তবে ছাড়তেন। বইয়ের পৃষ্ঠার পাশে রুশ বা অন্য ভাষায় কিছু নোট লিখে রাখতেন। তাতে পরে পড়তে সুবিধে হতো তাঁর।

মিখাইল রম্ যখন মপ্যাসাঁর লেখা কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরির

পরিকল্পনা নিয়ে আইজেনস্টাইনের কাছে গেলেন—আইজেনস্টাইন শুরু করলেন মপ্যাসাঁর সাহিত্য সম্পর্কে পড়াশোনা। সাহিত্য, সমালোচনার সাথে বাদ পড়লো না ফরাসি দেশের চুলবাঁধার ইতিহাস পর্যন্ত।

আইজেনস্টাইন কখনো হয়তো কারুর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। যেমন পুদভ্কিন্ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত কর্কশ। কিন্তু নিজের প্রতিভার বিশাল আয়তনের কারণে, তাছাড়া যথেষ্ট সম্মান পাওয়ার কারণে—আইজেনস্টাইন কখনো ঈর্ষাকাতর হননি। ঈর্ষাকাতর হয়ে সমসাময়িক শিল্পীদের আক্রমণ করার নীচ প্রথায় তিনি কখনো অংশগ্রহণ করেননি।

বরঞ্চ কাউকে তাঁর আর্থিক সাহায্য করা, আর ভাবনা-চিন্তায় সাহায্য করার ব্যাপারে ছিলেন কিংবদন্তীর মতো।

আইজেনস্টাইন খুব বেশি বন্ধুর এক সাথে বাড়িতে আসা পছন্দ করতেন না। নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয় করতে ভালোবাসতেন। তাই মাঝেমধ্যে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যেতেন।

তাঁর 'জেনারেল লাইন' চলচ্চিত্রের জন্য নায়িকা খোঁজার কাহিনী অবশ্য ভিন্ন স্বাদের। জে. লেইডাকে সে কাহিনী বলেছেন আইজেনস্টাইনের স্ত্রী পেরা আত্তাশেভা।

'জেনারেল লাইন' চলচ্চিত্রে কৃষকরমণীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য, আইজেনস্টাইন ও আলেকজান্দ্রভ হন্যে হয়ে মহিলা খুঁজেছেন। সর্বত্র। ক্ষেতখামার কলকারখানা—কিছুই বাকি নেই। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না কোনো উপযুক্ত নারীকে। এমন কি অভিনেত্রীদেরও ডেকেছিলেন। সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করেছেন 'গরুর দুধ দুইতে পারেন? জমিতে লাঙল দিতে পারেন?' উত্তর পেতেন —'না'। ওখানেই শেষ হয়ে যেতো সাক্ষাৎকার। নির্বাচন করা যেতো না অভিনেত্রীকে। অবশেষে যথাযথ কৃষকরমণী পেয়েছিলেন আইজেনস্টাইন।

অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি জীবনে। ডক্টর অফ্ আর্টস্ (১৯৩৭), অনার্ড আর্টিস্ট অফ আর-এস-এফ-এস-আর (১৯৩৫), স্টেট প্রাইজ অফ ইউ-এস-এস-আর (১৯৪১ এবং ১৯৪৭), অর্ডার অফ লেনিন, অর্ডার অফ দ্য ব্যাজ অফ অনার।

আবার আঘাত এসেছে নানাভাবে। জীবনে খ্যাতির ও সম্মানের শিখরে দাঁড়িয়েও যখন 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ করতে পারেননি, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন কিছুদিন। স্ত্রী পেরা বলেছেন—আইজেনস্টাইনের তখন 'স্নায়বিক অসুস্থতা' চলছিলো।

জীবনের শেষবেলার কাহিনী দীর্ঘ। আইজেনস্টাইনের স্মৃতিকথা অপ্রকাশিত, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র অপ্রকাশিত—সেগুলি রক্ষিত আছে রাশিয়ার আইজেনস্টাইন সংগ্রহশালায়।

কিন্তু আইজেনস্টাইনের সেই প্রিয় পতাইলিকার বাসাটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভাঙার আগে তাঁর স্ত্রী পেরা, আইজেনস্টাইনের কিছু আসবাবপত্র নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। সেই আসবাবপত্র পরে নউম্ ক্লাইম্যান (Naum Kleiman) নামে এক খ্যাতনামা আইজেনস্টাইন-বিশেষজ্ঞর বাড়িতে নিয়ে এসে—যতোদূর সম্ভব, আইজেনস্টাইনের নিজের ঘরের মতো করে সাজানো হয়। এখানে অতিথিরা আইজেনস্টাইনের চেয়ারে বসে, তাঁর কাপে চা খেতে পারেন।

কিছু আসবাবপত্র রক্ষিত আছে আইজেনস্টাইনের বন্ধুদের কাছে। যেমন ইলাইয়া ভাইস্ফেল্ডের (Ilya Weisfeld) কাছে।

আইজেনস্টাইনের মৃত্যুর পরে, ১৯৭৮ সালে মস্কোর সেন্ট্রাল স্টুডিও ফর্ ডকুমেন্টারি ফিল্মসের প্রযোজনায় দু'রিলের একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়। নাম—'ইন মেমোরি অফ আইজেনস্টাইন'। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন আইজেনস্টাইনের স্ত্রী পেরা আত্তাশেভা।

এই চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইনের কবরস্থান ইত্যাদি ছাড়াও—তাঁর পতাইলিকার প্রিয় বাসাটি দেখানো হয়েছে।

জীবনের শেষ বেলা

'ইভান দ্য টেরিবল্' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বের সফলতার পর, আইজেনস্টাইন হাত দিলেন চলচ্চিত্রটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের কাজে। দ্বিতীয় পর্বের কাজ এগিয়েই ছিলো। তাই ১৯৪৫ সালের পুরো বছরটাই তিনি ব্যস্ত রইলেন দ্বিতীয় পর্ব শেষ করতে।

১৯৪৬ সালের শুরুতে, দ্বিতীয় পর্বের দৃশ্য ও সম্পাদনা, অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রায় শেষ হয়ে গেলো।

২ ফেব্রুয়ারি তিনি 'স্তালিন পুরস্কার' পাওয়ার সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগ দেন। তিনি সেদিন নেচেও ছিলেন। ভেরা মরেৎস্কাইয়ার সাথে নাচতে নাচতে, হঠাৎ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত অবস্থায় ঢলে পড়েন। সে অবস্থাতেও, বারণ করা সত্ত্বেও, কারো সাহায্য ছাড়াই গাড়িতে ওঠেন। ভর্তি হন ক্রেমলিন হাসপাতালে।

মার্চ মাসে তিনি উঠে বসলেন। তার কিছুদিন পর হাঁটার শুরু। সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী থাকার সময়ে আইজেনস্টাইন বন্ধুদের কাছে রসিকতা করেছিলেন— "আমি এখন মৃত। ডাক্তাররা বলেছেন যে সমস্ত নিয়মকানুন অনুযায়ী,

আমি সম্ভবত আর বাঁচবো না। কাজেই এটা ঠিক পরিশিষ্টের মতো, এবং চমৎকার। আমি এখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।"

মে মাসে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে এক স্যানাটোরিয়ামে গেলেন তিনি। তাঁর পুরনো শহর রিগাতে ফেরার ইচ্ছা নিয়ে, সেখানে একটা বাড়ির জন্য আবেদন করলেন।

সারা দিন চুপচাপ, ধ্যানস্থ হয়ে কাটতো আইজেনস্টাইনের। বন্ধুদের সাথে অবশ্য সহাস্য রসিকতা করতেন। কিন্তু, হাসপাতালে প্রকোফিয়েভকে বলেছিলেন—"জীবন যখন শেষ হয়ে যায়, যা পড়ে থাকে, সবটুকুই পরিশিষ্ট।"

এই সময়েই, অসুস্থতায় প্রায় নিশ্চল আইজেনস্টাইন, অনেক ফেলে রাখা লেখার কাজ নতুন করে শুরু করেন। তাই তাঁর স্মৃতিকথার বেশির ভাগটাই লেখা ১৯৪৬ সাল থেকে।

ইংল্যাণ্ডে আর আমেরিকায়, তাঁর আগের গ্রন্থগুলো প্রচুর বিক্রি হচ্ছিলো। আরো খবর এলো—আর্জেন্টিনার স্প্যানিশ ভাষা ও জাপানী ভাষাতেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হবে। কিন্তু নিজের শরীর নিয়ে আইজেনস্টাইনের দুশ্চিন্তা থাকছিলোই।

'ইভান' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্ব তখন সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনার মুখে। জোসেফ স্তালিন নিজে চলচ্চিত্রটি দেখে অসন্তুষ্ট। ঠিক এমনি সময় ১৯৪৬ সালে ৪ সেপ্টেম্বর বিস্ফোরণ ঘটালো 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্' দ্বিতীয় পর্ব সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব—যাতে এই চলচ্চিত্রকে মারাত্মকভাবে ও ভাষায় আক্রমণ করা হয়। ফলে 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্ব কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আর এর তৃতীয় পর্বের জন্য যতোটুকু চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ করেছিলেন আইজেনস্টাইন—সে সমস্ত সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলা হয়।

আইজেনস্টাইনের অনুরোধে, তাঁকে ও অভিনেতা চের্কাসভ্‌কে ডাকা হয় স্তালিনের সাথে গোপন বৈঠকে। কর্তৃপক্ষের নীতি অনুযায়ী 'ইভান' চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্ব সংশোধন করতে রাজি থাকলে—আইজেনস্টাইন কাজ করতে পারেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ মার্চ আইজেনস্টাইন টেলিগ্রাম পাঠালেন জে. লেইডাকে—"সব ঠিক আছে। ইভানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।"

এতো অসুস্থতাব মধ্যেও, সম্ভাব্য কাজের আনন্দে, ৩০ সেপ্টেম্বর আইজেনস্টাইন তাঁর নতুন 'মস্কো ৮০০' চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত চিত্রনাট্য লেখার কাজ ধরলেন।

মস্কোকে নানা রঙে দেখানোর এক মহাকাব্য হবে এটা। আরো খানিকটা লিখলেন ২৯ নভেম্বরে। এটাই তাঁর অসম্পূর্ণ শেষ স্বপ্ন। এটুকুর বেশি

এগোয়নি 'মস্কো ৮০০'। তবুও একবার, আইজেনস্টাইন আবার ফিরে গেছেন, তাঁর প্রিয় ঐতিহাসিক বিষয়ে।

'ইভান' চলচ্চিত্রের কাজ নতুন করে শুরু করার রফায়, আইজেনস্টাইন পুনর্বার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি অন্তত মৃত্যুর হাত থেকে, ৪৮ বছরে বেঁচে উঠতে পারলেন। তবুও ভগ্নস্বাস্থ্য। আবার জীবিতও রয়ে গেছেন। আইজেনস্টাইনের নিজের ভাষায়—

"আমি কিছুই বুঝিনি। জীবন সম্পর্কে কিছুই নয়। আমার নিজের সম্পর্কেও নয়।...কোনো কিছু সম্বন্ধেই নয়, শুধু একটি জিনিস ছাড়া। আমার জীবনের মধ্য দিয়ে আমি ছুটেছি। বাঁয়ে বা ডাইনে তাকাইনি।......আমার মনোযোগ ছিলো শুধু একটি মুহূর্তের দিকে। যেন, আমি কোথাও যাওয়ার জন্য ছুটেছি। যেন, আমি দেরি হওয়ার সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত। যেন, আমার লক্ষ্য হলো সেখানে পৌঁছোনো। যেন, আমি তৎক্ষণাৎ আরো খানিকটা এগোবার জন্য ছুটছি। চলন্ত অবস্থায়, ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখার মতো, আমি আমার ছেলেবেলা, আমার তরুণ বয়সের অ্যাডভেঞ্চার আর আমার প্রাপ্তবয়সের জীবনকে দেখছি।......অকস্মাৎ আমি এক ভয়ংকর বোধে আঘাত পেলাম। আমার হাতের মুঠো থেকে, সমস্ত কিছু ফস্কে যাচ্ছে। আমি জানতাম না কেমন করে ধরে রাখতে হয়, আটকে রাখতে হয়।"

কথাগুলি লিখেছিলেন আইজেনস্টাইন তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায়, যার পাণ্ডুলিপি মস্কোর আইজেনস্টাইন সংগ্রহশালায় রয়েছে।

আইজেনস্টাইন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো—পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হবে। তখন তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার দিন এগিয়ে আসছিলো। মৃত্যু ও অমরত্বের প্রশ্ন তখন তাঁর মনের মধ্যে সারাক্ষণ খেলা করে। নিজের চলচ্চিত্রেই মৃত্যুর বিষয়বস্তুকে তিনি দেখতে পান। তিনি নিজে তখন তাঁর অবশিষ্ট ক'টা দিন সব থেকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে চাইছেন।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি, তাঁর শরীরটা একটু ভালো লাগছিলো। ছাত্রদের বলেছিলেন, তাঁর বাড়িতে এসে পরীক্ষা দিতে।

এ অবস্থাতেও বেশ কয়েক মাস তিনি শিক্ষকতা করেছেন। এমন কি, সৃষ্টিশীল কাজের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে একটি বক্তৃতামালাও প্রস্তুত করছিলেন। কিন্তু সেটা আর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া যায়নি—তাঁর মৃত্যুর কারণে।

এ সময়ে আরো বেদনার ঘটনা—তিনি তাঁর 'কিউ ভিভা মেক্সিকো' চলচ্চিত্রের জন্য প্রস্তুত দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখেন 'থাণ্ডার ওভার মেক্সিকো' আর 'টাইম ইন দ্য সান' চলচ্চিত্রে। অদম্য শক্তির সাহায্যে এইসব মানসিক আঘাত সহ্য করেন তিনি।

বার বার 'ইভান' চলচ্চিত্র শেষ করতে নামার দিনক্ষণ ঠিক করলেও, তিনি

ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ার ইনস্টিটিউট অফ দ্য হিস্টরি অফ আর্টসের নির্বাচিত প্রধান হিসাবে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। পরিকল্পনাও করছেন, এ কাজে বিদেশ ভ্রমণের।

তাঁর প্রবন্ধের দ্বিতীয় ইংরেজি অনুবাদের সংকলন প্রকাশিত হতে চলেছে, যার 'ফিল্ম ফর্ম' নামটি তিনিই পছন্দ করে দিয়েছেন। কিন্তু 'ফিল্ম ফর্ম' প্রকাশিত হয়েছে—তাঁর মৃত্যুর পর।

একদিন লিখতে বসে, অসুস্থ আইজেনস্টাইনের হাত থেকে কলমটা খসে পড়লো। কাগজের ওপর একটা আঁকাবাঁকা দাগ পড়লো। তিনি একটা লাল ক্রেয়ন দিয়ে সেই আঁকাবাঁকা দাগগুলো চিহ্নিত করে লিখলেন—"আমার অসুস্থতার রেখাচিত্র।"

আইজেনস্টাইনের তখনকার বাসার নীচের ফ্ল্যাটে থাকতেন তাঁর পরমবন্ধু আলোকচিত্রী এডোয়ার্ড টিসে। ঘর উষ্ণ রাখার রেডিয়েটারে আওয়াজ করে টিসেকে ডাকবেন বলে, তিনি একটি রেঞ্চ প্রস্তুত রেখেছিলেন রেডিয়েটারের কাছে।

১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি আইজেনস্টাইনের বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী হয়তো ব্যর্থ হলো।

১৯৪৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি—রঙের তত্ত্ব সম্পর্কে নিবন্ধ লেখায় ব্যস্ত ছিলেন আইজেনস্টাইন। হঠাৎ কাগজের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। হৃদরোগের আক্রমণ। লেখা হঠাৎ থেমে গেছে। সেই অসম্পূর্ণ স্থানে লাল ক্রেয়নে আইজেনস্টাইন লিখলেন—"আক্রমণ" (attack) !

কিছুক্ষণ পর আরেকবার হৃদরোগের আক্রমণ। তবুও আইজেনস্টাইন রাত্রে কাজ করে চললেন। রাত কেটে আসে।

১৯৪৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি—ভোরের শুরুতেই আইজেনস্টাইনের হৃদপিণ্ড স্তব্ধ দেখা গেলো। আজও কেউ ঠিক করে বলতে পারেন না—তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তটি এসেছিলো কখন কিভাবে। কোথাও তাঁর মৃত্যু তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ লেখা হয়।

১০ ফেব্রুয়ারির রাতের শেষে মৃত্যু কেড়ে নিয়ে গেলো—সের্গেই আইজেনস্টাইনকে।

হয়তো তখন ১১ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে।

চলচ্চিত্রপঞ্জী

(জে. লেইডার তৈরি এবং ইভার মন্টাগুর সংশোধিত তালিকার অবলম্বনে)

১. STRIKE (১৯২৪)

প্রযোজনা : গস্কিনো (প্রথম স্টুডিও), মস্কো। মুক্তি : ১৯২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। দৈর্ঘ্য : ৮ রিল, ১৯৬৯ মিটার। চিত্রনাট্য : ভ্যালেরি প্লেৎনাইয়ভ্, আইজেনস্টাইন এবং প্রলেৎকুল্ত সমন্বয়। পরিচালনা : আইজেনস্টাইন। চিত্রগ্রহণ : এডোয়ার্ড টিসে। দৃশ্যসজ্জা : ভাসিলি রাখাল্স্। চরিত্রচিত্রণ :

সংগঠক : এ. আগ্যান্তোনভ্

শ্রমিক : মিখাইল্ গোমারভ্

গুপ্তচর : ম্যাক্সিম্ শ্ত্রউখ্

ফোরম্যান : গ্রিগরি আলেক্জান্দ্রভ্

বাউণ্ডুলে সর্বহারা : জুডিথ্ গ্লিজার্, বরিস ইয়ুৎঙ্গেভ্ এবং প্রলেৎকুল্তের অন্যান্য অভিনেতারা।

২. THE BATTLESHIP 'POTEMKIN' (১৯২৫)

প্রযোজনা : গস্কিনো, মস্কো। প্রথম প্রদর্শনী : বলশয় থিয়েটার, মস্কো, ১৯২৬ সালের ১ জানুয়ারি। দৈর্ঘ্য : ৫ রিল, ১৭৪০ মিটার। চিত্রনাট্য : আইজেনস্টাইন, নিনা আগাদ্ঝানোভার রূপরেখা থেকে। পরিচালনা : আইজেনস্টাইন, সহযোগিতায় গ্রিগরি আলেক্জান্দ্রভ্। চিত্রগ্রহণ : এডোয়ার্ড টিসে। পরিচালনায় সহকারী : এ. আন্তোনভ্, মিখাইল্ গোমারভ্, ম্যাক্সিম শ্ত্রউখ্। গ্রুপ ম্যানেজার : ইয়াকভ্ ব্লিওখ্। সাব-টাইট্ল্ : নিকোলাই আসেইয়েভ। চরিত্রচিত্রণ :

ভাকুলিন্চুক : এ. আন্তোনভ্

চিফ অফিসার গিলিয়ারভ্স্কি : গ্রিগরি আলেক্জান্দ্রভ্

ক্যাপ্টেন গলিকভ : ভ্লাদিমির্ বার্স্কি

পেটি অফিসার : এ. লেভ্শিন্

একজন্ নাবিক : মিখাইল গোমারভ্

এবং রেড নেভির ব্ল্যাক সি ফ্লিটের নাবিকরা, ওদেস্যার নাগরিকরা, প্রলেৎকুল্ত্ থিয়েটারের সদস্যরা।

৩. OCTOBER (১৯২৮)

প্রযোজনা : সোভ্‌কিনো, মস্কো। মুক্তি : ১৯২৮ সালের ২০ জানুয়ারি। দৈর্ঘ্য : ৭ রিল, ২৮০০ মিটার। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : আইজেনস্টাইন ও ও আলেক্‌জান্দ্রভ্। চিত্রগ্রহণ : এডোয়ার্ড টিসে। পরিচালনায় সহকারী : ম্যাক্সিস শ্‌ত্রউখ্, মিখাইল গোমারভ, ইলাইয়া ত্রউবার্গ। চিত্রগ্রহণে সহকারী : ভ্ল্যাদিমির নিল্‌সেন্, ভ্ল্যাদিমির পপোভ। চরিত্রচিত্রণ :

লেনিন : নিকান্দ্রভ্

কেরেন্‌স্কি : এ. পপোভ্

ক্যাবিনেট মন্ত্রী : বরিস লিভানভ্ এবং প্রধানত লেনিনগ্রাদের বাসিন্দারা।

৪. OLD AND NEW (১৯২৯)

প্রযোজনা : সোভ্‌কিনো, মস্কো। মুক্তি : ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর। দৈর্ঘ্য : ৬ রিল, ২৪৬৯ মিটার। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : আইজেনস্টাইন ও আলেকজান্দ্রভ্। চিত্রগ্রহণ : এডোয়ার্ড টিসে। পরিচালনায় সহকারী : ম্যাক্সিম শ্‌ত্রউখ্, মিখাইল গোমারভ্। চিত্রগ্রহণে সহকারী : ভ্ল্যাদিমির্ নিল্‌সেন্, ভ্ল্যাদিমির পপোভ্। দৃশ্যসজ্জা : ভি. কোভ্রিগিন। স্থাপত্য : আন্দ্রেই বুরভ্। চরিত্রচিত্রণ :

মহিলা : মার্ফা লাপ্‌কিনা

কম্‌সোমল্ : ভাসাইয়া বুজেন্‌কভ্

ট্রাক্টর ড্রাইভার : কস্তাইয়া ভাসিলিয়েভ্

কুলাক : চুখ্‌মারেভ্

পাদ্রী : ফাদার মাতেভেই

ডাইনী : সুখারেভা

৫. QUE VIVA MEXICO

প্রযোজনা : আপ্‌টন্ সিন্‌ক্লেয়ারের সাহায্যে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা আইজেনস্টাইন ও আলেক্‌জান্দ্রভ্। চিত্রগ্রহণ : এডোয়ার্ড টিসে।

৬. ALEXANDER NEVSKY (১৯৩৮)

প্রযোজনা : মস্‌ফিল্ম, মস্কো। মুক্তি : ১৯৩৮ সালের ২৩ নভেম্বর। দৈর্ঘ্য : ১২ রিল, ৩০৪৪ মিটার। চিত্রনাট্য : আইজেনস্টাইন ও পিওতর্ পাভ্‌লেঙ্কো। পরিচালনা : আইজেনস্টাইন, সহযোগিতায় ডি. আই. ভাসিলিয়েভ্। চিত্র-

গ্রহণ : এডোয়ার্ড টিসে। সঙ্গীত : সের্গেই প্রকোফিয়েভ্। গীতিকার : ভ্ল্যাদিমির ল্যুগভ্স্কি। সাজপোশাক ও দৃশ্যসজ্জা : আইজেনস্টাইনের স্কেচ্ অবলম্বনে, ইসাক শ্পিনেল, নিকোলাই সলোভিয়ভ্, কে. ইয়েলিসেইয়েভ। শব্দ : বি. ভল্স্কি, ভি. পপোভ। পরিচালনায় সহকারী : বি. ইভানভ্, নিকোলাই মাস্লভ্। চিত্রগ্রহণে সহকারী : এস. উরালভ্, এ. আস্তাফিয়েভ, এন. বোলশাকভ। অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে কাজের উপদেষ্টা : এলেনা তেলেশেভা। চরিত্রচিত্রণ :

রাজকুমার আলেকজান্দার নেভ্স্কি	নিকোলাই চের্কাসভ্
ভাসিলি ব্সলাই	নিকোলাই ওখ্লোপ্কভ্
গ্রাভ্রিলো ওলেক্সিচ্	আলেকজান্দার অ্যাব্রিকোসভ্
ইগ্নাৎ	দ্মিত্রি ওর্লভ্
পাভ্শা	ভাসিলি নভিকভ্
দোমাশ্ ৎভের্দিস্লাভিচ্	নিকোলাই আর্স্কি
আমেল্ফা তিমোফেইয়েভ্না	ভার্ভারা মাসালিতিনোভা
ওল্গা	ভেরা ইভাশোভা
ভাসিলিসা	আন্না দানিলোভা
ভন্ বাল্ক্	ভ্ল্যাদিমির ইয়ের্শভ্
ৎভের্দিলো	সের্গেই ব্লিন্নিকভ্
আনানিয়াস	ইভান লাগুতিন
বিশপ	লেভ্ ফেনিন
কালো-পোশাকে সন্ন্যাসী	নউম্ রোগোঝিন

৭. IVAN THE TERRIBLE : প্রথম পর্ব (১৯৪৪)

প্রযোজনা : সেন্ট্রাল সিনেমা স্টুডিও, আল্মা-আতা। মুক্তি : ১৯৪৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর। দৈর্ঘ্য : ১২ রিল, ২৭৪৫ মিটার। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : আইজেনস্টাইন। চিত্রগ্রহণ : এডোয়ার্ড টিসে (বহির্দৃশ্য), আন্দ্রেই মস্কিন্ (অন্তর্দৃশ্য)। সঙ্গীত : সের্গেই প্রকোফিয়েভ। গীতিকার : ভ্ল্যাদিমির ল্যুগভ্স্কি। সাজপোশাক ও দৃশ্যসজ্জা : আইজেনস্টাইনের স্কেচ অবলম্বনে ইসাক শ্পিনেল, এল. নউমভ্, ভি. গোরাইয়ুনভ্। শব্দ : ভি. বোগ্দান্-কেভিচ্, ভি. ভল্স্কি। পরিচালনায় সহকারী : বি. স্ভেশ্নিকভ্, এল. ইন্দেন্বম্। চিত্রগ্রহণে সহকারী : ভি. দম্ব্রভস্কি।

ইভান	নিকোলাই চের্কাসভ্
আনাস্তাসিয়া	ল্যুদ্মিলা ৎজেলিকোভ্স্কাইয়া
স্তারিৎজ্কাইয়া	সেরাফিমা বির্মান

ভ্লাদিমির আন্দ্রেইয়েভিচ্ — পিওত্‌র্ কাদোচ্‌নিকভ্
আন্দ্রেই কুর্ব্‌স্কি — এম্. নগেরভ্
নিকোলা — প্‌দেভ্‌কিন
মালইয়্‌তা স্কুরাতভ্ — মিখাইল ঝারভ্
আলেক্সেই বাস্মমানভ্ — আলেক্সেই ব্‌চ্‌মা
ফিওদোর — মিখাইল কুজনেৎজভ্

এই চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বেও কলাকুশলীবৃন্দ একই ছিলো, এবং চিত্রগ্রহণের কাজও প্রথম পর্বের সাথেই হয়ে যায়।